# KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

| | |
|---|---|
| Record No. : KLMLGK 2007/ | Place of Publication : ৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক, কল-৬৮ |
| Collection : KLMLGK | Publisher : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত |
| Title : বিভাব . (BIVAV) | Size : 5.5" x 8.5" |
| Vol. & Number : 19/3<br>19/4<br>20/2<br>20/4 | Year of Publication : Feb - 1998<br>May - 1998<br>Oct - 1998<br>June - 1999 |
| | Condition : Brittle / Good ✓ |
| Editor : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত | Remarks : |

C.D. Roll No. : KLMLGK

বিশেষ গ্রীষ্ম-বর্ষা সংখ্যা

# বিভাব

সম্পাদক

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

বিভাব

১৪০৬

**With best compliments from**

**GANGULY CONSTRUCTION**

Govt. Contractor

Bally - Durgapur, Howrah

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

বিপ্লব ঘোষের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ

**মানসী যেতে হবে**

এক অসামান্য উত্তরণের কাব্যনির্মাণ

মূল্য : ৪৫ টাকা

প্রকাশক : **প্রতিভাস**

১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড

কলকাতা - ৭০০ ০০২

লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র কলিকাতা-৭০০ ০০৯

# বিভাব

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বিশেষ সংখ্যা

বিভাব : গ্রীষ্ম-বর্ষা

১৪০৬/১৯৯৯

লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র কলিকাতা-৭০০ ০০৯

সম্পাদকীয়

ক্রোড়পত্র-১: প্রগতি

বুদ্ধদেব বসুর প্রগতি এবং বিবাহ — প্রতিভা বসু। ৩

কবিতাভবনে বেড়ে ওঠা — দময়ন্তী বসু সিং ৬

হাতে লেখা 'প্রগতি' পত্রিকার মূল পাণ্ডুলিপির প্রতিচ্ছবি। ১১

'প্রগতি'র পাণ্ডুলিপির মুদ্রিত রূপ। ৬৩

গান্ধীর 'মহাত্মা' লাভ — নিত্যপ্রিয় ঘোষ। ৯৩

শিল্প সমালোচনায় কবি গীওম আপোলনীয়র — কমলেশ চক্রবর্তী। ৯৮

ক্রোড়পত্র - ২

বড়বাজার — দেবব্রত মল্লিক। ১১১

লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকদের দায়িত্ব -

এবং তাঁদের উৎসাহিত করার কিছু উদ্যোগ — আবদুর রউফ। ১৬৯

পাকিস্তানের ডায়েরী — শৈবাল গুপ্ত। ১৭৩

**সম্পাদকমণ্ডলী :**
পবিত্র সরকার । ধ্রুবজ্যোতি মণ্ডল। প্রদীপ দাশগুপ্ত।
**শান্তিনিকেতন**
অরুণ মুখোপাধ্যায়। অনাথনাথ দাশ

**সম্পাদক**
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

**প্রধান যোগাযোগকেন্দ্র ও লেখা পাঠাবার ঠিকানা**
সম্পাদকীয় দপ্তর
**'বিভাব'**
৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক (দ্বিতল)। কলকাতা - ৬৮। দূরভাষ : ৪৭৩-৩৬০০

**শান্তিনিকেতনে যোগাযোগ কেন্দ্র**
অরুণ মুখোপাধ্যায়
এ্যানড্রুজপল্লী (পশ্চিম) পো: শান্তিনিকেতন। পিন:৭৩১২৩৫

**প্রচ্ছদ :** রনেনআয়ন দত্ত।।

**অলংকরণ :** শ্যামল সেন

**বাঁধাই :** গৌরাঙ্গ বাইন্ডার্স, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০০৯।

**মূল্য :** পঁচিশ টাকা

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক ৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক, কলকাতা -৭০০ ০৬৮ থেকে প্রকাশিত বর্ণনা, ৬/৭ বিজয়গড়, কলকাতা - ৭০০ ০৩২ ফোন : ৪১২ ১১৩৩ হইতে অক্ষরবিন্যস্ত এবং চিত্রিত ও দি শিল্প মুদ্রণ, নিউ বালিগঞ্জ, কলিকাতা-৭০০ ০৩৯ হইতে মুদ্রিত।

## সম্পাদকীয় নিবেদন

পুনর্মুদ্রিত জীবনানন্দ দাশ জন্মশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যাটি ধরে গণনার হিসাবে এই সংখ্যাটি বিভাবের ৭৫তম সংখ্যা। আলাদা সংখ্যার হিসাবে একে ৭৪তম সংখ্যা ধরলেও সত্যের ব্যত্যয় হবে না।

এই সংখ্যা পাঠকের বিশেষ মনোযোগের দাবী রাখে। বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্ত সম্পাদিত বিখ্যাত 'প্রগতি' পত্রিকা প্রথম মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয় আষাঢ় ১৩৩৪ সালে। তার আগে বছর দুয়েক এটি হাতে লেখা কাগজ হিসাবে প্রকাশিত হতো। বুদ্ধদেব তখন ছাত্র। সেই হাতে লেখা 'প্রগতি' ১৩৩৩ - সালের চৈত্র সংখ্যাটি মূল পাণ্ডুলিপির সম্পূর্ণ ফ্যাক্সিমিলিসহ পুরোটাই বিভাবে মুদ্রিত হলো। এই অবিশ্বাস্য ঘটনাটি সম্ভব হলো শ্রদ্ধেয়া প্রতিভা বসু ও দময়ন্তী বসু সিং-এর সহৃদয় প্রণোদনায়। বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদে রোল্যান্ড পর্‌টুঙ-এর ''লাল ও শাদা'' উপন্যাসিকাটি আমরা যতদূর খোঁজ নিয়েছি এর আগে মুদ্রিত আকারে কখনো প্রকাশিত হয়নি। আমরা বহু চেষ্টা করে, ইংরাজী ও অন্যান্য ভাষার কৃতবিদ্য অনেক মনীষাকে প্রশ্ন করেও এই প্রকাশনার মুহূর্ত অবধি রোল্যাণ্ড পার্‌টুঙ-এর পরিচিতি উদ্ধার করতে পারিনি। সম্ভবত সমসময়ের কোনো লেখকের ঐ নামের লেখা বুদ্ধদেব বসুর ভাল লেগেছিল। তাই অনুবাদ করেছিলেন। 'প্রগতি' সম্পর্কে প্রতিভা বসুর ব্যক্তিগত প্রাসঙ্গিক রচনাটি এ সংখ্যার মর্যাদা বৃদ্ধি করবে। শ্রীমতী দময়ন্তী বসু সিং-এর লিখনটিতে একদা বাংলা কবিতাতীর্থ ২০২, রাসবিহারী এ্যাভিন্যু বাড়িটিকে ঘিরে লেখিকার বড় হয়ে ওঠার স্মৃতিচারণে যে সুন্দর ছবি ধরা পরে তাতে আমরা যারা 'কবিতার' নিয়মিত লেখক হবার গৌরব বুদ্ধদেব বসুর সস্নেহ প্রশ্রয়ে অর্জন করেছিলাম সকলেই অন্তর্গত হয়ে যাই।

'বড়বাজার' বললেই আমরা একটি অতি-সংকীর্ণ অথচ কলকাতার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র বুঝি। কলকাতার আদি সময় জলপথই ছিল পরিবহনের প্রধান উপায়। তারপর সময় পাল্টেছে, জলপথের বদলে স্থলপথই হয়ে উঠেছে ব্যবসার প্রধান চলাচলপথ। কিন্তু ব্যবসার এই প্রধান কেন্দ্রটি কিন্তু থেকেই গেছে অনড়! অথচ যার স্থানান্তর শুধু কলকাতার স্বাস্থ্যের জন্যই নয়, বানিজ্যের উন্নতি ও উপযোগিতার নিরিখেও অত্যন্ত জরুরী। এই বড়বাজারের শুরুর সময় থেকে সদ্যতন কাল অবধি আদ্যান্ত ইতিহাস নিয়ে একটি মনোজ্ঞ রচনা লিখেছেন দেবব্রত মল্লিক। এছাড়াও কমলেশ চক্রবর্তী ও নিত্যপ্রিয় ঘোষের দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ এই সংখ্যার গৌরব বৃদ্ধি করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। শৈবাল গুপ্তর সদ্য পাকিস্তন ভ্রমনের ডাইরীটিও আকর্ষণীয়।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির ত্রয়োদশ বর্ষপূর্তি হয়ে গেল। সমকালীন সমস্ত সৎ সাহিত্য প্রচেষ্টায় আকাদেমির ভূমিকা গর্ব করার মতো। কিছুদিন আগে নন্দন-প্রাঙ্গণে তারা যে লিটিল ম্যাগাজিন মেলার আয়োজন করেছিলেন, তা শুধু পশ্চিবঙ্গেরই নয়, প্রথম সর্বাঙ্গীন প্রচেষ্টা হিসাবে সারা ভারতবর্ষের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই প্রসঙ্গে লিখেছেন 'চতুরঙ্গ' সম্পাদক আবদুর রউফ।

বিভাবের আগামী সংখ্যা 'আন্তর্জাতিক কবিতা সংখ্যা'' হিসাবে অগাষ্টের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হবে। গতবছরের মতো এ বছরও আমরা সংখ্যাটি যথাসম্ভব আকর্ষণীয় করার চেষ্টা করছি।

বিনীত নমস্কারান্তে
বিভাব সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে
**সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত**

## বাংলা অনুবাদে দেশী-বিদেশী কথাসাহিত্য

**অমৃতের সন্তান**
গোপীনাথ মহান্তি
অনুবাদ : সুধাকান্ত রায়চৌধুরী ও
জ্যোতিরিন্দ্রমোহন জোয়ারদার ১২০ টাকা

**বাণভট্টের আত্মকথা**
হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী
অনুবাদ : প্রিয়রঞ্জন সেন ২৫ টাকা

**চিংড়ি**
তকযী শিবশংকর পিল্লাই
অনুবাদ : বোম্মানা বিশ্বনাথম্ ও
নিলীনা আব্রাহাম ৭০ টাকা

**দু কুনকে ধান**
তকযী শিবশংকর পিল্লাই
অনুবাদ : মলিনা রায় ১৫ টাকা

**গালিভারের ভ্রমণবৃত্তান্ত**
জনাথন সুইফট
অনুবাদ : লীলা মজুমদার ৮০ টাকা

**মাটির মানুষ**
কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী
অনুবাদ : সুখলতা রাও ৩৫ টাকা

**নগর মন্থন**
ও.পি. শর্মা 'সারথি'
অনুবাদ : প্রবীর ঘোষ ২০ টাকা

**ঠাকুরঘর**
কিশোরীচরণ দাস
অনুবাদ : জ্যোতিরিন্দ্রমোহন জোয়াদার
৭০ টাকা

**নানার হাতি**
ভৈকম মুহম্মদ বশীর
অনুবাদ : নিলীনা আব্রাহাম ১০টাকা

**প্রফেসর**
যোসেফ মুন্ডশেরি
অনুবাদ নিলীনা আব্রাহাম ১৫টাকা

**রক্তবন্যা**
ইন্দিরা পার্থসারথি
অনুবাদ : সুব্রমণিয়ন্ কৃষ্ণমূর্তি ৪০ টাকা

**সর্প ও রজ্জু**
রাজা রাও
অনুবাদ : রণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৫ টাকা

**উনিশ বিঘা দুই কাঠা**
ফকীরমোহন সেনাপতি
অনুবাদ : মৈত্রী শুক্ল ১৫ টাকা

**ইয়ারুইঙ্গম**
বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য
অনুবাদ : সুকুমার বিশ্বাস ৫০ টাকা

**হাজার সারস**
য়াসুনারি কাওআবাতা
অনুবাদ : সন্দীপকুমার ঠাকুর ও এইকো ঠাকুর
৪৫ টাকা

**ছায়ারেখা**
অমিতাভ ঘোষ
অনুবাদ : মৌসুমী বসু ৮৫ টাকা

**দাদিবুঢ়া**
গোপীনাথ মহান্তি
অনুবাদ : রত্না সাহা ৪০ টাকা

**সাহিত্য অকাদেমি**
২৩এ/৪৪ এক্স, ডায়মণ্ড হারবার রোড
কলকাতা ৭০০ ০৫৩, দূরভাষ ৪৭৮-১৮০৬


# ক্রোড়পত্র-১

বুদ্ধদেব বসুর হাতে লেখা 'প্রগতি' পত্রিকার (চৈত্র:১৩৩৩) পাণ্ডুলিপির পূর্ণ প্রতিচ্ছবিসহ মুদ্রণ। এখানে তাঁর অনূদিত ও ইতিপূর্ব অপ্রকাশিত 'লাল ও শাদা' উপন্যাসিকাটি প্রকাশিত হলো।

# বুদ্ধদেব বসুর প্রগতি এবং বিবাহ

প্রতিভা বসু

বুদ্ধদেব বসুর হাতে লেখা প্রগতি যখন প্রথম বেরোয় তখন আমার বয়েস খুব কম। কিন্তু শরৎচন্দ্র পড়ে মানসিকভাবে যথেষ্ট পাকা হয়ে উঠেছিলাম। আমার অল্পবয়েসে আমি দেখেছি বিয়ে উপলক্ষে তখন সবাই বই উপহার দিত। শরৎচন্দ্রের আটআনা সংস্করণের বই বেশী আসতো। আমার কোনো কাকার মেয়ের বিয়েতে বোধ হয় তার সবকটা বই-ই সে উপহার পেয়েছিলো। তাতে তার নিজের বেশী সুখ হয়নি কিন্তু আমার হয়েছিল। আমার বয়েস তখন দশ, দিদি বারো উত্তীর্ণ তেরো। সে তার নববিবাহ নিয়ে মুগ্ধ, আমি শরৎচন্দ্র নিয়ে মুগ্ধ। আমার নাওয়া খাওয়া জ্ঞান নেই, অন্যান্য বালক বালিকার মত বিবাহের উৎসবেও মন নেই, সারা মন জুড়ে শরৎচন্দ্র শুধু শরৎচন্দ্র। এতোদিন এতো বই পড়েছি কিন্তু এমন বইতো আর পাইনি। সবাই ছোটো মেয়ে বলে ছোটোদের বই-ই দিয়েছে। আমার পড়ার নেশা বলে তিনটা ছোটোদের পত্রিকার গ্রাহক করে দিয়েছে কিন্তু এই দরজাটা কেউ খুলে দেয়নি। শরৎচন্দ্র আমাকে আকাশের তলায় এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। আমি আমার আঁটোসাটো দশবছর বয়স থেকে একটানে পনেরো বছর বয়সে পৌঁছে গেলাম। যদি স্মৃতি প্রবঞ্চনা না করে তাহ'লে আমি যদ্দুর জানি বুদ্ধদেব বসুর হাতে লেখা প্রগতি পত্রিকা ১৯২৫ সালে বের হয়েছিলো, আমার বয়েস তখনো দশ। কী করে কেমন করে কে যে একখানা হাতে লেখা প্রগতি নিয়ে এসেছিলো এবং যাবার সময় ভুলে ফেলে রেখে গিয়েছিলো মনে নেই, কিন্তু হাতে পেয়ে গোগ্রাসে গিলে ফেললুম। বড়োদের বই পড়তে শিখে আমার বইয়ের ক্ষুধা মেটানো আর খুব অসম্ভব হলোনা। ততোদিনে আমার এক কাজিন ম্যাট্রিক পাশ করে আমাদের বাড়ি এলো, এখানে থেকে সে কলেজে পড়বে। ছাত্র হিশেবে খুব ভালো ছিলো। ভর্তি হলো বিজ্ঞানে কিন্তু মন তার সাহিত্যপাগল। কী সুবিধাই যে হলো বলা যায় না। কিছুদিনের মধ্যেই আমি শাড়ি পরে রীতিমত তরুণী। বয়েস বারো। কৈশোর আমি ঐ দশবছরের জীবনেই শেষ করে ফেলেছি। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ, চোখের বালি, যোগাযোগ পড়া হয়ে গেছে, ক্ষণিকা মুখস্থ। আর তারপরেই যে তিনজন লেখক আমাদের ভক্তি অর্জন করলো, তাঁরা অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র। তখন এঁদের নাম যথেষ্ট ছড়িয়ে পড়েছে। আর প্রগতিও মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হচ্ছে, জীবনানন্দও এসে গেছেন সেই আসরে। তিনি বরিশালে থাকতেন। বুদ্ধদেবের প্রতি চিরকাল যা হ'য়ে এসেছে, নিন্দা আর শ্লীল অশ্লীলতার বিতর্কিত বন্যা, সেটাও বয়ে এসেছে সঙ্গে সঙ্গে। মনে হয় যেন এক আশ্চর্য প্রতিভার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যুদ্ধ ঘোষণা। আক্রমণের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলেন জীবনানন্দ। বুদ্ধদেব বসুর কাগজে প্রত্যেক সংখ্যায় বেরুচ্ছে তাঁর কবিতা, বুদ্ধদেব বসু প্রকাশ্যেই বলছেন, 'আমার প্রিয় লেখকদের প্রশংসায় আমি নিক্ষুণ্ঠ, একপা এগিয়ে দুই পা পিছিয়ে ইতিউতি তাকিয়ে পথ চলা আমার স্বভাবে নেই' ... যখন 'গন্ডার কবিকে' (জীবনানন্দ) নিয়ে রোল উঠেছিলো অট্টহাসির, অন্য কোথাও কোনো সমর্থনসূচক প্রয়াস ছিলো না তখন সেই ক্ষুদ্র মঞ্চটিতেই প্রথম সংবর্ধিত হন জীবনানন্দ — প্রকাশ্যে একক কণ্ঠে সোচ্চার ঘোষণায়।

আর জীবনানন্দ লিখছেন, "বুদ্ধদেব বসুর 'প্রগতি' এলো নতুন সম্ভাবনা ও উৎসাহ

নিয়ে। ব্যক্তিগত ভাবে 'প্রগতি' ও বুদ্ধদেব বসুর কাছে আমার কবিতা ঢের বেশী আশা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলো। সে কবিতাগুলো হয়তো বুদ্ধদেবের মতে আমার নিজের জগতের এবং তারও পরিচিত পৃথিবীর বাইরে কোথাও নয়; স্পষ্টতাসম্ভবা তারা, অতএব সাহস ও সততা দেখাবার সুযোগ লাভ ক'রে চরিতার্থ হ'লাম। বুদ্ধদেব বসুর বিচারশক্তির ও হৃদয় বুদ্ধির, আমার কবিতার জন্য বেশ বড়ো স্থান দিয়েছিলেন তিনি 'প্রগতিতে' এবং পরে কবিতায় প্রথম দিক দিয়ে।"

আমাদের এক মুসলমান বন্ধুর দয়ায় 'প্রগতি'র সব সংখ্যাই আমি পড়তে পেতাম। কেবলমাত্র 'প্রগতি'ই নয় সব কটা বাংলা পত্রিকাই তার কাছে পেতাম। তিনি ডেপুটি ম্যাজিসট্রেট ছিলেন। ইংরেজ সরকার তাকে ভার দিয়েছিলেন, এর কোনো কাগজে তাদের বিরুদ্ধে কিছু লেখা হয়েছে কিনা সেটা দেখবার জন্য। সেই কাগজের মধ্যে 'প্রগতি'ও থাকতো। আমার সেই কাজিন্ দাদাটি ব্যতীত আরো দু'জন সাহিত্যিক বন্ধু ছিলো। একজন মুসলমান অন্যজন ব্রাহ্মণ। মুসলমান ছেলেটির নাম চুনু, দিলীপদার সঙ্গে আসতো, সেই থেকে বন্ধু। বি.এ. ফার্স্ট ইয়ারো পড়তো। অন্যজন সুধাংশু, সে কী করতো মনে নেই। এরা দু'জনেই কবিতা লিখতো। আমিও লিখতাম। আমারটা কখনো ফেরৎ আসেনি, ছাপাও হয়েছে বড়ো কাগজে — যে কাগজের নাম 'ভারতবর্ষ'। একবার একটা গল্পও ছাপা হ'লো বিখ্যাত সাপ্তাহিক আত্মশক্তিতে। চুনু বললো, 'আপনারতো দেখছি পাঠালেই ছাপা হয়। মেয়েতো তাই। মেয়েদের লেখাতো পায়না তাই। আপনি যদি কোনো লেখা 'প্রগতি'তে ছাপাতে পারেন তবেই বুঝবো আপনি সত্যি ভালো লেখেন। নাক উঁচু বুদ্ধদেব বসু মেয়ে বলেই ছাপবে সে আশা নেই। তার পছন্দই অন্যরকম। সেখানে কারো খাতির খাটবেনা। আর লেখাও সেখানে অন্য ধরনের। ওদের দলই অন্যরকম। সেখানে মাথা গলানো সকলের কম্ম নয়।

এক শহরে বাস করলেও বুদ্ধদেব বসুকে আমি কোনোদিন দেখিনি। দেখার কৌতূহল অবশ্যই ছিলো। আমি বুদ্ধদেব বসুকে চিনিনা জেনে দিলীপদা — দিলীপকুমার রায় খুব আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন, 'ছিঃ ঢাকার সেরা মানুষটিকেই তুমি চেনোনা? আমি আলাপ করিয়ে দেব।' কলকাতা ফিরে যাবার আগে সেটা আর পেরে ওঠেননি কিন্তু কলকাতা গিয়েই তিনি অনেক লেখা পাঠিয়েছিলেন সঙ্গে চিঠি, 'এই লেখাগুলো তুমি পড়ে তারপর নিজে গিয়ে বুদ্ধদেবকে দিয়ে আসবে।' সেটা আমি করিনি। তখন আমি আর ছোটো মেয়ে নেই। পনেরো বছর বয়েস। সুতরাং আমার দাদার হাতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। দেখবার যতো কৌতূহলই থাক আমার পক্ষে আমি সেটা সম্মানজনক বলে মনে করিনি। ঢাকা শহরে তখন লেখক বুদ্ধদেবের যতো খ্যাতি, গানের জন্য আমার খ্যাতি বোধহয় তার চেয়ে বেশীই ছিলো। তবে চুনুর কথায় চ্যালেঞ্জের মতো ডাকে একটা কবিতা পাঠিয়েছিলাম। পাঠাবার পরে কেবলি মনে হচ্ছিলো 'কেন পাঠালাম, কেন পাঠালাম। মিছিমিছি নাক উঁচু লোকটার কাছে একটা হার স্বীকার করলাম।'

তখন ইংরেজ আমল। একদিনের চিঠি এক মাসে গিয়ে পৌঁছোতোনা। একদিনেরটা একদিনেই গিয়ে পৌঁছেছিলো। ডাক বিলি হ'তো তিনবার। তারপরের দিনই বিকেলের ডাকে তার জবাব পেয়ে গেলাম। কবিতাটি তার ভালো লেগেছে কিন্তু 'প্রগতি' আর চলবেনা তাই ছাপাতে না পেরে দুঃখিত। কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি চিরদিনের মতো ঢাকা ছেড়ে কলকাতা



চলে যাচ্ছেন। যদি অনুমতি দিই তাহ'লে কবিতাটি তিনি অন্যত্র পাঠাতে পারেন।

অনুমতিটা অবশ্য দিইনি, ধন্যবাদ দিয়েছিলাম। খুব আশ্চর্য! হঠাৎ দু'একদিন পরে তিনি নিজেই এলেন। তখন ঘোর ঘোর সন্ধ্যা, সবে ঘরে ঘরে লণ্ঠন জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে, এর মধ্যে মানুষটিকে বসবার ঘরে এসে দাঁড়াতে দেখে অবাক হ'য়ে তাকিয়েছিলাম, বুদ্ধদেব বসু নিজের পরিচয় দিতেই আমি মনে মনে ভীষণ উত্তেজিত বোধ করলাম। সন্ত্রস্ত হ'য়ে তাড়াতাড়ি বসতে বললাম। ঠিক ভেবে পাচ্ছিলামনা কী করবো। বেশীক্ষণ ছিলেন না। বললেন 'এবার যাই, কালকেই চলে যাচ্ছি। আশাকরি আবার কখনো হয়তো দেখা হয়ে যাবে।' ঢাকা শহরে এই আমার প্রথম দেখা ও এই আমার শেষ দেখা। পরে মনে হ'য়েছে আমারো যেমন লেখকটিকে দেখার কৌতূহল ছিলো, লেখকটিরও আমাকে দেখার কৌতূহল বিন্দুমাত্র কম ছিলোনা। তারপর কলকাতায় যখন গ্রামোফনে গান দিতে এলাম, আবার দেখা হ'য়ে গেল। সেই দেখা হবার সমাপ্তি ঘটলো বিবাহে। দৈব আমাদের নিয়ে কখন যে কী খেলা খেলবে তাতো আর জানা যায় না! কিন্তু এই খেলাটা আমাদের উভয়ের পক্ষেযে অতি মাত্রায় সুখ এনে দিয়েছিলো এবং সেই সুখ আমরা আজীবন ভোগ করেছি তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

# কবিতাভবনে বেড়ে ওঠা

দময়ন্তী বসু সিং

আমাদের ২০২ রাসবিহারী এ্যাভিনিউ ছিলো সদর্থে বুদ্ধদেব বসু বর্ণিত বড় রাস্তায় ছোট ফ্ল্যাট। দোতলায় আমরা, তিনতলায় টুনুকাকা, অর্থাৎ বাবার বাল্যবন্ধু কবি অজিত দত্তর পরিবার, আর নিচের অংশে দোকান। একটি প্রায় -এঁদো, হিসির গন্ধে সুরভিত, সরু গলি দিয়ে এসে আমাদের বাড়িতে উঠতে হতো। বাড়িতে ছিল দুটি বড় ঘর, সঙ্গে ছোটঘরের মাপের একটি খোলা জায়গা, আধুনিক ভাষায় বলা যেতে পারে 'ডাইনিং স্পেস'। এই স্বল্প পরিসরের মধ্যেই ছিলো আমাদের আনন্দের আবাস, জমাটি আড্ডার বাড়ি — "কবিতাভবন"।

এই ফ্ল্যাটেই আমি জন্মেছিলাম, বড় হয়েছিলাম, আমার জীবনের প্রথম বাইশ বছর কাটিয়েছিলাম পরিপূর্ণ আনন্দে। আশৈশব দেখেছি বাবা টেবিলে বসে লেখেন। দিনে লেখেন, রাতে লেখেন। বাইরে বেরোন না একেবারেই। কিন্তু আমাদের বাড়িতে বাবার কাছে লোক আসার বিরাম নেই। অনেক কথাবার্তা, অনেক বই, অনেক চিঠিপত্র, আর এই আড়াই ঘরের পরিধির মধ্যেই অনেকগুলি ছোট ছেলেমেয়ের দৌরাত্ম্য। আসলে দোতলা-তিনতলা মিলিয়ে একই পরিবার ছিলাম আমরা। অজিত দত্তর চার পুত্র এক কন্যা। আমরা দুই বোন এক ভাই— একই প্রজন্মভুক্ত আটটি বাচ্চা। আমার ছোটবেলা ছিলো সমবয়সী সান্নিধ্যে জমজমাট।

আবছা স্মৃতিতে দেখি বাবা, টুনুকাকা দু'জনেই কোন একসময়ে বাইরে কাজ করতে যেতেন। দু' জনেই কিছু নিয়ে ফিরতেন বাচ্চাদের জন্য। বাবা দিতেন চক, যা দিয়ে আমাদের বাড়ির লাল সিমেন্টের মেঝেতে আমি মনের সুখে চিত্রবিচিত্রি করতাম (শুনেছি এইভাবে খেলাচ্ছলেই আমাকে লিখতে শিখিয়েছিলেন মা), আর টুনুকাকা আনতেন লজেন্স - টফি যার জন্যে আমি ঠিক সময়ে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে থাকতাম। কখন থেকে যেন বাবা দেখি সব সময় বাড়িতেই থাকেন, লেখার টেবিলটাই তাঁর কর্মস্থল, যে টেবিলের তলায় ঢুকে বসে থাকা ছিল আমার কাজ। সেখান থেকে নানা প্রশ্ন করে বাবার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করতাম। এর একটি নিটোল ছবি ধরা আছে তাঁর "জলে থাকে মাছ" নামে অনবদ্য এক ছোটদের গল্পে।

আমি দুষ্টু ছিলাম। ভীষণ ভালো দিদি আর ভীষণ লক্ষ্মী ভাই-এর মাঝখানে পড়ে প্রাণান্ত। এই দিদির সঙ্গে প্রতিযোগিতা, এই পাপ্পার সঙ্গে। কখনো বাবার মনোযোগ কাড়তে চাই, কখনো মায়ের, নানা দুরন্তপনায় তাঁদের বিব্রত করে। এর একটি সুফল —বাবা - মা তাঁদের এন্তার ছোটদের গল্পের নায়িকা বাছলেন আমাকে। দুষ্টু মেয়ের ভালো হবার গল্প, তার বিচিত্র কৌতূহলের গল্প, তার প্রথম দুঃখ পাবার গল্প। বাবা পরপর লিখেছিলেন রুমি, পরী-মা এবং বাবার মধ্যে পত্র বিনিময়ের কবিতা, যার সূচনা হয়েছিল আমার ছ'বছরের জন্মদিনে। তখন পাপ্পা জন্মেছে, অতএব মা-র পাশে শোবার অধিকারচ্যুত হয়েছি আমি; বাবা শুতেন আমাকে নিয়ে আলাদা বিছানায়। সেই সময়েই বালিশের তলায় জন্মদিনের উপহার রেখে দিয়েছিলেন বাবা — একপাতা চকোলেট আর "পরী-মা'র পত্র রুমিকে" কবিতা। আজকের ছ'বছরের বাচ্চা নিশ্চয়ই পরীতে বিশ্বাস করে না, আমি কিন্তু করেছিলাম। এই বছর থেকেই বাবা তিথিডোর লেখায় হাত দেন। বছর ধরে তার আয়তন ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে বেজায় দুশ্চিন্তিত হয়ে বাবাকে বলেছিলাম, 'এতো বড় বই লিখো না বাবা, আমি পড়তে পারবো না'। শুনে বাবা শুদ্ধ বাড়ির সকলের সে কী হাসি! আমি যদিও বুঝলাম না এতে এতো হাসির কী আছে।



আসলে, বাবা বই লেখেন, এবং সেগুলো ছাপা হয়ে আসে দেখতাম, কিন্তু এই কর্মের তাৎপর্য জানতাম না। লেখক হওয়াটা যে বেশ বিশেষ ব্যাপার সেটা বহুদিন বুঝিনি। বুঝবোই বা কী করে? শুধু বাবা তো নন, মা -ও তো লেখেন, বাড়িতে যারা আসে যায় তারাও শুনি লেখে। কেবল লেখাপড়ার কথা সারাদিন, আমার একটুও ভালো লাগে না। এমন কি দিদিও গম্ভীর মুখে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল চুষতে চুষতে কেবলই বই পড়ে। আমার সঙ্গে খেলেও না কথাও বলে না। ধুস! বই দেখলে রাগ ধরে আমার, লেখাপড়ার ছায়াও মাড়াতে চাই না আমি, স্কুলে যাওয়া বিষবৎ। দুই শান্তবাধ্য ছেলেমেয়ের মধ্যিখানে মূর্তিমান সমস্যা এই বুনো কন্যাকে বাগ মানাতে নাস্তানাবুদ বেচারা মা-বাবা। আমি যে একদম লক্ষ্মী মেয়ে নই —দিদির মতো ভদ্র বাধ্য নই, পাপ্পার মতো শান্তশিষ্ট নই, দুরন্তপনা করি, পড়াশুনো করি না, স্কুলে যেতে কাঁদি আর সব সময় খেলার সঙ্গীর সন্ধানে তেতলায় বা বাড়ির পেছনের উঠোনে চলে যাই— এই সব আমি খুব ভালো করেই জানতাম। কিন্তু যতো ওঁরা আমাকে মিমি-পাপ্পার সঙ্গে তুলনা করে 'ভালো' হতে বলতেন, ততোই আমি বেঁকে বসতাম। এই জেহাদ কতদিন চলতো কে জানে, কিন্তু আমি দশ পার করতে না করতেই শরীর ঢাকতে মা আমার সব স্বাধীনতা হরণ ক'রে ছয়গজি শাড়ির বেড়িতে বেঁধে ফেললেন আমাকে। সহসা বড় মেয়ে হয়ে যেতে বাধ্য হলাম।

পড়াশুনোয় অনীহা থাকলেও, কবিতা লেখায় আমার আলস্য ছিলো না। বছর সাতেক থেকেই খাতা ভরে ভরে কবিতা লিখি আর বাবাকে দেখাই। দিদি আর টুনুকাকার দুই বড় ছেলে মিলে বের করেছিলো সুন্দর হাতে লেখা পত্রিকা 'কাকলি'। ওদেরই বা তখন বয়স কতো? দশ থেকে বারো। একাধিক সংখ্যা বেরিয়েছিলো 'কাকলি'র — তার চেহারা যতো সুন্দর, লেখক তালিকাও তেমন চমকপ্রদ। পৃথ্বীশ রায়চৌধুরী নামে এক তরুণ প্রতিভাবান চিত্রকর যিনি যক্ষারোগে অতি অল্পবয়সে মারা গিয়েছিলেন বলে আমার ধারণা — 'কাকলি'র মলাট এবং ভেতরের ছবি এঁকে দিতেন। পত্রিকা প্রকাশ করা, গল্প কবিতা-সম্পাদকীয় লেখা, ভালো লেখকদের থেকে লেখা জোগাড় করা, অঙ্গসৌষ্ঠবের দিকে নজর রাখা—এ সব ছিলো স্বাভাবিক বৃত্তি। আসলে শিশুরা যা দেখে বড় হয়, সেটাই তো অনুকরণীয় ভাবে।

আমাদের প্রকাশনা চালানোর কাজে হাতেখড়ি হয়েছিলো বাবার কাছেই। বাইরে বাইরে খেলে বেড়াবার স্বাধীনতা খর্ব হবার পর থেকেই দিদির সঙ্গে আমারও ডাক পড়তো বাবার কাজে সাহায্য করার জন্য। এরমধ্যে 'কবিতা' পত্রিকার কাজই প্রধান। পত্রিকা খামে ভরা, সুতো দিয়ে বাঁধা, গ্রাহকের খাতা দেখে ঠিকানা লেখা, নতুন গ্রাহক হলে তার নাম তোলা, কেউ ছেড়ে দিলে তার নাম কাটা, কারো চাঁদা বাকি পড়লে তাকে চিঠি পাঠানো — এই সব আর কি!

হঠাৎ সেদিন রাশিকৃত পুরোনো কাগজপত্রের স্তূপের মধ্যে, 'কবিতা'র সেই গ্রাহক খাতাটি খুঁজে পেয়েছি। ছেঁড়া খোঁড়া অবস্থা। কিন্তু পাতা খুলে সব স্মৃতি হৃদয় আলোড়িত করে ফিরে এলো। সব স্মৃতিই ২০২ রাসবিহারী এ্যাভিনিউর — চোখের সামনে ভাসছে সেই বড় ঘরটি —বই বই আর বই— আলমারির পর আলমারি চারদিকের দেয়ালে— ঢুকেই বসবার ব্যবস্থা, ঘরের অন্য প্রান্তে উত্তরের সরু বারান্দা ঘেঁষে বাবার লেখার টেবিল আর খাট। যে

কেউ যখন তখন এসে উপস্থিত, লিখতে লিখতে বাক্য অর্দ্ধসমাপ্ত রেখেই কলমের মুখ বন্ধ করে উঠে গেলেন বাবা, চেনা-অচেনা সব অতিথিই সমাদৃত। স্বপ্ন মনে হয়।

বাবার প্রুফ দেখার গল্প এখন কিংবদন্তী। বই যাতে নির্ভুলভাবে ছাপা হয়, সেই প্রচেষ্টায় তিনি অসংখ্যবার প্রুফ দেখতেন। তা ছাড়া প্রুফেই অদল বদল করতেন বহুবার। ক্রমশ মেয়েদের তিনি তাঁর প্রুফ দেখার কাজে শরিক করেছিলেন। আমাদের ব্যবহার করতেন তাঁর দ্বিতীয় চোখ হিশেবে — দেখতে দিতেন তাঁর সযত্নে দেখে দেওয়া প্রুফ, যদি বা কোনো ভুল চোখ এড়িয়ে গিয়ে থাকে! সে প্রায় চ্যালেঞ্জের মতো ব্যাপার—বাবার চোখ এড়ানো ভুল বার করতে পারলে দারুণ গর্ব হতো। প্রুফ পড়তে পড়তেই প্রুফ দেখার কারিগরি শিখলাম, বাবার বানান পদ্ধতি আয়ত্তে এলো, তাকে আত্মস্থ করলাম অজানিতেই। কমা এবং উর্দ্ধকমার ব্যবহার, ওকারের ব্যবহার, হ্রস্ব ই দীর্ঘ ঈ -র ব্যবহার, তালব্য শ-এর ব্যবহার আমার হাতে এখনো বাবার ধরনেই আসে — আজকাল যে ধরনের বানান চলছে তাতে এখনো অভ্যস্ত হ'তে পারিনি।

শেষ পর্যন্ত আমরা চিঠিপত্রও লিখতাম বাবার হয়ে। রাশি রাশি কবিতা আসতো 'কবিতা'য় প্রকাশের জন্যে। প্রতিটি পড়তেন বাবা, তাঁর মনোনীত হওয়াটাই একামাত্র মাপকাঠি, লেখকের নাম পরিচিত বা অপরিচিত তাতে কিছু এসে যায় না। মনোনীত হ'লে একরকম বয়ান আর অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠাবার আর একটি বয়ান তৈরি ক'রে দিয়েছিলেন বাবা। সেই নমুনা অনুসারে চিঠি লিখে দিতাম দিদি বা আমি, বাবা সই করতেন নিচে, অথবা লেখা হতো 'বিনীত নমস্কারান্তে, কবিতাভবন'।

কাদের সঙ্গ পেয়ে বড় হয়েছি কবিতাভবনে? সে তালিকা বিশাল, তবু সাহিত্যিক আড্ডার প্রাণকেন্দ্র এই ছোট্ট ফ্ল্যাটটিতে কারা কারা বিভিন্ন সময়ে পরিবারভুক্ত ছিলেন সেটুকু হয়তো বলা দরকার। একদম ছোটবেলায় যাদের দেখেছি তাদের সবাইকেই জানতাম কাকা-কাকিমা অথবা মাসি হিসেবে। অবশ্যই এর শীর্ষে আছেন টুনুকাকা এবং কাকিমা। ঘনিষ্ঠ বলে জানতাম কামাক্ষী কাকা -রেখা কাকিমা, দেবীকাকা -আভা কাকিমা, ছোটকাকামনি (পঙ্কজ দাশগুপ্ত)-লীলা কাকিমা, সুধীরঞ্জন কাকা -হৈমন্তী কাকিমা (আসল নাম কল্যাণী মুখোপাধ্যায়) মনীন্দ্র কাকা - বুলিমাসি (তপতী মুখোপাধ্যায়), পরিমল কাকা-রানী কাকিমা, নিরঞ্জন কাকা (প্রভাত মুখোপাধ্যায় ), সুভাষ কাকা, জ্যোতিকাকা , শম্ভু কাকা এবং সৌরেন সেন, যিনি ছিলেন শুধুই কাকা। অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তকে কখনো সখনো দেখেছি , তাঁকে অচিন্ত্যকাকা বলেই সম্বোধন করা হতো, প্রেমেন্দ্র মিত্রকে আমি বাড়িতে আসতে দেখিনি। অন্যদিকে সমর সেন এবং বিষ্ণু দে — যাঁরা বাড়িতে ঘনঘনই আসতেন —তাঁদের কিন্তু সামনাসামনি কোনো সম্বোধন কখনো করিনি। যতোক্ষণে সঞ্জয় ভট্টাচার্য, আবু সয়ীদ আইয়ুব, অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ, শিবনারায়ণ, অম্লান, এঁদের ঘনিষ্ঠভাবে আমার চেনার সুযোগ হয়েছে, ততোক্ষণে আমাদের বাড়ি থেকে কাকা, মামা, দাদা বলার পাট একেবারেই উঠে গেছে।

বড়দের নাম ধরে 'আপনি' জুড়ে সম্বোধনের ব্যাপারটা চালু হয়েছিলো অরুণ সরকার-অশোক মিত্র-নিরুপম চট্টোপাধ্যায় আমাদের পরিবারে আসার পর। নরেশ গুহ -ই একমাত্র যাঁকে 'নরেশদা' ডেকে দাদার সম্মান দেওয়া হয়েছিলো। তিনি অরুণ-অশোক-নিরুপমের সঙ্গে পরে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেও আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন এঁদের আগে। বাবাকে সরাসরি বু.ব. ব'লে সম্বোধন প্রথম করেন এঁরাই, মা-কে বলতেন প্রতিভা বসু—উল্টে এঁদেরও



আমরা শুধু নাম অথবা পদবী -সহ নাম ধরে ডাকতে শুরু করলাম। সেই শুরুই এই রেওয়াজের শুরু। পরবর্তী কালে যারা আসতেন, সাগরময়, সন্তোষকুমার ঘোষ, সুনীল, শক্তি, অলোকরঞ্জন শ্যামল, প্রণবেন্দু, মানব, দীপক, অমিয়, নবনীতা, দিব্যেন্দু, যাদবপুরের একরাশ সিনিয়র ছাত্র- বন্ধু, অথবা দিদির প্রেসিডেন্সীর বন্ধু অমর্ত্য, জ্যোতি, মৃণাল, সুনীতি ইত্যাদি কাউকেই দাদা বলার প্রশ্নই ওঠেনি আর। আমাদের অন্যান্য বন্ধুরাও এই নাম ধরে আপনি বলার দলেই ভিড়লো।

কবিতাভবনে বাবার কাছে যাঁরা আসতেন তাঁরা যেমন অচিরেই পুরো পরিবারের আপন হয়ে উঠতেন, আমাদের বন্ধুবান্ধবেরাও বাড়ির একজন হয়ে যেতো অনায়াসে। এখন বুঝতে পারি, আমাদের বাড়িতে এমন এক অন্তরঙ্গ খোলামেলা আবহাওয়া ছিলো, যা তখন অন্য পরিবারে সহজলভ্য ছিলো না। সদর্থে সাম্যবাদী পরিবার, যেখানে বয়সের তফাৎ, যোগ্যতার পার্থক্য এবং লিঙ্গবৈষম্য কখনোই বাধা হতো না বন্ধুতায়, আড্ডায়, আলোচনায়। সন্তানদের, তাদের বন্ধুদের, কনিষ্ঠ কবি-সাহিত্যিক ও বাবার সরাসরি ছাত্রদের সমকক্ষের সম্মান দিতেন আমার বাবা -মা। সেই সঙ্গে বয়োঃকনিষ্ঠের প্রাপ্য স্নেহ ও প্রশ্রয়ও সকলের ওপর বর্ষিত হতো অকৃপণ ধারায়। এমন সুখ আর কী হতে পারে? কবিতাভবনের আড্ডা তাই এখন কিংবদন্তী, যে স্বাদ পেয়েছে সে কখনো ভোলেনি, ভুলতে পারা যায় না বলেই।

এমন পরিবারে, এমন পরিবেশে, জন্মানো —বড় হওয়া — যে কতো বড় সৌভাগ্য সেটা ছোট বয়সে তো বুঝিনি, এখন বুঝি। সবই ছিলো সহজলভ্য, কী করে জানবো তার মূল্য? আজ যখন সব কিছুই স্মৃতিতে পর্যবসিত, দৃশ্যের পর দৃশ্য ভেসে ওঠে চোখের সামনে, অনেকটা পথ পেরিয়ে এসে উপলব্ধি করি কবিতাভবনে বেড়ে ওঠার অভিজ্ঞতা আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি।

## বসন্ত-প্রশস্তি

আজ ঘরে-ঘরে মিলনোৎসব!
শাখায়-শাখায় নব-কুসুমের সাড়া।
তাই চির-পাগল চির-বাঞ্ছিতকে বরণ করে' নেবার আগ্রহে ধরণীর
আজ চির-ধূসর বিরহ-শয্যা জুড়ে নব-সাজের আয়োজন!
তাই মাটীর কুঞ্জে-কুঞ্জে প্রেমের মধুর গুঞ্জন, আম্র-শাখায়-
শাখায় নব-কিশলয়ের উদ্দাম আনন্দ-নৃত্য!
এমন দিনে কি তোমার কাজ হবে, বন্ধু? — বসন্ত কি তোমার কাছে
শুধুই ক'টা পাতা দিয়েই চলে যাবে? — মধু-মলয়ের
হিল্লোলে কি প্রিয়া'র আগমনীর বার্তা পাও না?
না, না, বন্ধু! এমন দিনে কাজ হ'লে তুমি কাঁদবে কেমন করে'?
বসন্তকে বরণ করে' নাও তোমার অন্তরে! ...
যৌবনী মন — মাটীর-বিজয় অসীম উন্মাদনা
আকাশের নীল বসন্ত-সজ্জা-উন্মেষে!

১

---

আজ থেকে প্রায় ৭৩ বছর আগে বুদ্ধদেব বসুর হাতে লেখা 'প্রগতি'-র এই সংখ্যাটিতে সঙ্গত কারণেই সময়ের জীর্ণ ছাপ পড়েছে। এই ফ্যাক্সিমিলি মুদ্রণে কিছুটা অস্পষ্টতা থাকলেও দু-একটি জায়গা ছাড়া পাঠোদ্ধারে তেমন কোনো অসুবিধে হয়নি। পুরো সংখ্যাটিই মুদ্রিত আকারে আবার পরে দেওয়া হলো। বাংলা পৃষ্ঠানম্বরগুলি মূল পাণ্ডুলিপির।— সম্পাদক।

প্রণতি — চৈত্র, ১৩৩৩

নাই বা দিল প্রিয়া'র সিঁথির কমল তাঁর মনের দুঃখের বক্ষে
তোমার ললাটে এঁকে — তাঁর অভিষিক্ত কর অশ্রুজলে
তোমার সিংহাসনে তোমার হৃদয়-মন্দিরে অর্চনায় সুখের
একতারায় হউক তাঁর যে মঙ্গল-গীতি গান
এমন দিনে কামনা কর অনন্ত বিরহ! মিলনের এতটুকু অবকাশ দাও-
নাই বা হইল মিলন, তোমার উৎস মিলনের শূন্য তীর্থ! ঐ
অনন্ত-দুয়ার সুদূরের আড়াল-সহ দৈব হওয়া যায়
যে যুগ-যুগান্তরের বিরহীর এত দীর্ঘশ্বাস! তাই দিগন্ত
কাঁদে করে' আকাশের বুক চিরে' কাল-বৈশাখীর ঝড়-বাদল
আসে — মিলন-বিরহী কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরীকে ধূলায় লুণ্ঠিত
করে' দিয়ে যায় বার-বার!
তাই বলি বন্ধু, আমার কথা শোন, প্রিয়া'র অশ্রু-রস-প্রতীক্ষায়
আশার প্রদীপ জ্বেলে দীর্ঘ-শর্বরী কেঁদে কেঁদে জেগে কাটিয়ে
দিও না! এমন রাত ভোরে যায় তাঁদের সভায় —
তোমার হৃদয় মথিত করে' যে-কান্নার সুরা বেরিয়ে উঠেছে,
সেই সুরা-পাত্র হাতে ক্ষমা-সুন্দর পাত্র অশ্রু-রাজ্যের
রূপ-কামনা! তোমার কাজ সার্থক হউক উৎসব হউক
পরিপূর্ণ!

ঙ





চিত্ত মোর জাগে আজ —

"সব পৃথিবীর 'বধূ' মোরা" —

— শ্রীরাধাকৃষ্ণ বাগচী

বসন্তের দুকূল ছিন্নাম চিত্ত মোর জাগে আজ
সব পৃথিবীর অভুক্ত বেদনা; ধরিত্রী অপূর্ব দান
দিয়াছে, যতটুকু মালিন্য তবু ফিরে' আসে অশ্রু-ধারে;
গগনের ক্ষমা-অশ্রু যে মুক্ত করে কাঁদে সহিবারে।

অনাদি অতীত কাল যত দুঃখ রাতি
যাপন কাল-রাত্রি কাঁদায়ে হাসি'
দুঃখীর দ্বারে কি কথা, তাহারাই ধীর
আসিয়াছে হেথা মোর অশ্রু-নদী-তীরে।
বসন্তের বিস্মৃত কাকলীর গানে
নিস্তব্ধ চাহিয়া তাঁরা কাঁদিয়াছে অলক্ষ্যের পানে—
কাঁদিয়াছে গগনের অন্তরের ডাকি'—
তুমি মিলে' নাই! তোমারে চিনেছে ডাকি'
তাহাদের সকল কামনা, আপন সকল যন্ত্রণা,
নিশিদিন স্তব্ধ হয়ে সহিয়াছে সকল লাঞ্ছনা।
হেথা তাঁরা দুঃখ-হত অশ্রু-জল হতে
অনন্ত নিঃশ্বাস' দ্বারে, আবেগে আহত।
যে-সকল জনের ইতিহাস সব ভুলে' গেল—
মানবের চিত্ত হতে বিসর্জন গেল—
তাহাদের প্রতিভার আজি মোর দেহে

৩

প্রণতি – চৈত্র, ৮০২১

এই জল-নদিনীর তীরে বসায়ে নিষ্ঠুর স্নেহে
কত করে আকুল ভাবে ডাকিয়ে আমারে;
দেখ মেঘ যায় ভরি' বেদনার অশ্রু-মুক্তা-হারে।
নিরন্তর নিরব আলোয় অশ্রু-মুখে দীপ্ত আমি
হেরিয়াছি শুভ্র সমুজ্জ্বল। আনিকটা রাত আসি'
যা' দিল আমারে, তাহারে আসিত ভাস বেদনায় ভরে
সকল অন্তরে। বেদনায় উদ্ভাসিত নিমর অন্তরে
প্রাণের রাঙিমা-সন্ধ্যা গোধূলিরে লুকায়েছিল—
নিশ্চয় বেদনা-দুঃখে কাল-সাথে শান্ত হ'য়ে ছিল।
অন্ধকার মাতৃগর্ভে নিমগ্ন আনন্দ-ভরে
বেদনার ফুল-কলি অপূর্ব শান্তির লাগে
অপেক্ষিল অন্ধকারে। আজি তারা প্রভাত-বীণায়,
তাই তার ভয় ভেঙে গেছে। উচ্ছ্বসিত প্রস্ফুটিত হয়
করিতেছে মুক্তি দান, — নিশার হাসির মত
শুভ্র — প্রভাতের প্রাণ মুক্তি পেল। যত
অবরুদ্ধ আনন্দ-গীতি তাই বসে আমি
অসীমের মাঝে মগ্ন হই তুলি'; তাই পূজা সাজি
ভরিয়াছে উজ্জ্বল বেদনা-ফুলে, তাই অশ্রুভরা
ঝরাইয়া ফুলে-ফুলে শিশিরের মত পড়িতেছে গলি' হয়ে যে

আমার মুক্তা-গাঁথা হৃদয়ের হার, সকালে আজিও নিত্য
তাহারে ভুলিয়া যাই — আজি হেরি যে ব্যথা রয়েছে সঞ্চিত
নিত্যকালে করিত অশ্রুর আর উঠিয়া সকল
কম্পমান আমারে কাঁদালো ভুলিল যে আজ।





# লাল ও শাদা

সোমনাথ পাড়ুই

আমার বয়েস সাড়ে-তেরো বছর; সব জিনিস বোঝবার মত বড় আমি হয়েছি। মামা তো এ-কথাই বলেছিলেন, — তাঁকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি নে — না, পারি নে — যদিও আমার বিশ্বাস যে মামীমাই তাঁকে দিয়ে এ-কথা বলিয়েছিলেন — অবিশ্যি মামীমাকেও আমি কোনোকালে সইতে পারতুম না। তাঁরা দু'জনে মিলে যদি আমার মাথার ওপর গড় হ'য়েও ক্ষমা চায় এসে, তবু কোনো ফল হবে না।

পৃথিবীর সব চেয়ে সুন্দর জিনিসটিকে তাঁরা দু'জনে মিলে এমন ভাবে মুছে দিলেন যে তা একেবারে কুচিকুচি, ছিঁড়ে ছিঁড়ে হয়ে উঠলো; — সে কথা আমি ভাবতেও পারি নে। আমি জানি যে এখন স্কুলের সঙ্গে আমার দেখা হ'লে আমি হ'য়ে উঠবো লাল আর সে হ'য়ে যাবে শাদা, অথচ আমরা হাইস্কুল নিয়ে না হয় তো দিনটি ভালো কি মন্দ সে-কথা ভুলে' ততক্ষণ আবোল-তাবোল বকতে — তাদের মত স্টীমারের পাড়ি এক অন্যকে ছেড়ে দূরে চ'লে যাবে। আমাদের মনে হবে যে একটা জিনিসকে নিয়ে আমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত যাতে মস্ত লজ্জার কিছু তো নেই-ই, বরং আনন্দের অনেক কিছু-ই না, দুটি লোক একসঙ্গে যতদূর আনন্দ সম্ভব কাটাতে পারে, সে রকম তাই।

অনেক সময় ভাবি যে, আমরা যতই বড় হ'তে থাকি, ততই কি বোঁচকা হ'য়ে উঠতে থাকি সবাই? আমরা সবাই কি সব জিনিসকে নোংরা ক'রে, বেঁকে-চুরে দেখি, আর যা ভালো, তা কি কখনোই দেখতে পাই নে? তাই হয় নাই হয়, আর সেই জন্যে

প্রগতি – [illegible]

আমি বড়দের কাউকে খুঁজে [illegible] পারি নে, নেহাত মামা-মামী
মামাকে দেখতে পারি নে। আমি কোথাও পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে থাকব
না হয় সন্ন্যাসী হ'য়ে গিয়ে বাকী জীবনটা খুনির কথা ভেবে আর
অন্য সব কথা ভোলবার চেষ্টা ক'রে কাটিয়ে দেব।

কিন্তু তার আগে আমি সব কথা খুলে বলতে চাই। তা
এই আশাতে যে এমন একজন অন্তত: কেউ কোথাও আছে যে সমস্ত
ব্যাপারটা ঠিক সত্যি ব'লে বুঝতে পারবে।

আমার নাম জোরিয়ান ফোর্টেস্কু। আমার জন্মের সময়
মা মারা যান ব'লে তিনি আমাকে ভালোবাসবার সুযোগই পান
— অবিশ্যি বেঁচে থাকলে তিনি নিশ্চয়ই আমাকে ভয়ানক ভা[illegible]
বাসতেন। আমার বাবা যখন শুনলেন যে মা [illegible]
তাঁর শোবার ঘরে ঢুকে গিয়ে মাথা খুঁড়ে [illegible] গিয়ে
সুন্দর দিন আমরা হারালুম।" [illegible]
নিজেকে গুলি ক'রে মারলেন।

এ-জন্য সর্বদাই আমা[illegible]
গর্ব ছিলো। একদিন শুনলাম [illegible]
জানিয়ে বলছেন, "উনের কাছে [illegible]
ছিলো।" তবে আমি তেমন চট [illegible] আমার মোটেও
[illegible] এসব সব কথা বললাম, যা [illegible]
উচিত হয় নি। একটা ভীষণ কান্না-কাটাকাটির [illegible]
মামা বললেন যে আমি নাকি অত্যন্ত [illegible]
— সবার কাছে বলে, তা নাকি আমি [illegible]
আমি বললাম, "আচ্ছা বেশ, [illegible]
বলে তা আপনারা জানবেন না, জানবেন [illegible]।"
তারপর খুব এক চোট মার খেলাম — [illegible] দিয়ে [illegible]





লোভ ও আশা

আর মাটি দিবে দুই। তা হোক — তাঁর জন্য আমি একটুও দুঃখ
আফসোস করি নি; — আমি যা বলেছিলাম তা তো সত্যি।

তাঁরা আমায় কোনোদিন কোনো ভালো ইস্কুলে পাঠান নি —
অন্য ছেলেদের যেমন পাঠানো হ'য়ে থাকে — সেখানকার "ওল্ড
সাজেন্ট" বা যাই হোক — তার জন্যে। আমার মনে হয় আমায় নিশ্চয়ই
কোনো ইস্কুলে দিলে বেশ সাফল্যমণ্ডিত "আর" হ'য়ে ফিরে এলেই
হ'ত — [illegible]।

বারো বছর বয়েস অবধি আমার জন্য ভালো-মন্দ নিয়মিত
রাখা হয়েছিলো। তাঁরা সবাই মামার লোকজন — তাঁর কথায় চলে
দিতেন; কেন না, কোনো দিন কখনো তাঁদের কোনো কাজ করেননি।
তাঁরা আমায় ব্যাকরণ ও অঙ্ক কষতে শিখিয়েছিলেন — আর কিছু
[illegible] ও উইলস — এ কেবল, যেন আমায় [illegible]
[illegible]।

আমরা একটা মস্ত বাড়িতে থাকতাম। বাড়িটায় অন্ধকার
সব জায়গা [illegible], কিন্তু তা অন্ধকার হয় নি, কারণ একটু
খানি খুলে, বাড়ির [illegible]। সারাটা জায়গা ইঞ্চি মাপিয়ে
ভাগ-করা [illegible]। বারো তো, ছোটো ক'রে ছাঁটা ঘাস, উঁচু
প্রাচীর, [illegible] ছোটো লাল রাস্তা, তাতে বেড়া-দেয়া বড়ো
গাছ — এই সব। —

বাড়ির ভেতরটাও সমান বিচ্ছিরি। সব জিনিসেরই একটা
মাপা-জোখা স্থান ছিলো যেন। একটা জিনিস আধ-ইঞ্চি মাত্র
এদিক-ওদিক সরালেও তা ঠিক জায়গায় ফিরে আসতো রোজ।
কখনো [illegible] মামার ঘর-বাড়ি পরিষ্কার করা হ'তো, বাড়ির সমস্ত
আসবাব-পত্র ঘুরে ক'রে রাখা হ'ত — আর কার্পেটের দুধারে একটা
একটা ধ্যান ক'রে থাকতো — এত প্রত্যেকটি টেবিল-চেয়ার

## প্রকৃতি — চৈত্র, ১৩৩৩

তেরটা কোথায় যাবে, তা ভাবা যাচ্ছে না। স্কুলের মতো যে একটু মেজাজ, অগোছাল হবে, এমন কোনো কারণ খাওয়া যাচ্ছি টের ছিলো না। এমন কি বইয়ের ছবিগুলোও সেই একই রকম — কাঠিকাঠির গায়ে-গায়ে সেঁটে-টাটা, যাঁটাগুলো মুলিয়ে-রাখার মতো।

বিজয় কাপুর ও জোহুরিলালের চরিত্রে মাথা-মাথানি মানুষ মাত্রই হবে বোধহয়। তাঁদের কাছে কোনো জিনিস, হাতি বেঞ্চ, এমন কথা আমি জীবনেও শুনি নি। তাঁর ওখানের মধ্যে মানিয়েও ছিলেন। তাঁদের প্রতি [illegible] ঠিক এই মুহূর্তে গিয়েছ হাঁটু গেড়ে বসেছেন, তাঁর নিজস্ব [illegible] ছিলো যে কখনো এক সেকেন্ড দেরী হলেও [illegible] দুটো [illegible] তাঁর মুখের ওপর [illegible] করে দেখো

আমার মনের মত কোনো [illegible] কথা আলাপ হয় নি। তাঁদের চেনা-শোনা [illegible] ছিল বেহদ্দ সাহেবি — আর [illegible] ঢাকা থাকতো। ও মুখে সর্বদা এই কথা শোনা যেত — "না [illegible] ভারিয়া ও কাজটি কিছুতেই করা যাবে না।"

আঃ — একটা মনে যে কত [illegible] যা ছিলো যে বলতো! — এমন কেউ, যার সঙ্গে গল্প [illegible] না ছুঁ দেখতে পারতুম! [illegible] জো, দূরে-কোথায় যারা হত [illegible] কথাটা আমার নিজের [illegible] — [illegible] এ কথা ওখানকার লোকেরে রাখতে হত [illegible] লুকি দিয়ে করতাম, আমি [illegible] মত [illegible] চুপ আঁকড়ে থাকতাম। কিন্তু যখন [illegible] "তখন না "হাঁ, বেশ" বলে ওঠার মত কেউ থাকত না, তখন।





## লোক ও আমি

খুব ভালো লাগে না। আমার সেই শিক্ষয়িত্রী যখন চলে গেলেন আর আমাকে গাঁয়ের মাঠ-প্রান্তরে ভর্তি করে দেওয়া হল, তখনও আমার একটুও যে বিশেষ ভালো হল, তা নয়।

ওখানে আরো কত-গাঁয়ের লোক ছিলো — ছেলেরা, মেয়ে-মানুষ। তাদের মুখে রঙ, চোখে লোভ লাগানো। তাঁরা [illegible] দেখতে [illegible] হয়, [illegible] আমি [illegible] আর কেউ [illegible] ফুল ভালো ছিলাম বলে, আর — আর, আমার মত দেখতে খুব সুন্দর ছিলেন কিনা — লোকের বলতো যে আমিও দেখতে অনেকটা তাঁর মত হয়েছি। তা ছাড়া, Rhododendron-গুলো কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে, ওদের ফুলগুলো কি-রকম হাসতে যাচ্ছে বলে মনে হয়, এই সব কথা বলতাম বলেও ওরা আমার ওপর যারপরনাই চটে যেতেন। ওরা বলতো যে আমি চালাকি দিচ্ছি; কিন্তু সত্যি আমি চাল দিতাম না। [illegible] নানারকম সুন্দর রঙ আর মিষ্টি আওয়াজ লক্ষ্য না করে আমি পারতাম না, আর কেউ সে-সব নিয়ে কথা-বার্তাই বা বলবে না কেন, তাও আমি বুঝে উঠতে পারতুম না। [illegible] নিজে চাইতে এ-সব যে বেশি ভাবে।

ওরা [illegible] এর মত মুখোমুখি হলেও যে ওদের খুবই [illegible] ছিলো বলে মনে হয়। ভালো-কিছুর জন্য ওদের চোখ বা কান-কিছুই ছিলো না। একবার আমার মনে আছে, একজন ছেলের অনেক বলে যেতে দেখবার পর আমি ওদের [illegible] জিজ্ঞেস করেছিলুম যে কখনো কোনো মেয়েকে [illegible] কিনা, আর তা কেমনই বা লাগে। মেয়েদের মধ্যে দু'একজনকে দেখতে এত সুন্দর ছিলো যে আমার [illegible] করেছিলো তাদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে; আমি কোনো মেয়ের সঙ্গে কখনো কথা বলি নি জন্মেই বলে।

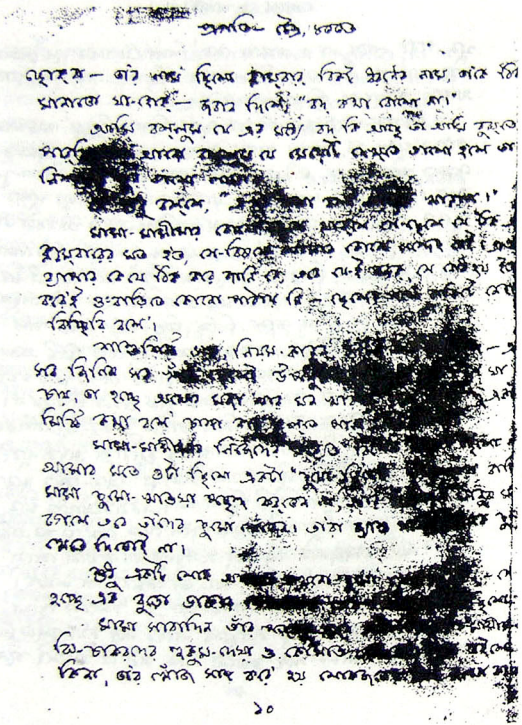





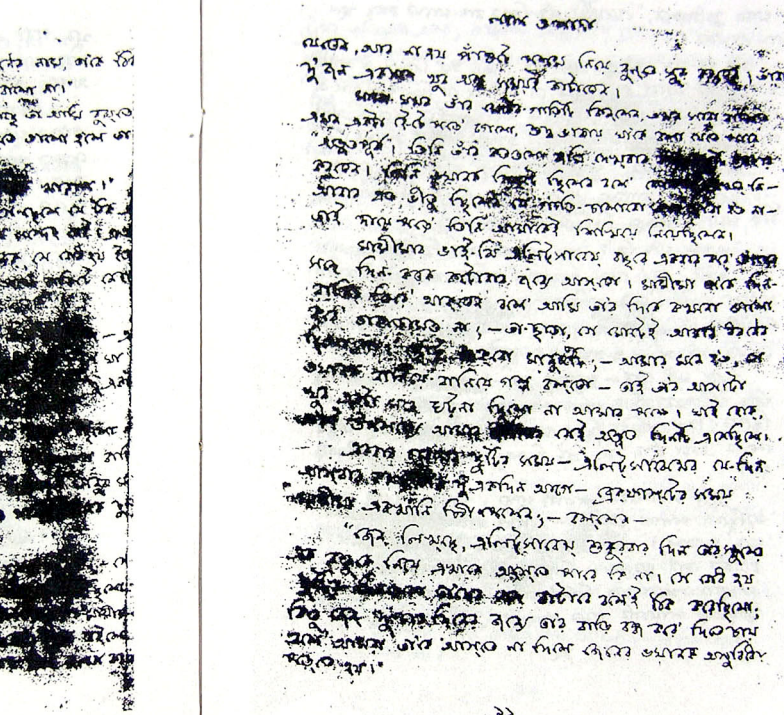

[illegible]

মামা [illegible], "[illegible] নিজের বাপ-মায়ের কাছে চলে যায় না কেন?"

"[illegible]। [illegible] সে লিখেছে যে [illegible] ও এলি- [illegible] করেছেন।"

মামা বললেন, "[illegible]"

"[illegible] গাড়িতে [illegible] — [illegible] ঠিক সময়ে [illegible]"

"আচ্ছা মন্দ কি? যাও; আমাকে আর [illegible] না।"

একটি নতুন মেয়ে আমাদের [illegible] আমার মনটা [illegible] খুশি [illegible], কিন্তু [illegible] এলিয়টসাহেবের মত [illegible] দেখতে পাবেন — এ-কথা ভেবে খুশিটা [illegible]।

[illegible] — [illegible] দিয়ে ইস্টিশনের দিকে [illegible]। [illegible] ছিলো; কিন্তু গাড়িটা ছিলো লেট [illegible] যদিও [illegible] একটা ঠাণ্ডা-মত দিন ছিলো। তাই [illegible] হল।

সুন্দর সকালবেলা — ভারি সুন্দর। [illegible] — [illegible] মনে হচ্ছিলো। [illegible] ভুললাম — [illegible] গাড়ি আসবার এখনো দশ মিনিট বাকি; [illegible] করে লাগলুম। [illegible]

১২



[illegible]

ট্রেনের আওয়াজ এলো; ভাবলাম এখুনি যে ট্রেন এসে পড়বে, আর তারি এক কামরায় এলিয়টসাহেবের ঘুমমাখা দেখা যাবে — কিন্তু [illegible] তাকে তুলে নিতে ইস্টিশনে না আসে, সেই [illegible]। কিন্তু ট্রেন যখন এল [illegible] এলিয়টসাহেবের [illegible] কোনো চিহ্ন দেখতে পেলুম না। গাড়ির [illegible] কামরার দিকে [illegible] ঘুম [illegible] ছিল; — [illegible] দেখি নি।

ছোট্ট ঘুমমাখা [illegible] তারই রঙের ফুল — লালচে-সোনালী — তার মাঝে-মাঝে নীলচে আভা। [illegible]। এসব বিলিতি অর্কিড-গাছের [illegible] কি করে লিখতে হয়, জানি নে; শুধু জানি যে স্বর্গেও তার চাইতে সুন্দর কিছু নেই, থাকতে পারে না।

এলিয়টসাহেবের কথা সব ভুলে গিয়ে আমি ছুটে সেই মেয়েটির কামরার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম — আর একটিবার দেখে [illegible] ইস্টিশনে [illegible] এইটুকু [illegible] দেখতে পাব [illegible], [illegible]।

তারপর এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটলো। সে গাড়ির দরজা খুলে [illegible] — আর তার পেছনে গাড়িতে এলিয়টসাহেব [illegible] ঘুম [illegible] বসে আছে।

[illegible] আমি [illegible] দেখলাম, [illegible] ছুটে [illegible] দরজার দিকে, [illegible] — এলিয়টসাহেব নয়, সেই মেয়ে- [illegible]

"[illegible] নামই কি [illegible]?"

[illegible] আমার [illegible] না; [illegible] জানিনে [illegible] যে [illegible]।

[illegible], "কিন্তু তোমার নাম তো [illegible] না?"

"[illegible] না?"

১৩

[illegible]

... [illegible] যেতে বেশ ভালোই লাগবে। [illegible]

[illegible]

"তুমি তো বেশ, [illegible]।"

[illegible]

আমি ওকে বললুম, " [illegible]



[illegible] ও [illegible]

বিকেলে কি তুমি কোথাও যাবে?"

"যাব কি?"

"[illegible]। লাঞ্চের পর, [illegible]।"

ডাক্তারকে নিয়ে এলাম। তিনি [illegible] যে তাঁর কিডনি খারাপ হয়েছে। এ-কথা শুনে [illegible] কারণ তিনি [illegible] নিজের [illegible] খারাপ হয়েছিলো [illegible]।

[illegible] তিনি কিছুতেই যেতে দেবেন না, পাছে তাঁর পায়ের ছোঁয়া [illegible]। [illegible] এ-কথা [illegible] তাঁর ভয় ছিলো পাছে [illegible] ছোঁয়া, সেজন্যে তিনি নিজেই [illegible]।

লাঞ্চের সময় [illegible] হল, তা একেবারে [illegible] এ-কথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন যে [illegible] "বর্তমান অবস্থায় [illegible] আমি [illegible] চেষ্টা করেছি কি তাঁকে খুশি করে [illegible] — [illegible] দিয়ে যাবেন। [illegible] আমার আবেদনের [illegible] দিলেন।

[illegible] বললেন, "বিকেলে আমি একটু বেড়াবো, আর [illegible] তাঁর পড়বার ঘরে ব্যস্ত থাকবেন [অর্থাৎ ঘুমিয়ে থাকবেন]। তুমি [illegible] ভালোবাসো — একা তুমি কী-ই বা করবে আর!"

[illegible] বললেন, "[illegible], আমি [illegible] বই নিয়ে [illegible]।"—

[illegible] "দি [illegible]" নিয়ে তাঁর [illegible] চলে গেলেন। [illegible] পড়বার ঘরে, আর [illegible]।

[illegible]

[illegible] হবার জন্যে [illegible]

[illegible] "তোমার ভালো লাগলো?"

"[illegible]"

"তুমি কি [illegible]"

আমি [illegible] — "হুঁ।"

[illegible]

আমি বললাম, "হুঁ, [illegible] আমি। [illegible] একটু [illegible] হলো এবার। এখন যে তোমার [illegible]"

[illegible]

"তোমার [illegible]"

"[illegible]"





[illegible] । এ হলে আমাকে শুধু ভালো লাগতো [illegible]

"হুঁ।"

"আমাকে তো হলে তোমার ভালো লাগে?"

"হ্যাঁ— ভয়ানক।"

"কী মজা! এর আগে আর কেউ আমাকে [illegible] বলে তো মনে হয় না।"

"কেন? [illegible] না।"

"[illegible] না [illegible]।"

[illegible]

"[illegible] — আমার [illegible] এরই [illegible]।"

[illegible] কি [illegible]? [illegible]

[illegible]

"হুঁ। আমার [illegible]"

[illegible]

[illegible]

ও কথাগুলো কী মিষ্টি করে' যে বললো! — আমি আর শুনি নি।

আমি বললাম, "আমি কখনো কোনো মেয়ের সঙ্গে কথা বলি নি — সত্যি-সত্যি বলি নি, আর কি!"

"আমিও কখনো কোনো ছেলের সঙ্গে সত্যি-সত্যি কথা বলি নি। কিন্তু বলবার ভয়ানক ইচ্ছে ছিলো। 'ছেলে' বললাম, চটলে না তো?"

"না, বরং খুশি হ'লাম। মাসীমা আমাকে বলেন 'খোকা', আর মামা বলেন 'ছোকরা'। কী বিচ্ছিরি কথা! নয় কি?"

"প্রায় 'সাড়ে [illegible]' মতোই বিচ্ছিরি।"

"কী বিচ্ছিরি কথা! তোমার বয়েস কত?"

"ষোলো।"

"আমারও তাই — তোমার একটু বেশি। এ বয়েসটা [illegible] এর চেয়ে খুব বেশি বড় হ'তে আমি চাই নে। তোমাকে ছুঁয়েছিলুম বলে মাসীমা আমাকে [illegible] দিয়েছিলেন — মনে আছে? তুমি কিছু মনে করো নি তো?"

"তুমি আমায় ছুঁলে তাহ'লে আরো খুশি হ'বো।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ, কারণ আর কেউ ছোঁয় নি।"

ওকে প্রথমবার ছুঁলে তাহ'লে যে আমার কী-রকম লেগেছিলো, তা আমি বলতে পারবো না, আর ও যখন বললে যে আমিও তোমাকে না ছুঁলে ছাড়বো না, তখন আমার ইচ্ছে করছিলো ওকে জড়িয়ে ধরে।

বললাম, "খুকি, তোমার মত সুন্দর মেয়ে, তোমার মত লক্ষ্মী মেয়ে পৃথিবীতে আর নেই। তোমাকে ভালোবাসি, সর্বদা ভালোবাসি, ভয়ানক ভালোবাসি।"

ও বললে, "তুমি আমায় ভালোবাসো শুনে খুশি হ'লাম কারণ আমিও তোমাকে ভালোবাসি। তুমি আমায় না ভালোবা[illegible]





[illegible]

আমার মত দুঃখী, আমার মত লক্ষ্মীছাড়া পৃথিবীতে [illegible] পাবে না।"

আমি বলে উঠলাম, "তাহ'লে তোমার দুঃখী কি লক্ষ্মীছাড়া হবার আর কিছু দরকার নেই, কারণ এক মিনিট আগে [illegible] ভালোবাসি তোমাকে।" তখন [illegible] নিজের হাতে তুলে নিয়ে প্রায় এক যুগ ধরে [illegible], — ছোট্ট, হাতখানা, নরম, কোমলাঙ্গী। কেউ কোনো কথা বললাম না।

ব্যাপারটা অদ্ভুত বটে; কিন্তু মানুষের যখন ভয়ানক আনন্দ হয়, তখন সে কোনো কথা বলতে পারে না। ভাষার যত সুন্দর কথা তাই মনে হ'তে থাকে, কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও সে তা মুখে বলে উঠতে পারে না। কথাগুলো তাই [illegible] — [illegible] কিন্তু যখনই কোনো [illegible] মনে আসে, সে তা বলতে যায় আর বলতে পারে না [illegible] এই এ-হৃদয় [illegible] না-বলা কথাগুলো [illegible] মিলিয়ে গেলো আমার [illegible] আছে।

অনেক পরে আমি যখন খুব [illegible], তখন এমন একটা কথা বললাম যা নেহাৎ সময়ে বললে [illegible] আশা করে না।

"আজ রাতে তোমাকে [illegible] কথা আছে আমার।"

"হ্যাঁ, — ভারি মজা হবে, না?"

"এখন [illegible] অসুখ করেছে বলে মাসীমা রোজ হয় আমাদের খাওয়া বন্ধ করে দিতে চাইবেন। তাঁকেও আমাদের সঙ্গে আসতে বললেই [illegible] হয় না।"

"কিন্তু তিনি যদি 'হ্যাঁ' বলে' ফেলেন?"

"তা তিনি বলবেন না। কিন্তু তুমি বললে তিনি হয়-তো আমাদের বারণ করতে পারবেন না, — বুঝলে না?"

[illegible]

অবশ্য, তা হ'লে আমিই যাবো তাঁর।"

[illegible] আমরা সবাই [illegible] ঘুরে বেড়ালাম; বেলাবেলায় উমার মত লুকোবার [illegible] চেষ্টা করেছিলুম, সব জলে গেলো হ'ল। [illegible] আমার [illegible] এলো সোনার বীজের মতন তাদের দেখা [illegible] — একটা বিড়াল আর দুটো সাদা ইঁদুর আর একটা ময়না। [illegible] আমার কাছে আর একটুও সবচেয়ে — আমার হাত থেকে রুটির টুকরোও খেতো। [illegible] ওদের এক-একটি ক'রে ছুঁয়ে আদর দিলেন, [illegible] আমি এক-একটি ক'রে সব [illegible] খুলে দেখে [illegible] তাদের কাছেও। এ-সব কথা [illegible] করতে [illegible] খুশিতে এখনও তাকিয়েছিলো, কিন্তু কি ক'রে জানিনি, [illegible] [illegible] কথা দিলাম, তখন ঝুলির কাছে যা-খুশি [illegible] রাখলাম মনে, আর ঝুলিতে আমার কাছে যা-খুশি [illegible] রাখতো।

যা যাবার সময় যখন হ'ল, তখন আমাদের [illegible] কারো কোনো কথা ছিলো না — একটিও না।

মাসীমা বললেন, "বোকাটার তোমার [illegible] কারোর কথা ভাবছিলেন।"

ঝুলি বললে, "ঠিক কথা। আমারও কি [illegible] ফিরিয়ে আনবেন?"

"সে আবার", মাসীমা হেসে দিলেন; কিন্তু ঝুলি ও-কথা বলে কাঁদিয়ে দিলো। [illegible] আমি জানি মাসীমা আমাদের না ফেরার কথাই ভাবছিলেন। যাক — [illegible] উৎসাহে লেবার আমাদের মনে দিলেন, এক-বার-বার বলে দিলেন যে ফিরে এসে যাবে—তাঁর বেশি দেরী না হয়।

ইস্টিশনে সময় গাড়িতে উঠেছি দিলুম, তখন তাঁ [illegible]

২২



[illegible]

[illegible] করলুম আমরা। আঃ — সে যে কী! আমার [illegible] বুকে ঢুকিয়ে নিলুম; ঝুলি আমার গা ঘেঁষে ব'সে [illegible] মাথা তুলে উঠে-উঠে আমার মুখে এসে পড়ছে। আমার [illegible] গাড় গন্ধটা ইচ্ছে হ'ল, পাইলাম; — মনে হ'ল, [illegible] সঙ্গে আমার মনে গান করছে। অনিমেষ অবশ্য [illegible] দেখলুম আমরা, তাই দোর-আঁটার আগে দেখতে পাইনি সেসব।

উঃ সত্যি কথা [illegible] — ঝুলির মা-বাবার সেই কথুর। আমাদের [illegible] তিনটে মাস যাবে, এমন কি, নিশ্চয়ই একটা দোষ আমার দিকে চোখ দেবার মত ভয়-ভাবও তাদের ছিলো।

তাঁদের বাড়িতে একটা বয়স্কের এলোমেলোমির ভাব, — বেড়ুর মত অনিমেষ, আমার দেখে বেড়ানো — যার যেমন খুশি, তাই হয় বেশ। একটা ইঁট-কাঠের নীচে এক বেড়াতে [illegible] [illegible] দেখলুম; আর বাড়ির এক কোণে তিনটে একটু বেশী ক'রে [illegible] ব'সে হ'ল-এ দাঁড়িয়ে তুলো-টুলো খুঁজে বেড়ালে — [illegible] একটা ছাড়ার মধ্যে তাঁর পুষি-বেড়াল নিয়ে আসছে। হ্যাঁ — এক হয়ে গিয়ে যাবে! আমি ও-রকমই বলে [illegible] ঝুলির দেখাশোনার কি-রকম হ'ত, তা অনুমান ক'রে নেই বললাম।

ক'দিন সময় ব'লে আসতে মন কিছুতেই চাইছিলো না; — আর ঝুলির আমার সঙ্গে যদি ফিরে না আসতে হ'ত, তা হ'লে আমি আরো মানিকতলা থেকে বেড়াতাম। বাড়িতে না-হয় কবুলি মেরে হ'ত খুব!

দু'-দু'বার ক'রে সবাই কে বার-বার ব'লে এসেছি গাড়িতে উঠে ব'সে বাড়ির দিকে রওনা হলুম। চাঁদ তখন উঠিয়ে এসেছে, চকচকে জ্যোৎস্না ঝিকিঝিকি করছে, হাওয়ায় একটু ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব। একটু তন্দ্রাই লাগছিলো, একটু ক্লান্তি;

২৩

[illegible]

তাই তুমি এ[illegible] আমার পাশের সিটে বসে ছিলে, আমি [illegible] হাত [illegible] [illegible] ঘণ্টায় ৪০' মাইল [illegible] দিয়ে [illegible] চালাচ্ছিলাম, [illegible] একটা foot-accelerator দিলে
ও বললে, "[illegible] খুব ভালো লাগছে, তাই!"
"আমারও [illegible] হচ্ছে, পৃথিবীতে যেন আমরা দুজন ছাড়া আর কোথাও কেউ নেই।"
"আমরা যদি এ-ভাবে চিরকালই থাকতুম, [illegible] না হলে তাহলে থাকতুম — তা হলে খুব সুন্দর হতো [illegible]।"
"চিরকাল তাহলে থাকলে আরো সুন্দর হতো।" আমি বললে
তারপর দু'মাইল রাস্তা আর কেউ কোনো কথা বললাম না। আমি ভাবতে লাগলুম, এই মুহূর্তটা আমরা দুজনে কী আনন্দে কাটালাম!
না বলে থাকতুম না. "তুমি চলে গেলে কি হবে' তাঁকে জানি না তুমি।"
"সে-কথা এখন মনেও আনো না, তাঁদের আকাশে [illegible] [illegible] আর কী সুন্দর দেখাচ্ছে, [illegible]।"
আমি ভাবলাম, "তুমি [illegible] সুন্দর, তা [illegible] তোমার, [illegible]
ও তখন বললে, "হ্যাঁ, বলো", তখন ওর ভালো করে তার দিকে আমি [illegible] দেখলুম — যাতে ওর [illegible] প্রতিটি রেখা ভালো করে মনে রাখতে পারি — আর মনে-মনে [illegible] একবার তাকাতে [illegible] উঠে গেল আর [illegible] গেল [illegible]।
[illegible] আমরা [illegible] [illegible] উঠতে পারলুম না। হঠাৎ দেখলাম বৃষ্টি আমি [illegible]। [illegible] [illegible] তারই [illegible] হচ্ছে।
বললুম, "ভেতরে আর একটা [illegible] আছে; [illegible] খুলে [illegible]





[illegible]

[illegible] [illegible], নিশ্চয়ই।
[illegible] গাড়ির মধ্যে [illegible] যন্ত্রপাতি [illegible] [illegible] এই যন্ত্র-টুকুই খুলে দিলুম।
[illegible] সেই কামরায় ফিরে এসে বসে [illegible] দেখতে পেলাম, আমি ওকে বললুম যে ওর [illegible] হাতের ওপর রাখা একটি বই ছিল।
গাড়ির ভেতরের রাস্তাটা যখন খুলে দিলুম, তখন অতিথি [illegible] শুধু [illegible] বাইরে এসেছি।
ও [illegible] বললে, "[illegible] নাকি?"
আমি মাথা নাড়লুম।
"কি জানি বললে, তখন? — এইটুকু মনে হচ্ছিল হবে। তবু [illegible] দেখে বেশি [illegible] পারে না, তবে আমি [illegible] [illegible] আমি [illegible] — [illegible] চালিয়ে দেখলাম।"
"[illegible] কি আর? না দিয়ে পারে না।"
[illegible] দিলাম, তারপর আমরা [illegible] [illegible] দিয়ে চলতে লাগলুম।
[illegible] আমার মন বলে ভালো লাগছে, [illegible] [illegible] আমরা আকাশে আর [illegible]!"
[illegible] দিলুম, [illegible], কিন্তু তুমি যে সুন্দর, [illegible], তার [illegible] ছিলো না, তা-ও ঠিক।"
"[illegible], তুমি কি আমাকে খুব ভালোবাসো?"
"[illegible] [illegible] তোমায় বিশ্বাস হবে [illegible]
[illegible] দেখে বলো।"
[illegible] বললুম, আমি তাকে ভালোবাসি মুখোমুখি [illegible] দুটো [illegible]। আমার দুটো [illegible]

[illegible] — [illegible] ১৩৩৩

ঠিক সময় — আবার সময় — আবার [illegible] শেষে একটা [illegible] কালো বেড়াল এসে মিলিয়ে যায় — [illegible] কোণে যে তা দেখে দেখা যায় না আর।

[illegible] চিৎকার [illegible] করে, মুনি।" আমি বললাম। বলেই- মুনি, তুমি যেমনভাবে যে আমরা বাইরে এসে পড়েছি। আবার এতো বাদলায় [illegible] আলো জ্বলছে, সেখানে মানুষ আমাদের অপেক্ষায় বসে আছেন।

দেখে মুনিকে বললাম, "আমাদের এখনই ফিরে যেতে ভালো, কাল তোমাকে ভোরে দিয়ে এসে আমাকে গাড়িটা আবার ফেরত হবে আবার।"

"তুমি খুব — খুব সাবধানে যাবে তো?

"নিশ্চয়ই।"

"তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি ঘুমোবো না — সারা সময় মনে-মনে অভিনেতার কথা ভাববো।"

"আমি ভোরবেলার ফিরবো, এ কথা তোমাকে জানাবো রাতে তোমার দোর খু — তো তা দিয়ে যাবো, কেমন?

"আচ্ছা বেশ।"

"এখন তা হলে গুড-নাইট।

"গু'নাইট, ডার্লি।"

"মুনি, তোমাকে — তোমাকে চুমো দিতে ভয়ানক ইচ্ছে করছে দেবো?"

"দাও।"

[illegible], [illegible] — [illegible], [illegible] ফিরে তো তা আমি জানি যে, কিন্তু [illegible] মুনির কোনো-কিছু আমাদের জীবনে আর ঘটে নি। আর কখনো মনে হয় নি যে আমাদের সর্বাঙ্গ বেয়ে আমি উপচে পড়েছি — সেদিন যেমন মনে হয়েছিলো। এত আনন্দ

২৬



[illegible] ও [illegible]

[illegible] [illegible] হয়ে [illegible]।

[illegible] গিয়ে মার্টিনিকে [illegible] কথা বুঝিয়ে-সুঝিয়ে [illegible] সাহেব-মঞ্জরী। যা ভেবেছিলুম, তাঁর আইরে [illegible] অক্টোবর বেলায় ঝিরঝিরে হয়ে গিয়েছিলো।

মুনিকে বললেন, "যত শীগ্‌গির পারো, ডিনারের পরে সে, আর তুমি, ডার্লিং, এক্ষুনি গাড়িটা নিয়ে যাও। আর-বার সময় গোলমাল করে তোমার মাথার ঘুম ভেঙে দিয়ো না আবার।"

হঠাৎ-এর ভেতর দিয়ে আস্তে-আস্তে উঠলাম:

"মিঃ ব্যানার্জি ও আমি ঠিক করেছি যে তোমার আজকের কাল সকালের [illegible] মতো আমার ভোরের কাছে ফিরে যাওয়া [illegible] বেশ যুক্তি-সঙ্গত।"

আমি [illegible] ফিরে দাঁড়ালুম, যেন খুব [illegible] জানি হয়েছে। গাড়িটা ভোর বেলা করে ফিরে গেলুম।

"কি হয়েছে, ডার্লি?"

"আপনি আমাকে [illegible] না?" মিথ্যে করে বললুম

"[illegible] কিছুই করি নি। শীগ্‌গির যাও। সারা-রাত জেগে [illegible] [illegible] খাওয়া করি নি।"

আর-কিছুই বলবার ছিলো না, তাই হলেই আস্তে হাত। সিঁড়িতে মোটরে চাকাটা কাঁকরের উপর যেমন সেই কিচকিচ [illegible] উপর দিয়ে হেঁটে চললাম — স্বপ্নের ঘোরে যেন।

মুনি চলে গেছে, আমার মুনি। সে চলে গেছে, হয়তো [illegible] আর কখনো দেখা হবে না।

যা যাবার যাবে বলে [illegible] যে-রকম লাগছিলো, আমারও মনটা সেই রকমই লাগছিলো ভেতরে। কোনো-মতে চাকাটা ঘুরে দিয়ে, অন্ধকারের গাড়ির

২৭

২৮





২৯

[illegible]

[illegible] একটি ছোট্ট আশ্রমকে কেন্দ্র করে
[illegible] আশ্রমটির [illegible] সেখানে [illegible]
[illegible] ছিলাম। [illegible] ভাবলাম [illegible]
[illegible] ঘুরে [illegible] ফিরে [illegible]
[illegible] ঠিক [illegible] ভাবলাম [illegible]
[illegible] ফিরে [illegible] ভাবলাম [illegible]
[illegible] ফিরে [illegible] ভাবলাম [illegible]
[illegible] ফিরে

[illegible] — [illegible]

[illegible] তার বয়েস [illegible], [illegible]। [illegible] দুটো [illegible] তাই মনের মধ্যে [illegible] করে গেল, [illegible] দুটু দুটো হয়ে জ্বলতে লাগলো।

আমি জিজ্ঞাসা করে বললুম, "[illegible] এমন আর [illegible] সামিল হবেন, কারণ এখন আমাদের এখন থাকতে হচ্ছে না। আমাদের মত কি কেউ [illegible] কষ্টে ভোগে [illegible]?"

আমি বুঝলুম যে ও মাথা নেড়ে জানাচ্ছে 'না' — কিছু দেখতে পেলুম না, [illegible] আমি হঠাৎ [illegible] আমার কৌতূহল [illegible] দিয়ে গেল। [illegible] আমি আর একটু শক্ত করে ওকে [illegible] ধরলুম ওকে দেখতে পারলুম না [illegible] — আর ও এমন ভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো যাতে [illegible] হল, তুই কি সুখী আর কেউ নেই।

অন্ধকারে কথা বলা ভয়ানক শক্ত, তাই আমরা চেষ্টা করলুম না, সময় কেটে যেতে লাগলো। অনেক — অনেক — ক্ষণ পরে আমি বুঝলুম, ও ঘুমিয়ে পড়েছে। [illegible] আছে, যে তা [illegible] বিশ্বাস হবে না — আমার [illegible] মাথার সঙ্গে ঠেকিয়ে চোখ বুজলুম।

[illegible] যখন [illegible] তখন [illegible]। তাকিয়ে দেখলুম, মামা কিছু দূরে সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। একটু দূরে মাসীমা দাঁড়িয়ে। তিনি দাঁত দিয়ে [illegible] ঠোঁট চেপে আছেন যে তা দেখাই যাচ্ছে না। বুঝলুম, মামা খুব আঘাত পেয়ে আছেন, কিন্তু তিনি কিছু বলবার আগেই আমি বলে উঠলুম,

"চুপ, ওর ঘুম ভাঙিও না।"





[illegible] ও সাদা

"ওকে নিয়ে যাও", মাসীমা বললেন, "আমি [illegible]"
এ কথা শুনে আমি ওখানে একটা কিছু বলে [illegible] কিন্তু মামা আমার ইচ্ছে [illegible] তিনি চেষ্টা করে আমার মুখের ওপরে তাঁর [illegible] আমার [illegible] গাড়ির [illegible] করে [illegible] ওকে বাইরে নিয়ে গেলেন।

এ গল্পের এইখানে আমি বলতে [illegible] আমাকে যে-সব কথা বলেছিলেন, তা আমি কিছুতেই বলবো না, আমাকে একশো কোটি টাকা দিলেও না। তিনি আমাকে যেমন [illegible], ভয়ানক সব কথা বলেছিলেন তেমনি মাসীমা [illegible] সেই-সব কথায় [illegible] দিয়েছেন, এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

তারপর তিনি আমাকে তাঁর [illegible] বললেন [illegible]লেন। তাঁরা ও-টুকুও না করলেও [illegible] কারণ ও না [illegible] আমি কিছুতেই [illegible] সব ঘেঁটে নষ্ট করে দিয়েছিলেন।

এখন তো তুমি বুঝতে পারছো, মুনির [illegible] ও-ই মা কেন সাদা হয়ে যায়, আর আমিই বা কেন [illegible] হয়ে উঠি, আর আমরা কাইসিকেল বা অন্য কোনো [illegible] নিয়ে কথা বলি কেন।

ঠিক একটু পরেই একটা গাড়ি এলো [illegible] সেই গাড়িতেই ও চলে গেল। আমি এক কোণায় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম, — আমার যে দম আটকে আসছিলো! মনে হচ্ছিলো, আমিও যদি কখনো না জন্মাতুম, তা হলেই সব চেয়ে ভালো হতো।

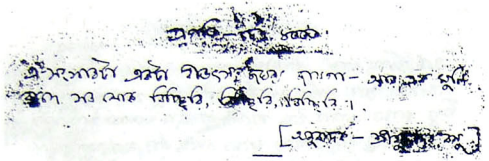

[illegible] — [illegible] ১৩৩৫

ঐ সংসারটা একটা [illegible] ব্যাপার — [illegible] [illegible]
[illegible] সব লোক [illegible], [illegible], [illegible]।

[অনুবাদক — শ্রী[illegible] বসু]

## মানসী

আজিকার এই আকাশে আছে আলো,
আছে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না, শুধু তুমি নাই।
আমার নয়ন-তারা আজও আছে কালো—
যে-আঁখি তোমার রূপ হেরিত সদাই।
আমার অন্তরে আর বাজে [illegible],
জানি না যে হৃদয়ের কোণে [illegible] তুমি;
আমি যে-সঙ্গীত গাহি অন্তরে আমার
সে কি [illegible] নাহি হয় তব মনে তুমি কি
নাই হোক্ — মম চিত্তে সৃজিনু হে প্রিয়া,
কল্পনার মূর্তি তব নব মানসী,
প্রতিষ্ঠা করিনু প্রাণ মোর প্রাণ দিয়া—
মম চিত্তে আজিকে [illegible] তুমি প্রিয়া!
বিধাতা তোমারে ভিন্ন করে নিল হরে—
আমি পুনঃ সৃজিলাম আমার অন্তরে।

—

শ্রী[illegible]কুমার দত্ত

৩৪

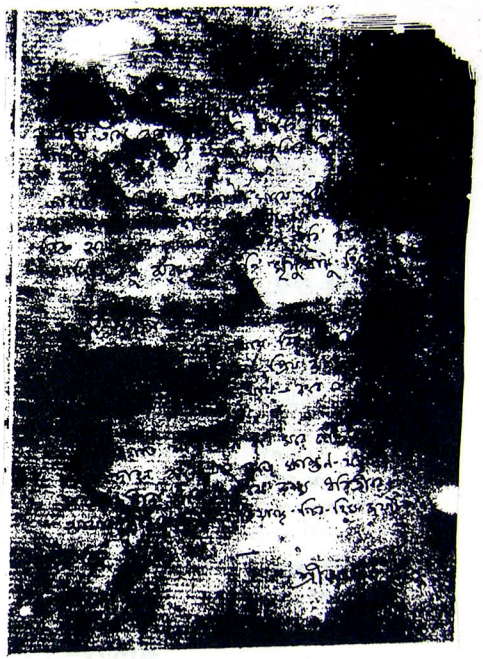

অতুল —

বিদায়-দিনে [illegible] তুমি বিদায় দেবার-বেলা
অশ্রু-বারি দেখো ঝরে না যদি হয় হেলা;
[illegible] দুরুদুরু
কাঁপে যদি না হয় সুরু,
না হয় যদি অধর-কোণে নীরব কানাকানি,
বলেছো তুমি, এমন দিনে বিদায় নাহি মানি?

আমি বলি, আমার ভালো সে-ই যা তোমায়, জানে
বিচ্ছেদেরি করুণ মায়া লাগলো যে মোর প্রাণে,
নীরব এই [illegible] রাতে
[illegible]
তোমার দেওয়া সেই তো, প্রিয়ে, তুমুল মোর ভালো,
সে-ই তো দেখে [illegible] কালো [illegible]!

তোমার বাণী আর কি কেন [illegible]?
— তোমার লাগি [illegible] হৃদয় মোর [illegible]!

— শ্রী[illegible] রায়



[illegible] —

তোমায় [illegible] ফুল [illegible]
[illegible] কাঁটা-[illegible],
[illegible] গন্ধ-[illegible],
[illegible]।

আকাশ-কোণে [illegible],
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible],
[illegible]
[illegible],
[illegible]

[illegible],
[illegible] কালো [illegible],
[illegible],
[illegible]।

কার্তিক-চৈত্র, ১৩৩৩

হয়-তো না কেউ আসবে গো এই মন-মাতান গন্ধ নিয়ে,
হয়-তো না কেউ কোনোকালেও আসবে, না,
তবু আমার ফুলের সাজি, রূপের ডালি — সব নিয়ে
তারি জন্যে রচে রচে কল্পনা।

তুলে যাবে স্বর্ণ-স্মৃতি — আসবে সে তো কাল ভোর,
আকাশ-পারে স্বর্ণ জ্যোতি — আসবে না,
গন্ধ দিয়ে, ছন্দ দিয়ে সাজাই তবু অন্তর
তারি স্বর্ণ-স্বপ্ন-দলের কল্পনা।

[illegible] আমার কাছে না নামালো, মন দিলে যার কল্পনা,
আসবে সে — এই আবেশেতেই স্বপ্ন-হারা,
[illegible] খুলে তাই গন্ধের মালা, কোন ফুলে না অর্চনা —
কল্পনাতেই বিশ্বের বুকে [illegible] ভরা।

আসবে যে কে, জানিনে তা, আসবে শুধু এই জানি,
আমার আকাশ আলোয় [illegible] যায়,
প্রতীক্ষাতে কাটুক রাতি [illegible]
মধুর [illegible] যায়।

নাই যদি কেউ আসে [illegible], [illegible] না,
[illegible] রজনীর আকাশ [illegible],
আমার মন [illegible] যে তাই কল্পনা,
[illegible] তাই [illegible]।

শ্রীবুদ্ধদেব বসু



[illegible] ও উর্মিলা

[illegible] না-ফুলের [illegible] বিশ্ব-হৃদয় [illegible],
[illegible] [illegible],
[illegible] কাঁদিয়া [illegible]
[illegible] দিয়েছে।
[illegible] [illegible],
[illegible] আমি কাঁদিয়াছি, সখি! [illegible]
[illegible] স্বপ্ন-[illegible] [illegible]
[illegible], [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] স্বপ্ন-[illegible]
[illegible] আমি কাঁদিয়া [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible]
[illegible], [illegible],
[illegible] [illegible]

—

শ্রী[illegible] ভাদুড়ী

মুকুরে

বিশ্বের অরণ্য হতে দূরে, বহুদূরে,
আর এক জগত মোর স্তব্ধ আছে আমার মুকুরে।
এ বিশ্বের দিবারাত্রি আকুল এসে আঁখির নীড়ে,
মধুর সঙ্গীতে, [illegible] অশ্রু-নীড়
লুটে কেমন করি—
কেমন শুধু নিরালায় [illegible] চিত্ত-মাঝে
আমি এক মুকুরের মোর প্রতিচ্ছবি।

জগতের কোলাহল [illegible] সংসার-আসার
[illegible] ঘর' ভরে মোর আঁখিপাতে;
তবু দেখি, মুকুরের মধ্যে ওই প্রতিচ্ছবি মোর
তেমনি সজল, মুখর, শান্ত, কালো আঁখি দুটি ওর
আমার নয়ন [illegible] আছে ঘোর, [illegible]
আমার কেন যে [illegible] কেন, [illegible] তরে।
যত [illegible] হাস্য দিয়ে [illegible] করি [illegible],
তবু ও যে শুধু মৃদু হাসে
নীরব ভাষায় বলে — হায়, বন্ধু, এই হাসি-তলে
কত বেদনা, কত দুঃখ লুকায়েছে [illegible]—
সব আমি জানি, প্রিয়, জানি আমি সবি,
নিষ্ঠুর [illegible] করি নিত্য [illegible],
আমি [illegible] মোর প্রতিচ্ছবি।





মুকুর

[illegible]

# আলোচনা

আজকাল বাংলা দেশের সাময়িকপত্রগুলিতে যত ছোট গল্প প্রকাশিত হয়, তাহার অধিকাংশই কাহিনীকারদের না লেখা হইলে কথা-সাহিত্যের খুব বড় রকম একটা ক্ষতি তো হইতই না, এবং অনেকখানি রুচিজ্ঞানের দিক হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বাঙালী-পাঠকরা নিঃশ্বাস ফেলিতেন, এ-কথা অনেকের মুখেই শোনা যাইতেছে। এ-কথা অবশ্য ঠিক যে বর্তমান সময়ে প্রথম শ্রেণীর গল্প-লেখক এ-দেশে নাই; তরুণদের মধ্যে প্রকৃত প্রতিভাশালী হয়-তো দু-একজন আছেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রতিভা এখনো স্ফূর্তির অপেক্ষা রাখে। অথচ পাঠক-সমাজের গল্প-পাঠ-লালসা এতই তীব্র যে, তাহা চরিতার্থ করিবার জন্য সম্পাদকদের নির-বিচ্ছেদে গল্প-সরবরাহ করিতেই হয়, এবং এই কারণে [illegible] মত [illegible] সহস্রাধিক [illegible] যায়। যথার্থ [illegible] [illegible]-অসমাপ্ত নিকৃষ্ট রচনাই পাঠকদের [illegible] দিয়া সম্পাদিকা [illegible] হয়, আবার এমনও নিকৃষ্ট বস্তু-সেবনের ফলে পাঠকদের রুচিও এমন নিম্ন হইয়া যাইতেছে [illegible] জিনিসের মূল্য-গ্রহণ করিবার ক্ষমতা [illegible] হারাইয়া ফেলিয়াছে।

*

* *

প্রতিবাদ হইলেও এই কথাগুলি সত্য [illegible] সে কথা স্বীকার করিতে কোনো বাধা হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু তাহার কোনো কারণ নাই। বরং আমরা যদি মনে করিয়া থাকি যে আমাদের মধ্যে [illegible]-শরৎ-চন্দ্র [illegible] আছেন বলিয়াই আমাদের সাহিত্য জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মধ্যে অন্যতম, তাহা হইলেই নিজেদের লজ্জিত হইব, [illegible] দেশে গল্প-সাহিত্যের দৈন্য





আলোচনা

[illegible] কি, তাহাই ভাবিয়া দেখা [illegible]। যাঁহারা [illegible] ও উপন্যাস [illegible] লিখিতেছেন, সাহিত্যে [illegible] সেটা কম নয়, তাঁ[illegible] চিত্তের সম উচিত নয়, [illegible] অনেক, [illegible] কিন্তু তাঁহারা একটা কথা [illegible], যা [illegible] আছে, যাহা [illegible] অন্তর-[illegible] যাহা দূর হয় তাঁহাদের সাধনায়।

*

* *

[illegible] দেশ শুধু গল্পের দেশ নয়, উহা কবিতার দেশ। বাঙালীর [illegible] এত দূর অতীত হইতে লাভ করিয়াছে যে, [illegible] সাহিত্য ভাবাবেগ (emotion)-এরই উদ্বুদ্ধ প্রকাশ [illegible] [illegible]-কবিতা হইতে আরম্ভ করিয়া এ-দেশে [illegible] উচ্চশ্রেণীর গীতি-কাব্য লিখিয়াছেন, [illegible] কেবল মাত্র হৃদয়ের অনুভূতি [illegible] যায় না, তাহার নাটকের ঘটনা [illegible] চিত্তের সুখ বিশ্লেষণ। কবিতা [illegible]

“এমন দিনে তারে বলা যায়
[illegible]-ঘোর বরিষায়।”

[illegible] এ কথা গদ্যে লিখিলে [illegible] গল্প [illegible] "লিরিক"-এ অনুভূতি [illegible] বলা হয় নাই। ঘটনা না হইলে [illegible] হয় না, [illegible] বাঙলা দেশেই ঘটনা-হীন সৃষ্টি [illegible]। [illegible] কিছুতেই তাহার [illegible] পারে না—উহার তাহার [illegible] গিয়াছে। এ কথাই মনে হয়, বাঙলা দেশে [illegible] কোনো দিন [illegible] কি দেখা [illegible]

প্রবাসী — চৈত্র, ১৩৩৩





আলোচনা

প্রগতি — চৈত্র, ১৩৩৩

জগদীশের মানসিক প্রতিভা [illegible] একটি [illegible] এমন [illegible]
ছিল। তাঁহার [illegible] ছিল, তাহার [illegible] ছিল,
কিন্তু ছিল না [illegible]। তাঁহার অধিকাংশ গল্পের
বিদেশী গন্ধ এত প্রবল ছিল যে [illegible] কারণ
কাটিয়া এই মূল তৈরী করা হইয়াছে, তা-ও আমার [illegible]
লেখার ভঙ্গীতে তিনি হয়-তো টুর্গেনিভ-পন্থী হইতে [illegible]
কিন্তু টুর্গেনিভের মত [illegible] গতিছন্দ, যে [illegible]
মাধুর্য্য আছে, তাহা তাঁহার মধ্যে নাই না; তাঁহার [illegible]
মাঝে-মাঝে [illegible]। অল্প বিষয় নিয়া [illegible]
তাঁহার প্রতিভার দুর্বলতা। তিনি হয়-তো বলিতে চান: "মানুষ
একটি [illegible], কিন্তু সে তাহার পাইল না।" এই
ব্যাপার নিয়া তিনি [illegible] সৃষ্টি করিয়া
[illegible] যথার্থই bored হইতে হয়। তবু
[illegible] করিতেই হয় যে, তাঁহার মধ্যে কিছু [illegible] ছিল;
তাঁহার [illegible]", "[illegible]" প্রভৃতি [illegible]
[illegible] তাঁহারাই এ কথা স্বীকার না করিয়া পারিবেন না। [illegible]
[illegible] তিনি গল্প-রচনা [illegible] দিয়াছেন [illegible] হয়;
ইহা যে বঙ্গ-সাহিত্যের [illegible] এ-কথা
ঠিক। [illegible] অকাল-মৃত্যুতে [illegible]
ক্ষতি হইয়াছে, তাহা অনুমানে নির্ণয় করা যায় না। [illegible]
মধ্যে তিনি যে উজ্জ্বল প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা
সুযোগ পাইলে আরো সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারিত, ইহা খুবই
স্বাভাবিক মনে হয়।



আলোচনা

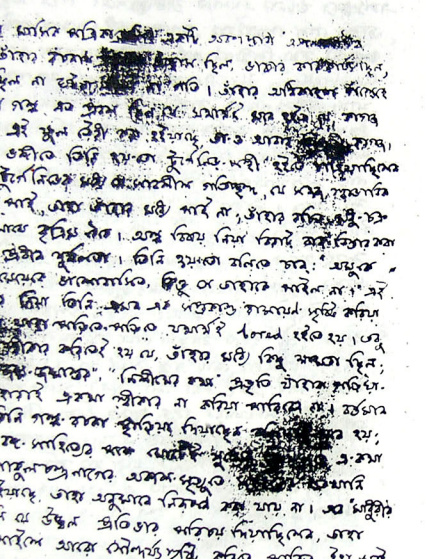

শ্রীযুক্ত [illegible] মুখোপাধ্যায় [illegible] গল্প [illegible]
[illegible] একটি আসন [illegible] করিয়াছেন, এ কথা অস্বীকার
করিবার উপায় নাই। [illegible] তুলিতে [illegible]
sketch লিখিয়াছেন [illegible] সাহিত্য-ক্ষেত্রে পরিচিত [illegible]
[illegible] "এলসী" প্রভৃতি [illegible] গল্পগুলিই তাঁহার [illegible]
[illegible] প্রথম পরিচয় দিয়াছে ও দিল। পুরাতন [illegible]
লোকদের জীবন নিয়া গল্প লিখিয়া খ্যাতি এবং অখ্যাতি দুই-ই
[illegible] অর্জন করিয়াছেন; তাঁহার [illegible] - এই
সব বিষয় নিয়া তিনি লিখিয়া থাকেন, সে বিষয়ে তাঁহার প্রচুর
অভিজ্ঞতা আছে। সেই জন্যই তাঁহার গল্পগুলি [illegible]
তৈরি-করা মনে হয় না। তবে তাঁহার অধিকাংশ [illegible]
sketch মাত্র; তবে ছোট গল্প বলা যাইতে [illegible]
লেখা তাঁহার অল্পই আছে। তবু এক্ষেত্রে [illegible]
তাঁহার নাম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে [illegible] শ্রীযুক্ত
[illegible] মিত্র এ-পর্য্যন্ত অল্প কয়েকটি গল্পই [illegible] কিন্তু
সেই কয়টি দিয়া বিচার করিলেও নবযুগের [illegible]
[illegible] বলিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে [illegible]
[illegible] কেরানী", "[illegible]-কাহিনী", "[illegible]",
[illegible] সুধীর [illegible]"—
প্রত্যেকটিই [illegible] সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি। প্রেমেন্দ্র মিত্র [illegible], তাঁহার
নিকট হইতে [illegible] কিন্তু আশা করিবার অধিকার আমাদের
আছে। শ্রীযুক্ত অচিন্ত্য সেনগুপ্তের গল্প-রচনায় [illegible]
— তাঁহার "[illegible]" ও "[illegible]"-এ তিনি এ-কথা প্রমাণ
করিয়াছেন। [illegible]
আশায় [illegible]

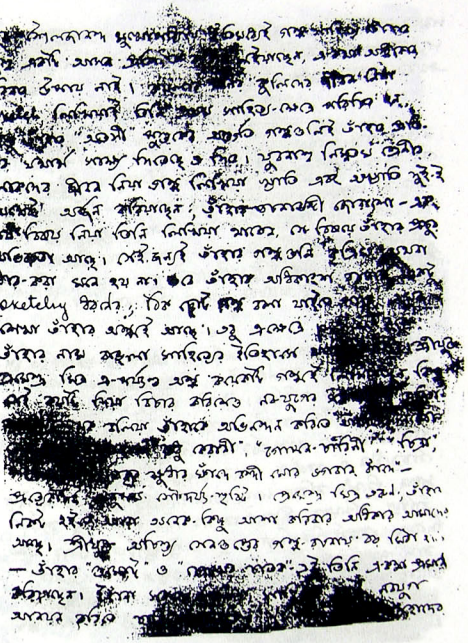

সম্পাদকীয়

## বসন্ত-প্রশস্তি

আজ বনে-বনে মিলনোৎসব!
পাতায়-পাতায় নব-জাগরণের সাড়া!
তা'র চির-শ্যামল চির-বাঞ্ছিতকে বরণ করে' নেবার আগ্রহে ধরণীর
আজ চির-ধূসর বিরহ-শয্যা ছেড়ে নব-সাজের আয়োজন!
তাই মাধবীর কুঞ্জে-কুঞ্জে প্রেমের মধুর গুঞ্জরণ, আম্র-শাখায়
শাখায় নব-কিশলয়ের উন্মত্ত আনন্দ নৃত্য!
এমন দিন কি তোমার ব্যর্থ হ'বে বন্ধু? — বসন্ত কি তোমার রুদ্ধ
দ্বারের কড়া নাড়া দিয়েই চলে যাবে?—মৃদু-মলয়ের
হিল্লোলে কি প্রিয়'র আগমনীর আভাষ পাবে না?
না, না, বন্ধু! এমন দিন ব্যর্থ হ'লে তুমি বাঁচ্‌বে কেমন করে'?
বসন্তকে বরণ করে নাও তোমার অন্তরে! বেরিয়ে পড়
বৈরাগী পথে—মাধবী-বিতানে অসীম উদাস-নীল
আকাশের নীচে বসন্ত-সভার উদ্দেশে!
নাইবা দিল প্রিয়'র স্নিগ্ধ করুণা তার সস্নেহ দৃষ্টির রাজটিকা
তোমার ললাটে এঁকে — তা'কে অভিষিক্ত কর অশ্রুমাল্যে
ব্যথার সিংহাসনে তোমার হৃদয়-মন্দিরে বিবাগী দুঃখের
একতারায় হউক্ তার নব মঙ্গল-গীতি রচনা;
এমন দিনে কামনা কর অনন্ত বিরহ! মিলনের অধীর আনন্দ দখিণার
মতই চঞ্চল, কান্নার উৎস মিলনের পুণ্য-তীর্থ! তাই
আনন্দ-মুখরা পুষ্পবনে আগুণদহা চৈতি হাওয়া বয় —
যেন যুগ-যুগান্তরের বিরহীর তপ্ত দীর্ঘশ্বাস! তাই দিগন্ত
কালো করে' আকাশের বুক চিরে কাল-বৈশাখীর রুদ্র-নাচন
আসে—মিলন-পিয়াসী কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরীকে ধূলায় লুণ্ঠিত
করে' দিয়ে যায় বারে-বারে!
তাই বলি বন্ধু আমার কথা শোন, প্রিয়'র যাত্রা-রথ-প্রতীক্ষায়
আশার প্রদীপ জ্বেলে দীর্ঘ-শর্বরী রুদ্ধঘরে জেগে কাটিয়ে
দিও না! এমন রাতে বেরিয়ে পড় চাঁদের সভায় —
তোমার হৃদয় মথিত করে' যে কান্নার সুরা ফেনিয়ে উঠ্‌ছে,
সেই সুরা-পাত্র হাতে ব্যথা-দৃপ্ত স্বরে গাও ঋতু-রাজের
জয়-গাথা! তোমার বসন্ত সার্থক হউক্ উৎসব হউক্
পরিপূর্ণ!

চিত্তে মোর জাগে আজ —
সব পৃথিবীর অনুক্ত বেদনা" —
— শ্রীরামেশ্বর বাগচী

বসন্তের মৃদুল হিল্লোলে চিত্তে মোর জাগে আজ
সব পৃথিবীর অনুক্ত বেদনা; ধরিত্রী অপূর্ব্ব সাজ
ধরিয়াছে, ঘনান্ধ ম্লানিমা তবু ঘিরে আসে আঁখি-পাতে;
গগনের ব্যথা-অশ্রু যেন মুক্ত ঝরে ক্লান্ত বরিষাতে।

অনাদি অতীত কালে যত মূক বাণী
অচঞ্চল কাল-বক্ষে করাঘাত হানি,
ফুটাতে পারে নি কথা, তাহারাই ধীরে
আসিয়াছে হেথা মোর অশ্রু-নদী-তীরে।
বসন্তের চিরন্তন কাকলীর গানে
নিস্তব্ধ চাহিয়া তা'রা কাঁদিয়াছে অলক্ষ্যের পানে -
কাঁদিয়াছে গগনের তারকারে ডাকি'—
ব্যথী মিলে' নাই! গোপনে গিয়াছে ঢাকি'
তাহাদের সকল কামনা; অসফল সকল বাঞ্ছনা,
নিশিদিন স্তব্ধ হ'য়ে সহিয়াছে সকল লাঞ্ছনা।
হেথা তা'রা সুপ্তি-হত বাষ্প-কণা মত
অলক্ষ্যে নিঃশ্বসি' ফেরে, আনন্দে আহত।
যে-সকল বেদনার ইতিহাস সবে ভুলে' গেল —
মানবের চিত্ত হ'তে বিসর্জন পেল —
তাহাদের অভিসার আজি মোর গেহে।
অশ্রুজল-তটিনীর তীরে জড়ায়ে বিপুল স্নেহে
কথা কহে আকুল গুঞ্জনে ডাকিয়া আমারে;
বক্ষ মোর যায় ভরি' বেদনার স্বচ্ছ-মুক্তা-হারে।
নিরন্তর নিজের আলয়ে ব্যথা-ম্লান দীপখানি
হেরিয়াছি স্তব্ধ সন্তুষ্টিত। আজিকার রাত আনি'
যা' দিল আমারে, তাহারে বাসিতে ভাল বেদনায় ভরে
সকল অন্তর। বেদনায় উদাসিত নিথর অন্তরে
প্রচন্ড ঝটিকা-বাত্যা গোপনে লুকায়েছিল —
বিশাল বেদনা-পুঞ্জ কাল-গর্ভে শান্ত হয়ে ছিল।



অন্ধকার মাতৃগর্ভে বিস্মিত আনন্দে ভয়ে
বেদনার ভ্রূণ-রাজি অপূর্ব্ব শান্তিরে ল'য়ে
আছিল অজানা। আজি তা'রা প্রসূত ধারায়,
তাই তা'র ভয় ভেঙ্গে গেছে। উচ্ছ্বসিত প্রকৃতির হায়
করিতেছে মুক্তি দান; — শিশুর হাসির মত
শুভ্র — ক্রন্দনের স্রোত মুক্তি পেল। যত
অবোধ্য আনন্দ-ক্রীড়া তাই চলে আজি
অসীমের পানে বাহু তুলি; তাই পূজা সাজি
ভরিয়াছি উদ্বেল বেদনা-ফুলে, তাই অশ্রুকণা
জড়াইয়া ফুলে-ফুলে শিশিরের মত পড়িতেছে গলি হ'য়ে সে

আমার মৃণাল-কাঁটা হৃদয়ের কোন্ শতদলে করিল বঞ্চিত
তাহারে ভুলিয়া যাই — আজি হেরি কত ব্যথা রয়েছে সঞ্চিত
চিত্ত পঙ্কে পবিত্র পঙ্কজ মোর উঠিয়া সলাজ
রুদ্ধশ্বাসে আপন কর্দ্দমে ডুবিল যে আজ।

# লাল ও শাদা

রোল্যাণ্ড্ পর্‌টুঈ

আমার বয়েস সাড়ে-ষোলো বছর; সব জিনিষ বোঝ্‌বার মত বড় আমি হয়েছি। মামা তো এ-কথাই বলেছিলেন,— তাঁকে আমি দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারি নে - না, পারি নে — যদিও আমার বিশ্বাস যে মামীমাই তাঁকে দিয়ে এ কথা বলিয়েছিলেন — অবিশ্যি মামীমাকেও আমি কোনোকালে সইতে পারতুম না। তাঁরা দু'জনে মিলে যদি আমার পায়ের ওপর গড় হ'য়েও ক্ষমা চান্ এসে, তবু কোনো ফল হ'বে না।

পৃথিবীর সব চেয়ে সুন্দর জিনিষটিকে তাঁরা দু'জনে মিলে' এমন ভাবে থেঁৎলে দিলেন যে তা নেহাৎ কুচ্ছিৎ, বিচ্ছিরি হ'য়ে উঠ্‌লো, — সে কথা আমি ভাব্‌তেও পারি নে। আমি জানি যে এখন মুলির সঙ্গে আমার দেখা হ'লে আমি হ'য়ে উঠবো লাল আর সে হ'য়ে যাবে শাদা, আর আমরা বাইসিক্‌ল নিয়ে না হয় তো দিনটি ভালো কি মন্দ সে-কথা তুলে কতগুলো আবোল্-তাবোল্ বক্‌বো— তারপর যত শীগ্‌গির পারি একে অন্যকে ছেড়ে দূরে চলে যাবো। আমাদের মনে হ'বে যে একটা ব্যাপার নিয়ে আমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত যা'র মধ্যে লজ্জার কিছু তো নেই-ই, বরং আনন্দের অনেক আছে—কেন না, দু'টি লোক একসঙ্গে যতদূর আনন্দে সময় কাটাতে পারে, সে হচ্ছে তাই।

অনেক সময় ভাবি যে, আমরা যতই বড় হ'তে থাকি, ততই কি হোঁৎকা হ'য়ে উঠতে থাকি সবাই? আমরা সবাই কি সব জিনিষ নোঙরা করে', বেঁকে-চুরে' দেখি, আর যা ভালো, তা কি কখনোই দেখ্‌তে পাই নে? তাই হয় বোধ হয়, আর সেই জন্যে আমি বড়দের কাউকে দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারি নে, যেমন মামা মামীমাকে দেখ্‌তে পারি নে। আমি কোথাও পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে থাক্‌বো না হয় সন্ন্যাসী হ'য়ে গিয়ে বাকী জীবনটা মুলির কথা ভেবে আর অন্য সব কথা ভোল্‌বার চেষ্টা করে কাটিয়ে দেবো।

কিন্তু যাবার আগে আমি সব কথা খুলে বলতে চাই। চাই এই আশাতে যে এমন একজন অন্ততঃ কেউ কোথাও আছে যে সমস্ত ব্যাপারটা ঠিক সত্যি ক'রে বুঝতে পারবে।

আমার নাম ডোরিয়ান ফেস্‌টুব্যার্ট। আমার জন্মের সময় মা মারা যান্ বলে' তিনি আমাকে ভালোবাস্‌বার সুযোগই পাননি — অবিশ্যি বেঁচে থাক্‌লে তিনি নিশ্চয়ই আমাকে ভয়ানক ভালোবাসতেন। আমার বাবা যখন শুন্‌লেন যে মা মারা গেছেন তিনি তাঁর শোবার ঘরে ভেতর গিয়ে মা'কে চুমু খেয়ে বললেন "সুখের দিন আমরা হারালুম।" তারপর তিনি বাগানে গিয়ে নিজেকে গুলি করে মারলেন।

এ-জন্যে সর্ব্বদাই আমার মনে বাবার সম্বন্ধে একটা ভয়ানক গর্ব্ব ছিল। একদিন শুন্‌লাম মামীমা কাকে যেন এ-গল্পটা শুনিয়ে বল্‌ছেন, "ওঁদের বংশে আগাগোড়াই পাগ্‌লামির লক্ষণ ছিলো।" শুনে আমি বেদম চটে' গেলাম আর রাগের মুখে মামীমা'কে এমন সব কথা বল্‌লাম, যা বলা আমার মোটেও উচিত হয় নি। একটা ভীষণ কাণ্ড কারখানার অন্ত রইলো না। মামা বললেন যে আমি নাকি অত্যন্ত অভদ্র, ইতর ধরণের ছেলে — সম্মান কা'কে বলে তা নাকি আমি জানি নে।



আমি বল্‌লাম, "আচ্ছা বেশ, কিন্তু ভালোবাসা কা'কে বলে তা আপনারা জানেন না, জান্‌বেনও না কখনো।'

তারপর খুব এক চোট্ মার খেলাম — হাত দিয়ে চাটি আর ঝাঁটা দিয়ে দুই। তা হোক্ — তাঁর জন্যে আমি একটুও মন খারাপ করি নি; আমি যা বলেছিলাম তা তো সত্যি।

তাঁরা আমায় কোনোদিন ভালো ইস্কুলে পাঠান্ নি — অন্য ছেলেদের যেমন পাঠানো হয়ে থাকে — সেখানকার "অসদ্‌সংসর্গ" বা যাই হোক্—তার ভয়ে। আমার মনে হয়, মামা নিশ্চয়ই কোনো ইস্কুলে গিয়ে বেশ পাকাপাকি "অসৎ" হ'য়ে ফিরে এসেছিলেন — মামীমাও।

বারো বছর বয়েস অবধি আমার জন্যে চশ্‌মা-পরা শিক্ষয়িত্রী রাখা হ'য়েছিল। তাঁরা সবাই সাম্‌নে বোতাম-আঁটা জামা গায়ে দিতেন; কেন না, কোনো ঝি কখনো তা'দের কোনো কাজ কর্‌তোনা। তাঁরা আমায় ব্যাকরণ ও আঁক কষ্‌তে শিখিয়েছিলেন — আর নিউ টেস্টামেন্ট্ ও টমাস্ এ কেম্পিস্ থেকে আমায় জোর পড়ে' শোনাতেন।

আমরা একটা মস্ত বাড়িতে থাক্‌তাম। বাড়িটায় চমৎকার সব জায়গা থাক্‌তে পারতো, কিন্তু তা চমৎকার হয় নি, কারণ একটু খানি বুনো জমিও ছিল না। সারাটা জায়গা ইঞ্চি মাফিক্ চাষ-করা একেবারে। জানো তো, ছোটো করে ছাঁটা ঘাস, উৎকট ক্যাক্‌টাস, খুব ছোটো ছোটো লাল রাস্তা, তারের বেড়া-দেয়া চারা গাছ—এই সব!—

বাড়ির ভেতরটাও সমান বিচ্ছিরি। সব জিনিষেরই একটা মাপা-ঝোঁকা স্থান ছিলো যেন। একটা জিনিষ আধ-ইঞ্চি খানেক এদিক ওদিক সরালেও তা ঠিক জায়গায় ফিরে আস্‌তে বাধ্য। বসন্ত কালে যখন ঘর-বাড়ি পরিষ্কার করা হ'ত, বাড়ির সমস্ত আসবাব-পত্র ভুর করে' রাখা হ'ত — আর কার্পেটের স্তূপের ওপর একটা ম্যাপ পড়ে' থাকতো — তাতে প্রত্যেকটি টেবিল-চেয়ার কোন্‌টি কোথায় যা'বে তা আঁকা থাক্‌তো। খুশিমত কেউ যে একটু নোঙরা অগোছাল কর্‌বে এমন কোনো জায়গা সারা বাড়িটায় ছিলো না। এমন কি বাইরের ঘরগুলোও সেই একই রকম — কড়িকাঠের গায়ে-গায়ে পেরেক্-আঁটা, ঝাঁটাগুলো ঝুলিয়ে রাখবার জন্যে।

নিয়ম কানুন্ ও গোছালোপনা করে'-করে' মামা-মামীমার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছল। তাঁদের কারু কোনো জিনিস হারিয়েছে, এমন কথা আমি জীবনেও শুনি নি। তাঁরা ভয়ানক সময় মাফিক্‌ও ছিলেন। বছরের প্রত্যেক রোব্‌বার মামীমা ঠিক একই মুহূর্তে গিজ্জয় হাঁটু গেড়ে বস্‌তেন; তাঁর নিশ্চয়ই বিশ্বাস ছিলো যে কখনো এক সেকেণ্ড দেরী হলেও পিটার স্বর্গের দুয়ার চিরকালের মত তাঁর মুখের ওপর বন্ধ ক'রে দেবে।

আলাপ কর্‌বার মত কোনো লোকের সঙ্গে আমাদের কখনো আলাপ হয় নি। তাঁদের চেনা-শোনা লোকরা সকলেই ছিলেন নেহাৎ সাধারণ — আর চাকর-বাকরগুলো নিতান্ত একঘেয়ে। মুখে সর্ব্বদা এক কথা শোনা যেত — "না মাস্‌টার ডোরিয়ান ও কাজটি কিছুতেই কর্‌তে পাবে না।"

আঃ — একটি মনের মত বন্ধু পাওয়ার জন্যে মনটা আমার কেমন যে করতো! — এমন কেউ যার সঙ্গে গল্প করতে বা ঘুরে বেড়াতে পারতুম! জানো তো ঘুরে-বেড়ানো মানে হচ্ছে গোরু-কথাটা আমার নিজের তৈরী;—বেড়াতে যে গিয়েছি, এ কথা ভয়ানক গোপনে রাখতে হ'ত। মাঝে-মাঝে খুব ভোরে লুকিয়ে বেরিয়ে পড়তাম; খানিক দূরে একটা মস্ত রাবিশের

স্তূপে আছড়ে বোতল ভাঙতাম। কিন্তু যখন থেকে থেকে "চমৎকার বা "বাঃ বেশ" বলে ওঠবার মত কেউ থাকে না, তখন খুব মজা লাগে না। আমার শেষ শিক্ষয়িত্রী যখন চলে' গেলেন আর আমাকে গাঁয়ের পাঠ-শালায় ভর্তি করে' দেয়া হ'ল, তখনও আমার অবস্থা যে বিশেষ ভালো হ'ল, তা নয়।

ওখানে আরো জনা-পাঁচেক ছেলে ছিলো — চিম্‌সে, পচে যাওয়া। তা'দের মুখে ব্রণ, চোখে গোল চশ্‌মা। তা'রা আমায় মোটেও দেখ্‌তে পারতো না, বোধ হয় আমি লম্বা আর ঢেউ-খেলানো-চুলওলা ছিলাম বলে, আর — আর, আমার বাবা দেখ্‌তে খুব সুন্দর ছিলেন কিনা — লোকে বল্‌তো যে আমিও দেখ্‌তে অনেকটা তাঁর মত হয়েছি। তা ছাড়া rhododendronগুলো কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে, ঝর্ণার জলগুলো কি-রকম হাস্‌তে থাকে ব'লে মনে হয়, এই সব কথা বল্‌তাম বলে'ও ওরা আমার ওপর মারাত্মক চটে গেছ্‌ল। ওরা বল্‌তো যে আমি চাল দিচ্ছি, কিন্তু সত্যি আমি চাল দিতাম না। গাঁ-দেশের নানারূপ সুন্দর রঙ্ আর মিষ্টি আওয়াজ লক্ষ্য না করে আমি পার্‌তাম না, আর কেউ সে-সব নিয়ে কথা বার্ত্তাই বা বল্‌বে না কেন, তাও আমি বুঝে উঠ্‌তে পার্‌তুম না। পেন্সিলের বাক্স বা কলমের নিবের চাইতে এ-সব ঢের বেশি ভালো।

ওরা এত ভীষণভাবে পড়া মুখস্থ কর্‌তো যে ওদের খুবই চালাক হওয়া উচিত ছিলো বলে' মনে হয়। অন্য-কিছুর জন্য ওদের চোখ বা কাণ কিছুই ছিলো না। একবার আমার মনে আছে, একপাল ইস্কুলের মেয়েকে চলে' যেতে দেখ্‌বার পর আমি ওদের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলুম সে কখনো কোনো মেয়েকে চুমো খেয়েছে কিনা, আর তা কেমনই বা লাগে। মেয়েদের মধ্যে দু'একজনাকে দেখ্‌তে এত চমৎকার ছিলো যে আমার বেজায় ইচ্ছে কর্‌ছিলো তাদের সঙ্গে কথা বল্‌তে গিয়ে; আমি কোনো মেয়ের সঙ্গে কখনো কথা বলি নি বল্‌লেই চলে। ছোক্‌রা — তার নাম ছিলো ক্লাম্‌বার বিকট ধরণের নাম, তাকে ঠিক মানাতো যা-হোক্—জবাব দিলে, "বদ্ কথা বোলো না।"

আমি বল্‌লুম যে এর মধ্যে বদ্ কি আছে তা আমি বুঝ্‌তে পারছি নে — আরো বল্‌লুম যে মেয়েটি দেখ্‌তে ভালো হ'লে তা নিশ্চয়ই খুব ভালো লাগে।

সে শুধু বল্‌লে "এসব কথা বলা ভয়ানক খারাপ।"

মামা-মামীমার কোনো ছেলে থাক্‌লে সে ছেলে যে ঠিক এই ক্লাম্‌বারের মত হ'ত, সে-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। এ সব ব্যাপার কে যে ঠিক করে জানি নে, তবে যে-ই করুক সে বোধ হয় ইচ্ছে করে'ই ও বাড়িতে কখনো পাঠায় নি — ছেলের পক্ষে বাড়িটা নেহাৎ বিচ্ছিরি বলে'।

শান্তশিষ্ট ভাব, নিয়ম-কানুন, রুটিন করে' কাজ করা — এ সব জিনিষ সব খাঁটি ছেলেই উপযুক্তরূপে ঘৃণা করে। সে যা চায়, তা হচ্ছে অঢেল মজা আর মন খারাপ হ'লে তা'কে দু' একটা মিষ্টি কথা বলে' চাঙ্গা করে' তুলতে পারে এমন কেউ।

মামা-মামীমার নিজেদের মধ্যেও বিশেষ সদ্ভাব ছিলো না। আমার মতে ওটা ছিলো একটা "চুমো-নিষেধ" ছাপ মারা বাড়ি। মামা চুমো-খাওয়া পছন্দ করতেন না, আর মামীমা মানুষ মারা গেলে তবে তাঁদের চুমো খেতেন। তা'রা জ্যান্ত থাকলে তাঁকে চুমো খেতে দিতেই না।

শুধু একটি লোক আমাকে কখনো চুমো খেয়েছিলো; - সে হচ্ছে এক বুড়ো ডাক্তার যে



আমার মা'র চিকিৎসা করেছিলো।

মামা সারাদিন তাঁর পড়বার ঘরে কাটাতেন, আর মামীমা ঝি-চাকরদের হুকুম-দেয়া ও কোথাও এক কণা ধূলো রইলো কিনা, তা'র খোঁজ সাঙ্গ করে' হয় লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন, আর না হয় পাঁশুটে পশম্ নিয়ে বুন্‌তে সুরু করতেন। তাঁরা দু'জন একসঙ্গে খুব অল্প সময়ই কাটাতেন।

মামা যখন তাঁর মোটর-গাড়িটা কিন্‌লেন, তখন সারা বাড়িতে এমন একটা হৈ চৈ পড়ে' গেলো, শুদ্ধ ভাষায় যাকে বলা যেতে পারে "অভূতপূর্ব"। তিনি তাঁর কতগুলো জমি দেখ্‌বার কাজে সেটি ব্যবহার কর্‌তেন। তিনি ভয়ানক কিপ্‌টে ছিলেন বলে' শোফার রাখেন নি — আবার এত ভীতু ছিলেন যে গাড়ি-চালানো তাঁর দ্বারা হ'ত না—তাই দায়ে পড়ে তিনি আমাকেই শিখিয়ে নিয়েছিলেন।

মামীমার ভাই-ঝি এলিট্‌সাবেথ্ বছরে একবার করে' তাঁদের সঙ্গে দিন কতক কাটাবার জন্যে আস্‌তো। মামীমা তা'কে দিন-রাত্তির ঘিরে' থাক্‌তেন বলে' আমি তা'র দিকে কখনো ভালো করে' তাকাতামও না; — তা-ছাড়া, সে মোটেই আমার ধরণের ছিলো না। ছোট্ট শুক্‌নো মানুষটি; — আমার মনে হ'ত, সে ভয়ানক বানিয়ে বানিয়ে গল্প বল্‌তো — তাই তা'র আসাটা খুব একটা মস্ত ঘটনা ছিলো না আমার পক্ষে। যাই হোক্, তা'রই উপলক্ষ্যে আমার জীবনের সেই অদ্ভুত দিনটি এসেছিলো।

একবার গরমের ছুটির সময়—এলিট্‌সাবেথের যে-দিন আস্‌বার কথা তা'র দু'একদিন আগে — ব্রেক্‌ফাস্‌টের সময় মামীমা একখানি চিঠি পেলেন; — বল্‌লেন —

"জেন লিখ্‌ছে, এলিটসাবেথ্ শুক্রবার দিন তাঁর স্কুলের এক বন্ধুকে নিয়ে এখানে আস্‌তে পারে কি না। সে বোধ হয় ছুটির দিনগুলো তা'দের সঙ্গে কাটাবে বলে'ই ঠিক করেছিলো; কিন্তু জেন্ দু'চার দিনের জন্যে তা'র বাড়ি বন্ধ করে' দিতে চায় বলে আমরা তা'কে আস্‌তে না দিলে জেনের ভয়ানক অসুবিধেয় পড়্‌তে হয়।'

মামা শুধোলেন, "মেয়েটি তা'র নিজের বাপ-মায়ের কাছে চলে' যায় না কেন?

"তা'র মা-বাপ বোধ হয় কেউ নেই। জেন্ ধরে' নিয়েছে যে আমরা এতে অমত কর্‌বো না—কারণ সে লিখ্‌ছে যে মিস্ মুরিয়েল ও রিয়ে'র কয়েকজন আত্মীয় ফেল্‌টনে থাকেন তাঁরা তাঁকে ও এলিটসাবেথকে শুক্রবার রাত্তিরে তাঁদের ওখানে নেমন্তন্ন করেছেন।"

মামা বল্‌লেন, "তুমি যদি ব্যবস্থা কর্‌তে পারো তো মন্দ কি।

"ডোরিয়ান গাড়িতে ওদের পৌঁছিয়ে দিয়ে আস্‌তে পারে — ও ঠিক সময়ে বাড়িতে ফিরিয়ে আন্‌তেও পারে।"

"আচ্ছা মন্দ কি? যাও, আমাকে আর বিরক্ত করো না।"

একটি নতুন মেয়ে আমাদের বাড়িতে আস্‌ছে এই কথাতে আমার মনটা অদ্ভুত খুসিতে দুলে' উঠতে লাগ্‌লো; কিন্তু সে মেয়েটিও হয়-তো এলিট্‌সাবেথের মতই হবে হয়তো — বা তার চেয়েও খারাপ — একথা ভেবে বুকটা আবার দমে গেল।

সে যাই হোক্ — শুক্রবার প্রায় দুপুর বেলায় আমি গাড়িটা নিয়ে ইষ্টিশেনের দিকে বেরিয়ে পড়্‌লুম। মামীমাও আস্‌তে চেয়েছিলেন; কিন্তু গাড়িটা ছিলো মোটে দু'জনার বস্‌বার

মতন, যদিও পেছনে একটা ভাঁজ করা সিট্ ছিলো। তাই তাঁকে বাড়িতেই থাকতে হ'ল।

সুন্দর সকালবেলা—ভারি সুন্দর। পাখীগুলো সব গান করছিলো পাগল হ'য়ে যেন — রোদের আলোটা যেন সোনালী মদে মাতাল। মনটা ভয়ানক খুশি লাগছিলো — পথে কয়েকটা কোণ ঘুরলাম — দিব্যি। ইষ্টিশনে গিয়ে দেখি, গাড়ি আস্‌বার তখনো দশ মিনিট বাকী; তাই ট্রেনের অপেক্ষায় প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করতে লাগ্‌লুম। একটু বাদেই দূর থেকে ট্রেনের আওয়াজ এলো; ভাব্‌লাম, এখুনি তো ট্রেন্ এসে পড়বে, আর তারি এক জান্‌লায় এলিটসাবেথের মুখখানা দেখা যাবে — পাছে কেউ তা'কে তুলে নিতে ইষ্টিশেনে না আসে, সেই ভয়ে শুকিয়ে-যাওয়া। কিন্তু ট্রেন্ যখন এসে থাম্‌লো তখন এলিট্‌সাবেথের কোনো চিহ্ন দেখ্‌তে পেলুম না। গাড়ির এক জান্‌লা দিয়ে একটি মেয়ে মুখ বাড়িয়ে ছিলো; — অমন সুন্দর মুখ আমি জীবনেও দেখি নি।

ছোট্ট মুখখানা—ফর্সা; তামাটে রঙের চুল — লাল্‌চে-সোনালী—তার মাঝে মাঝে নীল্‌চে আভা। চোখ দু'টি সবুজ। এ-সব জিনিষ গুছিয়ে-গাছিয়ে কি করে' লিখতে হয় জানি নে; শুধু জানি যে স্বর্গেও তা'র চাইতে সুন্দর কিছু নেই, থাক্‌তে পারে না।

এলিট্‌সাবেথের কথা সব ভুলে গিয়ে আমি ছুটে সেই মেয়েটির জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম — আর একটিবার দেখে নেবার জন্যে। এই ছোট্ট ইষ্টিশেনে তো আর সে নাব্‌বে না— তাই এইটুকু সময়ের মধ্যে তা'কে যতখানি দেখতে পারা যায়, তাই দেখে নেয়া যাক্।

তারপর এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘট্‌লো। সে গাড়ির দরজা খুলে নেমে পড়লো — আর তাঁর পেছনের গদিতে এলিট্‌সাবেথ্ কাঁচুমাচু মুখ করে' বসে' আছে।

অবিশ্যি আমি যেই তাকে দেখলাম, অম্‌নি ছুটে গেলাম গাড়ির দরজার দিকে, তখন সে — এলিট্‌সাবেথ্ নয়, সেই যে সে — আমাকে শুধোলে,

"তোমার নামই কি ডোরিয়ান ফেস্টুব্যর্ট?"

কথা বল্‌বার মত অবস্থা আমার ছিলো না; তবু কষ্টেসৃষ্টে জানিয়ে দিলুম যে আমিই সে।

শুধোলাম, "কিন্তু তোমার নাম তো স্যামুয়েল ও'রিয়ে নয়?"

"কেন নয়?"

"আমি—আমি ভাবতে পারি নি যে তুমিই সে হ'তে পারো।"

হঠাৎ যেন মনে পড়ে' গেল, এই ভাবে সে বলে উঠ্‌লো, "এলিট্‌সাবেথের অসুখ করেছে ভয়ানক মাথা-ধরা।"

এ কথায় আমি নিজেকে অনেকটা সাম্‌লে নিলুম এবং এমন ভাব দেখালুম যেন এলিট্‌সাবেথ্‌কে দেখে আমি কতই না খুসি হয়েছি। তা'কে সত্যি ভয়ানক শুক্‌নো দেখাচ্ছিল। তা'র মুখ কাগজের মত শাদা — মাঝে মাঝে লাল ছোপ। ম্যুরিয়েল ও'রিয়ে'র পর তাঁকে দেখ্‌তে ভয় করতে লাগ্‌লো রীতিমত — তাই আমি চট্ করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলুম।

তখন ম্যুরিয়েল বল্‌লে;

"আমাদের জিনিষগুলো নামিয়ে ফেল্‌লেই তো পারো, ট্রেন্ এক্ষুণি ছেড়ে দেবে যে।"

তা'র এ কথা কী মিষ্টি যে শোনালো তা লিখ্‌লে বোঝা যাবে না।

আমি কোনোমতে এলিটসাবেথ্‌কে প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে দিলুম; সেখানে দাঁড়িয়ে সে কাঁপ্‌তে



লাগ্‌লো। আমার গায়ে যে কত জোর তা দেখিয়ে দেবার জন্যে আমি ওদের সমস্ত জিনিষপত্তর এক সঙ্গে তুলে নিয়ে গাড়িতে রাখ্‌লাম। ম্যুরিয়েলের ব্যাগটা নিয়ে যাবার সময় আমার খুব গর্ব্ববোধ হ'তে লাগ্‌লো কিন্তু সত্যি বল্‌তে কি সে এলিট্‌সাবেথ্‌কে ধরে' হাঁটিয়ে আনছিলো বলে আমাকে বিশেষ লক্ষ্য করেনি।

তখনকার মত গাড়িটার মালিক হতে আমার বেশ মজা লাগছিলো, কিন্তু এলিট্‌সাবেথের অসুখ করাতে তা'কে আমার পাশে বসাতে হ'ল। ম্যুরিয়েল বস্‌লে পেছনে গদিটায় — সেটা আবার মোটেই নিরাপদ নয় — তাই বেশ যত্ন করে'ই গাড়ি চালাতে হ'ল। একবার শুধু একটা কুকুরের গাড়ি ও একপাল মুরগীর মাঝখান দিয়ে বেশ এক হাত গাড়ি চালানো দেখিয়ে দিলুম। এলিটসাবেথটা তো ভয়ে চেঁচিয়েই উঠ্‌লো কিন্তু ম্যুরিয়েল চুপ করেই রইলো। বুঝলাম সে দেখতে যেমন খাসা — সাহসও তেমনি তা'র আছে।

বাড়ি এসে যখন পৌঁছলুম তখন মামীমা বেরিয়ে এসে এলিট্‌সাবেথ্‌কে নিয়ে একটা হৈ হৈ রৈ রৈ বাঁধিয়ে দিলেন; বল্‌লেন তা'কে এক্ষুণি বিছ্‌নায় গিয়ে শু'তে হবে। ম্যুরিয়েল্‌কে তিনি চোখেই দেখ্‌লেন না যেন।

ওরা দু'জন এক ঘরেই শোবে, এই ব্যবস্থা করা হয়েছিলো, কিন্তু মামীমা বল্‌লেন যে এলিটসাবেথের হয়তো কোনো ছোঁয়াচে রোগ হয়েছে তাই ম্যুরিয়েলকে আর একটা ঘরে থাক্‌তে দেয়া হ'ল। সে ঘরটা আর আমার ঘরটা একই বারান্দার ওপর।

আমি ওর জিনিষপত্রগুলো ওপরে নিয়ে খুলে রাখলাম — যা'তে ওকে কোনো হ্যাঙাম না পোয়াতে হয়। জান্‌লার বাইরে চমৎকার এক গোছা গোলাপ ফুটে ছিলো; আমি তা কেটে এনে একটা জলভরা ফুল্‌দানিতে রাখ্‌লুম। ঘরটা যেন হেসে উঠ্‌লো। ও ওপরে না আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে' থাক্‌বো, ভাব্‌ছিলাম — কিন্তু তক্ষুণি শুনতে পেলাম মামীমা ডাকছেন; তাই তা আর হ'য়ে উঠলো না।

আমার ডাক্তারকে ডেকে আন্‌তে হ'বে গিয়ে, কেন না, 'মিস্ ও'রিয়ে'র মতে এলিট্‌সাবেথের হাম হয়েছে। ওদের ইস্কুলে ভয়ানক হাম লেগেছিলো — এলিট্‌সাবেথই বেঁচে গিয়েছিলো কেবল।

বাইরে যেতে হ'বে শুনে আমার মেজাজ চটে গেল — ডাক্তারের বাড়ি আবার পাঁচ মাইল দূরে। তাই আমি মামীমাকে বল্‌লাম যে ম্যুরিয়েলের হয়তো গাড়িতে যেতে বেশ ভালই লাগবে। মামীমা কিন্তু বল্‌লেন যে তা কিছুতেই হ'তে পারে না, কারণ সে লাঞ্চের সময় পর্য্যন্ত তা'র জিনিষগুলো গোছাতে ব্যস্ত থাক্‌বে।

তখন আমার মনে পড়্‌লো যে কোনো লোকজন এলে তা'দের ঘর নিজে দেখাশোনা করা মামীমার চিরকেলে অভ্যেস। ঠিক তাঁর মর্জিমত সব গুছোনো চাই। আমার কেমন যেন মনে হ'ল যে ম্যুরিয়েল তার কাপড় চোপড়গুলো একটু ফেলে ছড়িয়ে রাখবে হয়তো তাই আমার টুপিটা বিছানায় ফেলে এসেছি, এই ভাণ করে 'আমি তা'কে একটু সাবধান করে দিতে ওপরে চলে' গেলাম।

ওর ঘরের দোর খোলাই ছিল। হ্যাট্ খুলে ফেলাতে রোদ এসে ওর মাথায় ঝিলিক খেল্‌ছিলো। তখন আমার চোখে পড়্‌ল যে ওর যেন দু'ধরণের চুল আছে; এক হচ্ছে চিকণ, মোলায়েম ঢেউ খেলানো টুপির মত তা'র মাথার ওপর বসানো— আর ঠিক তার ওপর

পাৎলা কয়েক গোছা চুল হাওয়ায় উড়ছে—বাইবেলের ছবির মাথার ওপরকার আলোর মত।

ওখানে দাঁড়িয়ে ওর দিকে অমন করে তাকিয়ে থাকায় বোধ-হয় একটা বোকার মত দেখাচ্ছিল কিন্তু তাতে ও মোটেই কিছু মনে করছিলো না। ওর ক্লান্ত, সবুজ চোখ দু'টি তুলে ও আমার পানে তাকালো; পরে বললে :

"তুমি তো বেশ লম্বা ডোরিয়ান্।"

এ কথার কি জবাব দেবো, তা খুঁজে না পেয়ে জড়ানো স্বরে মামীমার ব্যস্তবাগীশতার কথা বলে ফেললাম।

"ধন্যবাদ" সে বললে "তুমি আমায় সাবধান করে' না দিলে আমি সব জিনিষপত্তর ছড়িয়ে রাখতুম আর একটু হলেই।"

আমি ওকে বললুম, "আমার এখন ডাক্তার ডাকতে যেতে হবে। বিকেলে কি তুমি বেড়াতে যাবে?"

"মন্দ কি?"

"রাইট্-ও। লাঞ্চের পর, তাহ'লে।"

ডাক্তারকে নিয়ে এলাম। তিনি এলিট্সাবেথকে দেখে বললেন যে তা'র ঠিকই হাম হয়েছে। এ কথা শুনে মামা ভয়ানক অস্থির হয়ে পড়লেন, কারণ তিনি মনে করতে পারছিলেন না তাঁর নিজের কখনো হাম হয়েছিলো কিনা।

মামীকে রুগীর ঘরের পাশে তিনি কিছুতেই যেতে দেবেন না; পাছে তাঁর গায়েও ছোঁয়াচ্ লাগে। মুখে এ-কথা বললেও সত্যি সত্যি তাঁর ভয় ছিলো পাছে মামীমার থেকে ছোঁয়া লেগে তিনি নিজেই অসুখে পড়েন।

লাঞ্চের সময় যে-সব কথাবার্তা হ'ল তা একেবারে যাচ্ছেতাই। মামা-মামীমা দু'জনের জন্যেই আমার ভয়ানক লজ্জা করতে লাগলো। তাঁরা দুজনেই এ-কথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন যে ম্যুরিয়েলের এ বাড়িতে থাকাটা "বর্তমান অবস্থায় অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়।" আমি কোনো কথা কইবার চেষ্টা করেছি কি তাঁরা দু'জনে মিলে' আমাকে থামিয়ে দিলেন — যেমন চিরকাল দিয়ে থাকেন। আরো বিচ্ছিরি ব্যাপার ঘট্লো তখন যখন মামা দু'-দুবার আমার আদব কায়দার ভুল শুধ্রে দিলেন।

মামীমা বললেন, "বিকেলে আমি একটু বেরুবো, আর মিঃ রানসার্ট তার পড়বার ঘরে ব্যস্ত থাকবেন (অর্থাৎ ঘুমিয়ে থাকবেন)। তুমি বোধ হয় পড়তে ভালোবাসো — একা বসে' কী-ই বা করবে আর!"

ম্যুরিয়েল বললে, "ধন্যবাদ, আমি বোধ হয় একখানা বই নিয়ে বাগানে বসতে পারি —" মামীমা একখানা বাঁধানো "দি চার্চম্যান" দিয়ে তাঁর সভায় চলে গেলেন। মামা ঢুকলেন পড়বার ঘরে, আর ম্যুরিয়েল ব্যাজার মুখে একটি ছোট গাছের ছায়ায় বসে পড়বার ভাণ করতে লাগলো।

মামা ও মামীকে যথেষ্ট আলগোছ হ'বার জন্যে কুড়ি মিনিট সময় দিয়ে আমি বাগানে



ম্যুরিয়েলের কছে গেলাম।

শুধোলাম, "বইটে ভালো লাগ্ছে?"

'উঁহু।'

"মামা-মামীমাকে তোমার ভালো-লাগ্লো?"

ও মাথা নাড়লো; বললে "এঁদের সঙ্গে থাকা একটা বিদ্ঘুটে ধরণের ব্যাপার নিশ্চয়ই।"

"তাই তো মনে হয়।" আমি জবাব দিলাম।

"তুমি কি আগাগোড়াই এঁদের সঙ্গে আছ?"

আমি মাথা নেড়ে জানালাম — হ্যাঁ।

ছেলেবেলা থেকেই। আমার জন্মের সময় মা মারা যান্। বাবাও নিজে গুলি করে মরেন।

চোখ দু'টি বড় বড় করে সে বলে' উঠলো "সত্যি? আমার মা বাবা ঠিক ঐরকম ছিলেন। তাঁরা ভারতবর্ষে থাক্তেন। পাঁচ বছর বয়সে আমি দেশে আসি। বাবার কলেরা হয়েছিলো, বাবার বারণ না শুনে' মা তাঁকে শুশ্রূষা করতেন। মা জানতেন যে বাবা আর বাঁচ্বেন না, তাই তাঁরও পড়ে' থাকার ইচ্ছে ছিলো না।

আমি বললাম, "হ্যাঁ একেই ভালোবাসা বলি আমি। কিন্তু আমাদের একটু অসুবিধে হ'ল। এখন কে তোমার দেখাশোনা করে?"

"ইস্কুলের সময় ইস্কুলের মিস্ট্রেস্রা আর ছুটির সময় আমার জন্যে একজন গার্জেন ভাড়া করা হয়।"

"তোমার গার্জেন কে? লোকটি ভালো তো?'

"সে কিছুই নয় অ্যাটর্নীর আপিস্ মাত্র।"

একটু চুপ করে' থেকে আমি বললাম:

"আমাকে তোমার গার্জেন ঠিক করলে বেশ ভালো হ'ত।"

"সত্যি। তা হ'লে আমারো খুব ভালো লাগ্তো।"

"বটে?"

"হুঁ।"

"আমাকে তা হ'লে তোমার ভালো লাগে?"

হ্যাঁ—ভয়ানক।"

"কী মজা! এর আগে আর কারু আমাকে ভালো লেগেছ বলে তো মনে হয় না।"

"কেন? আমার তো মনে হয় যে লোকে তোমাকে পছন্দ না করে'ই পারে না।"

"পারে না আবার! খুব পারে। মামা-মামীমা দিব্যি পারছেন।"

"আহা বেচারা!"

তখন আমি শুধোলাম:

"তোমাকে খুব ভালোবাসে, এমনও কি কেউ নেই?"

"না।"

"ভারি মজা তো; — আমরা দুজন একই রকম।"

ছেলেরা বোধ হয় এ নিয়ে খুব মন খারাপ করে না?"

"করে না কি রকম? আলবৎ করে। আমি বল্‌ছি করে। মাঝে মাঝে অসহ্য হ'য়ে ওঠে। ছোট থাক্‌তেও খারাপ লাগ্‌তো, কিন্তু বড় হয়েছি পর যেন আরো খারাপ লাগ্‌ছে। প্রায়ই আমি বিছনায় শুয়ে'-শুয়ে' ভাবি আর ভাবি — কি যে ভাবি তা ঠিক বুঝ্‌তে পারি নে। হয়তো মা'র কথা, অন্তত: আমায় ভালোবাস্‌বে এমন কারু কথা। বুঝলে?"

"হুঁ। আমারো প্রায়ই সে রকম মনে হয়। একা থাকা বিচ্ছিরি ভয়ানক বিচ্ছিরি—একা থাকা আর জানা যে একা তোমায় থাক্‌তেই হ'বে, এর কোনো চাড়া নেই।"

ও কথাগুলো কী মিষ্টি করে যে বল্‌তো! — অমন আর শুনিনি।

আমি বল্‌লাম "আমি কখনো কোনো মেয়ের সঙ্গে কথা বলি নি — সত্যি সত্যি বলি নি আর কি।"

"আমিও কখনো কোনো ছেলের সঙ্গে সত্যি সত্যি কথা বলি নি কিন্তু বল্‌বার ভয়ানক ইচ্ছে ছিলো। 'ছেলে' বলাতে চট্‌লে না তো।"

"না বরং খুসি হ'লাম। মামীমা আমাকে বলেন 'যুবক' আর মামা বলেন 'ছোক্‌রা।' কী বিদ্‌ঘুটে কথা! নয় কি?"

"প্রায় 'সোমত্ত মেয়ে'র মতই বিদ্‌ঘুটে।"

"কী বিচ্ছিরি কথা! তোমার বয়স কত?"

"ষোলো"।

"আমারও তাই—ষোলোর একটু বেশি। এ বয়েসটা বেশ ভালো এর চেয়ে খুব বেশি বড় হ'তে আমি চাই নে। তোমাকে ম্যারিয়েল বলে ডেকেছিলুম বলে মামীমা আমাকে শুধ্‌রে দিয়েছিলেন — মনে আছে? তুমি কিছু মনে করো নি তো?"

"তুমি আমায় মুলি ডাক্‌লে আরো খুসি হ'ব।

"সত্যি?"

"হ্যাঁ, কারণ আর কেউ ডাকে নি।"

ওকে প্রথমবার মুলি বলে ডাকতে যে আমার কি রকম লেগেছিলো তা আমি বল্‌তে পার্‌বো না; আর ও যখন ঠিক কর্‌লে যে আমিও ডোরিয়ান না হ'য়ে ডোরি হ'ব, তখন আমার ইচ্ছে কর্‌ছিলো ওকে জড়িয়ে ধরতে।

বল্‌লাম, "মুলি, তোমার মত সুন্দর মেয়ে, তোমার মত লক্ষ্মী মেয়ে পৃথিবীতে আর নেই। তোমাকে ভালোবাসি, সর্ব্বদা ভালোবাসি, ভয়ানক ভালোবাসি।"

ও বল্‌লে, "তুমি আমায় ভালোবাসো শুনে' খুশি হলাম কারণ আমিও তোমাকে ভালোবাসি। তুমি আমায় না ভালোবাসলে আমার মতো দুঃখী, আমার মত লক্ষ্মীছাড়া পৃথিবীতে আর থাক্‌তো না।"

আমি বলে উঠলাম, "তাহলে তোমার দুঃখী কি লক্ষ্মীছাড়া হ'বার মোটেই দর্‌কার নেই, কারণ এক মিনিট আগে যা বাস্‌তুম, এখন তার দ্বিগুণ ভালোবাসি তোমাকে।" তারপর আমি



তার হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিয়ে প্রায় এক যুগ ধরে রাখ্‌লাম — ছোট্ট হাতখানা, নরম, গোলাপী। কেউ কোনো কথা বল্‌লাম না।

ব্যাপারটা অদ্ভুত বটে, কিন্তু মানুষের মনে যখন ভয়ানক আনন্দ হয়, তখন সে কোনো কথা বল্‌তে পারে না। রাজ্যের যত সুন্দর কথা তার মনে হ'তে থাকে, কিন্তু হাজার চেষ্টা করলেও সে তা' মুখে বলে উঠ্‌তে পারে না। কথাগুলো তার গলা পর্য্যন্ত এসে আট্‌কে থাকে যেন — তা'কে ঢোঁক গিলিয়ে ছাড়ে। কিন্তু যখনই কোনো কথা মনে আসে, সে তা' জানতে পারে আর জান্‌তে পারে আর-একজন তখন তারা দুজন এই একটু জোর দিয়ে, এ ওর হাত চেপে ধরে আর সব না-বলা কথাগুলো তা'দের আঙুলের মধ্য দিয়ে ঝিলিক খেলে আসা যাওয়া করতে থাকে।

অনেক পরে আমি যখন মুখ খুল্‌লাম, তখন এমন একটা কথা বল্‌লাম যা সেই সময়ে বলবো বলে কেউ আশা করবে না।

"আজ রাতে তোমাকে গাড়ি করে ফেল্‌টনে পৌঁছিয়ে দেবার কথা আছে আমার।"

"হ্যাঁ; — ভারি মজা হ'বে, না?"

"এখন এলিট্‌সাবেথের অসুখ করেছে বলে' মাসীমা বোধ হয় আমাদের যাওয়া বন্ধ করে দিতে চাইবেন। তাঁকেও আমাদের সঙ্গে আস্‌তে বল্‌লে মন্দ হয় না।"

"কিন্তু তিনি যদি হ্যাঁ বলে ফেলেন?"

"তা তিনি বল্‌বেন না। কিন্তু তুমি বল্‌লে তিনি হয় তো আমাদের বারণ কর্‌তে পার্‌বেন না; — বুঝলে না"?

"আচ্ছা, তা হ'লে আমিই বল্‌বো তাঁকে।"

তখন আমরা সবটা জায়গা ঘুরে বেড়ালাম। ছেলেবেলায় ওখানে যত লুকোবার জায়গা তৈরী করেছিলুম, সব তা'কে দেখানো হ'ল। এক কোণে আমার অনেকগুলো পোষা জীবকে মর্‌বার পর গোর দেওয়া হয়েছিলো — একটা টিয়া পাখী, দুটো শাদা ইঁদুর আর একটা ময়না। ময়নাটাও আমার পোষ মেনে গেছল অনেকটা — আমার হাত থেকে রুটির টুকরোও খেতো। প্রত্যেক গোরের ওপর এক একটি করে' ঝিনুক বসানো ছিলো, তাদের মৃত্যু-তারিখে আমি এক একটি করে খুব ছোট্ট ফুলের তোড়া তাদের কবরের ওপর রাখ্‌তাম। এ-সব কথা কোনোদিন কাউকে বলি নি বলে বল্‌তে ভয়ানক অদ্ভুত ঠেক্‌ছিলো; কিন্তু কি করে জানি নে একবার যখন আরম্ভই করে' দিলাম তখন মুলির কাছে যা-খুসি তাই বলতে পার্‌তাম যেন, আর মুলিও আমার কাছে যা-খুশি তাই বল্‌তে পার্‌তো।

চা খাবার সময় যখন হ'ল তখন আমাদের দু'জনার মধ্যে কোনো গোপন কথা ছিলো না — একটিও না।

মামীমা বল্‌লেন, "ফেল্‌টনে তোমার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করবার কথা ভাব্‌ছিলাম।"

মুলি বল্‌লে, "ঠিক কথা। আপনিও কি যেতে পার্‌বেন মিসেস্ রান্‌সার্ট?"

"সে অসম্ভব", মামীমা জবাব দিলেন, কিন্তু মুলি ও কথা বলে বাঁচিয়ে দিলে, কারণ আমি জানি মামীমা আমাদের বারণ কর্‌বার কথাই ভাবছিলেন। যাক্—তিনি বহু উপদেশ দেবার পর আমাদের যেতে দিলেন এবং বার বার বলে দিলেন যে ফিরতে যেন সাড়ে নটার বেশি

দেরী না হয়।

ছটার সময় গাড়িতে স্টার্ট দিলুম, তারপর বোঁ করে বেরিয়ে পড়লুম আমরা। আ:—সে যে কী! আমরা ঠিক তীরের বেগে ছুটতে লাগলুম, মুলি আমার গা ঘেঁষে বসে , তার সুন্দর লাল চুল উড়ে উড়ে আমার মুখে এসে পড়ছে। আমার ভয়ানক গান গাইবার ইচ্ছে হ'ল, গাইলামও; — মনে হ'ল সমস্ত বন আর মাঠ আমার সঙ্গে গান করছে। অবিশ্যি অনেক ঘুরে' গেছলুম আমরা, তাই পোনে-আটটার আগে সেখানে পৌঁছানো গেলনা।

ওঁরা সত্যি বেশ লোক—মুলির মা-বাবার সেই বন্ধুরা। আমাদের চমৎকার ডিনার খাওয়ালেন; এমনকি সিগ্রেটের একটা কেস্ আমার দিকে ঠেলে দেবার মত ভদ্রতা জ্ঞানও তাঁদের ছিলো।

ওঁদের বাড়িময় একটা চমৎকার এলোমেলো ভাব; — নোঙরা নয় অবিশ্যি, অথচ কেমন যেন ঘরোয়া — যা'র যেখানে যা খুসি, তাই রাখে যেন। একটা ইজি-চেয়ারের নীচে এক জোড়া চটি জুতো দেখ্‌তে পেলুম; আর বাড়ির এক ছেলে ডিনারে একটু দেরী করে' এসেছিলেন বলে' হল্‌এ দাঁড়িয়ে জুতো জোড়া ছুঁড়ে ফেললেন — তারপর চেঁচিয়ে একটা চাকরকে বললেন তাঁর প্যাম্প-জোড়া নিয়ে আসতে। হ্যাঁ — একে বলে গিয়ে থাকা! আমি ঐ-রকম কর্‌লে মামীমার মুখের চেহারা কি-রকম হ'ত, তা অনুমান করতে চেষ্টা কর্‌লাম।

ন'টার সময় চলে আস্‌তে মন কিছুতেই চাচ্ছিলো না; — আর মুলিকে আমার সঙ্গে যদি ফিরে না আস্‌তে হ'ত, তা হ'লে আমি আরো খানিকক্ষণ থেকে যেতামই। বাড়িতে না হয় বকুনি খেতে হ'ত খুব!

দু'-দু'বার করে' সবাইকে গুড্-বাই বলে' আমরা গাড়িতে উঠে বসে বাড়ির দিকে রওনা হলুম। চাঁদ তখন বেরিয়ে এসেছে, চক্‌চকে তারাগুলো মিট্‌মিট্ করছে , হাওয়ায় একটু ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব। একটু ঠান্ডাই লাগ্‌ছিলো একটুখানি; তাই মুলি একেবারে আমার গায়ের সঙ্গে লেগে বস্‌লো , আর আমি এক হাত দিয়ে ওর কাঁধ জড়িয়ে ধরে আর এক হাত দিয়ে চালাতে লাগ্‌লাম, ভাগ্যিস্ একটা foot accelerator ছিলো।

ও বললে, "আমার খুব ভালো লাগ্‌ছে ডোরি!"

"আমারও। মনে হচ্ছে, পৃথিবীতে যেন আমরা দু'জন ছাড়া আর কোনো লোক নেই।"

"আমরা যদি এ-ভাবে চল্‌তেই পার্‌তুম, ভোর না হওয়া অব্দি চল্‌তে পারতুম — তা হ'লে খুব সুন্দর হ'ত কিন্তু।"

"চিরকাল চল্‌তে পার্‌লে আরো সুন্দর হ'ত।" আমি বল্‌লুম।

তারপর দু'মাইল রাস্তা আর কেউ কোনো কথা বল্‌লাম না। আমি ভাব্‌তে লাগ্‌লুম এই সপ্তাহটা আমরা দু'জনে কী আনন্দেই কাটাবো।

না বলে পারলুম না, "তুমি চলে' গেলে কি করে' বাঁচবো জানি নে মুলি।"

"সে কথা এখন মনেও এনো না। চাঁদের আলোয় তোমায় কত বড় আর কী সুন্দর দেখাচ্ছে, ডোরি।"

আমি শুধোলাম, "তুমি কত সুন্দর, তা কি তোমাকে বল্‌তে হবে।"



ও তখন বল্‌লে, "হ্যাঁ, বলো", তখন ওকে ভালো করে দেখবার জন্যে আমি মুখ ফেরালুম — যাতে ওর দেহের প্রতিটি ছোট ভঙ্গীর প্রশংসা করতে পারি — আর সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা এক গাদা পাথরের ওপর উঠে' গেল আর সাম্‌নের টায়ারটা গেল ফেটে।

অল্পের জন্য আমরা রাস্তার ওপর উল্টে পড়লুমনা। কী হয়েছে দেখ্‌বার জন্যে আমি তক্ষুণি নাব্‌লুম। পুরোণো টায়ারটা বিচ্ছিরি ভাবে ফেটে গেছে।

বল্‌লুম, "পেছনে আর একটা টুব আছে এটা খুলে' সেটা লাগিয়ে নিচ্ছি।

বস্‌বার গদির তল থেকে কতগুলো যন্ত্রপাঁতি বের করে নিয়ে দশ মিনিটের মধ্যে ফাটা টুবটা খুলে ফেল্‌লুম।

মুলি সেই পাথরের ঢিবির ওপর বসে' আমার কাজ করা দেখতে লাগ্‌লো, আমি ওকে বল্‌লুম যে ওকে দেখাচ্ছে ব্যাঙের ছাতার ওপর বসা একটি পরীর মত।

গাড়ির পেছনের বাক্সটা যখন খুল্‌লুম তখন অবিশ্যি দেখা গেল যে অন্য টুবটা বাড়িতে ফেলে এসেছি।

ও জিজ্ঞেস্ কর্‌লে, "নেই নাকি?"

আমি মাথা নাড়লুম।

"কি আর কর্‌বো, বলো?— এইটুকু পথ হাঁটতেই হ'বে।"

"মাঠের ওপর দিয়ে গেলে বেশি সময় লাগ্‌বে না, তখন আমি আবার এসে গাড়িটা নিয়ে যাব'খন। আমি ভয়ানক বোকা—তাই ঐ পাথরগুলোর ওপর দিয়ে চালিয়ে গেছ্‌লাম।"

"তোমার দোষ কি আর? না গিয়ে পার্‌তে না।"

তখন আমি ওর হাত ধর্‌লাম, তারপর আমরা সবুজ যবের ক্ষেতের মাঝখানে সরু পথটি দিয়ে চল্‌তে লাগ্‌লুম।

বল্‌লে, 'এখন আমার সব চেয়ে ভালো লাগ্‌ছে, ডোরি। ঠিক যেন আমরা অ্যাডাম্ আর ঈভ্।'

আমি জবাব দিলুম, "ঠিক, কিন্তু তুমি যত সুন্দর, ঈভ্ তা'র আর্দ্ধেকও সুন্দর ছিলো না, তা-ও ঠিক।"

"ডোরি, তুমি কি আমাকে খুব ভালোবাসো?"

"সে যে কতখানি তা তোমাকে বল্‌তে চেষ্টা কর্‌লে তোমার বিশ্বাস হ'বে না কক্ষণো।"

"দ্যাখোই না চেষ্টা করে'।

চেষ্টা কর্‌লুম। বল্‌লুম, আমি তা'কে ভালোবাসি মুখোমুখী বসানো দুটো আয়নার মত। আয়না দুটোর একটাতে অন্যটার ছায়া পড়ে — আবার পড়ে — আবার — শেষে একটা ছোট্ট কালো ফোঁটায় এসে মিলিয়ে যায় — এত ছোট যে তা চোখে দেখা যায় না আর।

"আর চিরকাল এম্‌নি চল্‌বে মুলি।" আমি বল্‌লাম। বলে'ই মুখ তুলে' দেখ্‌লাম যে আমরা বাড়িতে এসে পড়েছি। খাবার ঘরের জান্‌লায় একটা আলো জ্বল্‌ছে সেখানে মামীমা আমাদের অপেক্ষায় বসে আছেন।

দেখে মুলিকে বল্‌লাম "আমাদের এখনই বিদেয় নেয়া ভালো কারণ তোমাকে ভেতরে

দিয়ে এসে আমাকে গাড়িটা আন্‌তে যেতে হ'বে আবার।"

"তুমি খুব—খুব সাবধানে যাবে তো?"

"নিশ্চয়ই।"

"তুমি ফিরে' না আসা পর্য্যন্ত আমি ঘুমাবো না—সারা সময় পথ-চলা পথিকদের কথা ভাব্‌বো।"

"আমি ভালোমত ফিরেছি, এ কথা তোমাকে জানাবার জন্যে তোমার দোরে আ—স্তে ঘা দিয়ে যাবো, কেমন?"

"আচ্ছা বেশ।"

"এখন তা হ'লে গুড-নাইট্।"

"গু'নাইট্, ডোরি।"

"মুলি, তোমাকে—তোমাকে চুমো দিতে ভয়ানক ইচ্ছে করছে দেবো?"

"দাও"।

দিলুম, সে-যে কি-রকম — ও: সে যে কিসের মত তা আমি জানি নে, কিন্তু এত মধুর কোনো কিছু আমার জীবনে আর ঘটে নি। আর কখনো মনে হয় নি যে আমার সর্বাঙ্গ বেয়ে আনন্দ উপচে পড়ছে — যেদিন যেমন মনে হচ্ছিলো। অত আনন্দে আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছিলো।

ভেতরে গিয়ে মামীমাকে সব কথা বুঝিয়ে বল্‌লুম তখন রাত সাড়ে-দশটা। যা ভেবেছিলুম, তার চাইতে ভালো হলেও মামীমার মেজাজ বেজায় খিট্‌খিটে হ'য়ে ছিলো।

মুলিকে বল্‌লেন, "যত শীগ্‌গির পারো, বিছানায় শুয়ে' পড়ো গে। আর তুমি, ডোরিয়ান্, এক্ষুণি গাড়িটা আন্‌তে যাও। আস্‌বার সময় গোলমাল করে' তোমার মামার ঘুম ভেঙে দিয়ো না আবার।"

হল্-এর ভেতর দিয়ে আস্‌তে-আস্‌তে শুনলাম :

"মি: রান্‌সার্ট ও আমি ঠিক করেছি যে বর্তমান অবস্থায় কাল সকালে তোমার পক্ষে আমার বোনের কাছে ফিরে যাওয়াই সব চেয়ে যুক্তি সঙ্গত।"

আমি এমন ভাবে ফিরে দাঁড়ালুম যেন কেউ আমাকে গুলি করেছে। গম্ভীরভাবে সেই ঘরে ফিরে গেলুম।

"কি হয়েছে, ডোরি?"

"আপনি আমাকে ডাক্‌লেন না?" মিথ্যে করে' বললুম।

"আমি সেরকম কিছুই করি নি। শীগ্‌গির যাও। সারা রাতে জেগে থাক্‌বার মৎলব আমরা করি নি।"

আর কিছুই বল্‌বার ছিলো না, তাই চলে'ই আস্‌তে হ'ল। বিদ্‌ঘুটে মোটরের চাকাটা কাঁধের ওপর ফেলে সেই বিচ্ছিরি মাঠগুলোর ওপর দিয়ে হেঁটে গেলাম — স্বপ্নের ঘোরে যেন।

মুলি কাল চলে যাচ্ছে, আমার মুলি। সে চলে যাচ্ছে হয়তো তার সঙ্গে আর কখনো দেখা



হ'বে না।

মা মারা যাবার পর বাবার যে রকম লাগ্‌ছিলো, আমারও মনটা সেই রকমই লাগ্‌ছিলো বোধ হয়। কোনো মতে চাকাটা জুড়ে দিয়ে যন্ত্রপাতিগুলো গাড়ির ভেতর ছুঁড়ে ফেলে স্টার্টিং হ্যাণ্ডল্‌টায় একটা বিরাট ঝাঁকুনি দিলুম — তারপর ড্রাইভারের জায়গায় নিজেকে ছুঁড়ে ফেল্‌লাম।

রাস্তা দিয়ে প্রায় দু'মাইলের পথ। আমি খুব বে-পরোয়া ভাবে চলে' আস্‌তে লাগ্‌লুম। আর একটু হলেই একটা ছোট্ট সাঁকোর বেড়া-টেড়া ভেঙে একেবারে জলের মধ্যে পড়ে গেছ্‌লুম আর কি! পড়ে' গেলেই ভালো হ'ত। একটা খাড়া পাহাড়ের ওপর থেকে গড়িয়ে পড়তে পার্‌লে খুবই ভালো হ'ত — না-হয় রেলগাড়ির নীচে নিজকে ফেল্‌তে পার্‌লে।

তখন আমার মনে পড়্‌লো যে মুলির কাছে কথা দিয়েছিলুম খুব সাবধানে থাক্‌বো। তখন গতির বেগ একটু কমিয়ে দিলুম।

আমার যত খারাপ লাগ্‌ছিলো, ওরও কি ততই খারাপ লাগ্‌ছিলো? আমার মত ওর মনও কি দুঃখে বিষিয়ে উঠেছিলো তা কারুরই হ'তে পারে না।

বোঁ করে' গরাজের মধ্যে ঢুকে' গেলুম, এক লাথিতে লাইট্‌টা নিবিয়ে দিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুক্‌লুম।

কী কুচ্ছিৎ সব দেখাচ্ছিলো — ঐ তক্‌তকে আয়নাটা ঐ ভিজিটিং কার্ডওলা অর্থহীন থালাটা, কাঁসার শিকে ঝোলানো ব্রুশের সারি! সব দেখে আমার গা জ্বলে উঠ্‌লো, ইচ্ছে কর্‌ছিলো সব জায়গায় আগুণ জ্বালিয়ে দিই।

শোবার ঘরে গিয়ে কাপড়-চোপড় গুলো টেনে হিঁচড়ে খুলে ফেল্‌লুম। আয়নায় দেখ্‌লুম, আমার মুখটা তেলে কালিতে চপ্‌চপ্ করছে। দেখে আমার মাথায় যেন খুন চেপে গেলো। একটা ড্রেসিং গাউন আর এক জোড়া পায়জামা নিয়ে চট্ করে গিয়ে স্নানের ঘরে ঢুকলুম। আমার সত্যি মনে হয় যে তখন চান্ করেছিলুম বলে'ই সেদিন দারুণ একটা কিছু কাণ্ড করে' বসি নি। কারণ সেই গরম জলের নীচে বসে আমার মনের ভয়ানক ক্ষোভ যেন মিটে' গেল — শুধু মনে পড়তে লাগ্‌লো সারাটা দিন কী অদ্ভুত ভাবে কেটেছে আর বাগানে সেই কখনো না ভুলে যাবার মত গুড্-নাইট। তারপর গা শুকিয়ে পা-জামা আর ড্রেসিং গাউন্ পরে নিয়ে চুল আঁচড়ে আলোটা নিবিয়ে দিলুম।

বারান্দা দিয়ে আস্‌তে আস্‌তে শুন্‌তে পেলুম, মামা ও মামীমা নাক-ডাকার প্রতিযোগীতা সুরু করে' দিয়েছেন। মামীমারই হার হ'ল। তাঁর দু'-এক সেকেণ্ড চুপ্ করে' থেকে তারপরে হঠাৎ শূয়োরের মত ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে' ওঠ্‌বার বিষম অভ্যেস ছিলো। আমার ঘরটা তাঁদের ঘর থেকে অনেক দূর বলে আমি প্রায়ই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়েছি, কারণ একবার যখন আমাকে তাঁদের ঘরের পাশের ঘরে এসে শুতে হ'য়েছিলো, তখন তাঁ'রা দু'জনে মিলে যে গোলমাল করেছিলেন তাঁর জন্য সারারাত আমার ঘুম হয় নি।

সিঁড়ির সব চেয়ে ওপরের ধাপে এসে এক ফুঁয়ে মোমবাতিটা নিবিয়ে দিলুম; তারপর আমার ঘরের দিকে এগুতে লাগলুম।

মুলি'র দোরের কাছে এসে থামলুম। ও পরিষ্কার করবার জন্যে ওর ছোটো-ছোটো জুতো

দু'টি বাইরে এনে রেখেছিলো, তাঁর ওপর চাঁদের আলো এসে পড়ে ঝল্‌মল্ করছিলো। আমি জুতো দু'টি তুলে' নিয়ে তাতে চুমো খেলাম।

ভাবলুম, "এতক্ষণে ও ঘুমিয়েছে বোধ হয়। আমার কথামত দোরে যদি ঘা দিই তা হ'লে ও জেগে যাবে।" ওর গলার স্বর আর-একটিবার শোন্‌বার জন্যে মনটা আথালি-পাথালি করছিলো আমার। কিন্তু আমার মনের জোরও কম ছিলো না, তাই নীচু হ'য়ে জুতো দু'টি আবার ঠিক জায়গায় রেখে দিলুম। ইঁদুরের মত চুপ্‌চাপ্। একটুও শব্দ হল না। তখন দেখলুম, ওর দরজার নীচেকার ফাঁকা দিয়ে একটি ছোট্ট আলোকের শিখা এসে পড়েছে। আমার বুক ভয়ানক জোরে দুলে উঠ্‌লো। ও তাহলে ঘুমিয়ে পড়ে নি, না হয় তো মোমবাতিটা জ্বালিয়ে রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছে। এ কথা ভেবে ভীষণ ভয় করতে লাগলো। মোমবাতি উল্টে পড়ে' যদি ওর বিছ্‌নায় আগুণ ধরিয়ে দেয় তা হ'লে কি হ'বে?

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে নখ্ কামড়াতে লাগলুম আর ভাব্‌তে লাগলুম, কি করা যায় — অনেকক্ষণ। তারপর মন ঠিক করে' ফেল্‌লুম। আমি খু—ব আস্তে টোকা দেবো একবার—একবারটি মাত্র — তারপর ও যদি কোনো সাড়া না দেয়, তা হ'লে চুপি-চুপি ঘরের ভেতরে ঢুকে' আলোটা নিবিয়ে দিয়ে আস্‌বো।

খুব জোরে একবার নিশ্বাস নিয়ে আমি একবার টোকা দিলুম একটিবার মাত্র। তক্ষুণি শুন্‌তে পেলুম :

"তুমি ডোরি?"

"হ্যাঁ"

"ইস্, আমি যা ভয় পেয়েছিলুম! ভেবেছিলুম, তোমার কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে। তুমি যখন এলে তখন শুন্‌তে পাই নি কিন্তু।"

"আমি ভালোই আছি, মুলি। গুড্-নাইট।"

"ভেতরে এসে চুমো খেয়ে আমাকে গুড্-নাইট বলে' যাও না!"

ও এই কথাটি বলুক, সারাক্ষণ আমি সেই প্রার্থনাই করছিলুম আর করছিলুম।

ভেতরে গিয়ে দেখি, ও বিছ্‌নার ওপর বসে' আছে, ওর সুন্দর চুলগুলো একখানি শালের মত কাঁধের ওপর ছড়িয়ে দেয়া, কিন্তু আমার মনে হ'ল চোখ দু'টি ওর ম্লান ভেজা-ভেজা।

"কাঁদছিলে?"

"হ্যাঁ—আমার এত ভয় করছিলো — আর তা-ছাড়া"—

"কাল আমাকে ছেড়ে চলে' যাচ্ছ বলে'?

ও নীচের ঠোঁট কামড়ে মাথা নেড়ে সায় দিলে, আর আমি বলে উঠ্‌লুম:

"মুলি, ও মুলি, ও-কথা মনে করলে আমারও কাঁদতে ইচ্ছে করে।"

ওর বিছানার ওপর বস্‌লাম, ওকে চুমো খেলাম, ও আমাকে চুমো খেলে। আমরা দু'জনে দু'জনাকে এত শক্ত করে' জড়িয়ে ধরলাম যে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হ'তে লাগলো।

ও কোনোমতে বল্‌লে, "ঠিক অনেককাল আগেকার মত লাগ্‌ছে — আমার বয়েস যখন পাঁচ।"



আমি জবাব দিলুম, "আমার জীবনে এ-রকম আর ঘটে নি, কিন্তু এখন আমি বুঝ্‌তে পারছি যে সারাজীবন ভরে' মন যা চেয়েছে এ তাই হচ্ছে।"

খানিক পরে ও বালিশের ওপর মাথা রেখে শুয়ে' পড়্‌লো আমার হাত ওর গলায় জড়ানো, আমার মাথা ওর মাথাটির পাশে।

"ভারি সুন্দর, না?" ও—কি না কথাটা? — "ফুঁপিয়ে উঠ্‌লো" কি? উহুঁ, কোনো ঠিক কথা আছে বলে তো মনে হয় না। ও যা বল্‌লে তা ভালোমত শুন্‌তে পেলুম না, কিন্তু আমার গালে ওর গালের যে-স্পর্শটুকু লেগে ছিলো, তারি মধ্যে অনুভব করলুম। তেমনি ভাবে বহুক্ষণ কেটে গেলো, বহুক্ষণ। শেষে আমার দুটো চটিজুতো ফস্‌কে মেঝের ওপর পড়ে' গেলো, আর মোম-বাতিটা খুব ছোট হয়ে জ্বল্‌তে লাগ্‌লো।

আমি ফিস্‌ফিস্ করে' বল্‌লুম, "বছরের পর বছর একা থাকা আমাদের সার্থক হয়েছে, কারণ এখন আমাদের একা থাক্‌তে হচ্ছে না। আমাদের মত কি কেউ কখনো কাউকে ভালোবেসেছে?"

আমি "বুঝ্‌লুম যে ও মাথা নেড়ে জানাচ্ছে না" — কিন্তু দেখ্‌তে পেলুম না, কারণ আমি কথাটা শেষ করতে না কর্‌তেই মোমবাতিটা কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে নিভে গেলো। তখন আমি আরো একটু শক্ত করে' ওকে জড়িয়ে ধর্‌লুম ওকে দেখ্‌তে পাচ্ছিলুমনা বলে' — আর ও এমনভাবে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লে যাতে মনে হ'ল, ওর মত সুখী আর কেউ নেই।

অন্ধকারে কথা বলা ভয়ানক শক্ত, তাই আমরা চেষ্টাও করলুম না; সময় কেটে যেতে লাগ্‌লো। অনেক-অনে-কক্ষণ পরে আমি বুঝলুম, ও ঘুমিয়ে পড়েছে। তখন খুব আস্তে-এত আস্তে যে তা বল্‌লে বিশ্বেস হ'বে না — আমার গাল ওর গালের সঙ্গে ঠেকিয়ে চোখ বুঁজলুম।

কাঁধের ওপর কার যেন হাতের ঝাঁকুনি খেয়ে যখন জাগ্‌লুম, তখন ভরা দিনের বেলা। তাকিয়ে দেখ্‌লুম মামা বিছ্‌নার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। একটু দূরে মামীমা দাঁড়িয়ে—তিনি দাঁত দিয়ে এত জোরে ঠোঁট চেপে আছেন যে তা দেখাই যাচ্ছে না। বুঝলুম, মামা চটে আগুণ হয়ে আছেন, কিন্তু তিনি কিছু বল্‌তে পারার আগেই আমি বলে' উঠ্‌লুম,

"চুপ্, ওকে জাগিয়ে তুলো না।"

"ওকে নিয়ে যাও", মামীমা বল্‌লেন, "আমি এইখানে থাকবো। এ কথা শুনে আমি ভয়ানক একটা কিছু বলে' উঠ্‌তে যাচ্ছিলাম কিন্তু মামা আবার ইচ্ছে করলে খুব জোর ফলাতে পারতেন, — তিনি জোর করে' আমার মুখের ওপর তাঁর হাত চাপা দিয়ে আমার ড্রেসিং গাউনের কলার ধরে টান্‌তে টান্‌তে আমায় ঘরের বাইরে নিয়ে গেলেন।

এ গল্পের এর বেশি আমি বল্‌তে যাচ্ছি না। মামা আমাকে যে-সব কথা বলেছিলেন, তা আমি কিছুতেই আবার বল্‌বো না, আমাকে একশো কোটি টাকা দিলেও না। তিনি আমাকে যেমন নোঙরা বিচ্ছিরি, ভয়ানক সব কথা বলেছিলেন তেম্‌নি মামীমা মুলিকে ঠিক সেই সব কথাই একই সময়ে বলে ছিলেন, এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

তারপর তিনি আমাকে তাঁর ড্রেসিং রুমে বন্ধ করে রাখলেন। তাঁকে ও-কষ্টটুকু না করলেও

চল্‌তো, কারণ ও না চলে যাওয়া পর্য্যন্ত আমি কিছুতেই বাইরে আস্‌তুম না। তিনি সব খেঁৎলে নষ্ট করে দিয়েছিলেন।

এখন তো তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছো, মুলি'র সঙ্গে দেখা হ'লে ও-ই বা কেন শাদা হয়ে যায়, আর আমিই বা কেন লাল হ'য়ে উঠি, আর আমরা বাইসিক্‌ল্‌ বা অন্য কোনো বাজে জিনিষ নিয়ে কথা বলি কেন।

ন'টার একটু পরেই একটা গাড়ি এলো শুন্‌তে পেলুম। সেই গাড়িতেই ও চলে' গেল। আমি এক কোণায় ঠায় দাঁড়িয়ে রইলুম; — আমার যেন দম আট্‌কে আস্‌ছিলো। মনে হচ্ছিল আমি যদি কখনো না জন্মাতুম, তা হ'লেই সব চেয়ে ভালো হ'ত।

এ-সংসার একটা বীভৎস, জঘন্য জায়গা — আর এক মুলি বাদে সব লোক বিচ্ছিরি, বিচ্ছিরি, বিচ্ছিরি।

(অনুবাদক—শ্রীবুদ্ধদেব বসু)

(প্রগতির এই হাতে লেখা সংখ্যাটি যখন প্রকাশিত হয় বুদ্ধদেবের বয়স তখন মাত্র আঠারো বছর। সেই আঠারো বছর বয়সেই কি অসামান্য দক্ষতায় এই অনুবাদকর্মটি করেছিলেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়! — সম্পাদক)



## মানসী

আজিকার অনন্ত আকাশে আছে আলো,
আছে স্নিগ্ধ মদিরতা, শুধু তুমি নাই।
আমার নয়ন-তারা আজও আছে কালো —
যে-আঁখি তোমার রূপ হেরিত সদাই।
আমার অন্তরে আজ জাগে হাহাকার,
জানি না সে হাহা-রব শোনো কিনা তুমি;
আমি যে-সঙ্গীত গাহি অন্তরে আমার
সে কি ধন্য নাহি হয় তব পদ চুমি'
নাই হোক্—মম চিত্তে সৃজিনু হে প্রিয়া,
কল্পনার মূর্ত্তি তব নব রূপময়ী,
প্রতিষ্ঠা করিনু প্রাণ মোর প্রাণ দিয়া —
মম চিত্তে আজিকে জীবন্ত তুমি অয়ি!
বিধাতা তোমারে বিশ্ব হ'তে নিল হ'রে —
আমি পুনঃ সৃজিলাম আমার অন্তরে।

শ্রীঅজিতকুমার দত্ত

## অলস বিলাস

চৈত্র-প্রথমে উতল দুপুরে রবিকর যবে দহে,
মাঠে রোদ্দুরে শূন্যে রচিছে ধূলি-মায়া অপরূপ;
বনবীথি-তলে ঝরা পাতাগুলি মর্ম্মরি' সদা কহে —
আসিবে বন্ধু তাহারি লাগিয়া ধূলির দিবস-ধূপ।

তাহারি লাগিয়া তরু-শাখা মাঝে সমীরণ গাহে গান,
ছোট ডালগুলি তাহারি লাগিয়া মাতালের মত দোলে,
রিক্ত হয়েছে তরু আপনার আভরণ করি দান,
আসিবে বন্ধু ঝরা-পথ বহি' মৃদু বায়ু হিল্লোলে।

অলস দিবসে বিলাস আমারো বনে-থাকা পথ চেয়ে,
অশ্রু শুকায়ে মিলাইয়া যায় বিফল অহঙ্কার,
তবুও তো হায়; আসিল না প্রিয় ব্যথা-হত পথ বেয়ে!
মলয় বাতাসে ঋতু কেটে যায়— কবে সে আসিবে আর?

বাহিরে জগতে শীত এসে কবে মরে গো কুসুম তীরে,
নিদাঘ-দহন ঝরে যবে পড়ে ফাল্গুণ-যবনিকা,
শ্রাবণের ধারা সিক্ত করে যে রুক্ষ ধরিত্রীরে,
— আমার জীবনে শীত লভিয়াছে চির-হিম জয়টিকা।

শ্রীঅমলেন্দু বসু

### অবুঝ

বিদায়-দিনে ভাব্‌চো বুঝি, বিদায় কেমন-তরো
অশ্রু-বারি চোখের কোণে না যদি হয় জড়ো,
বক্ষোমাঝে দুরু দুরু
কাঁপন যদি না হয় সুরু
না হয় যদি অধর-কোণে নীরব জানাজানি,
বল্‌চো বুঝি, এমন দিনে বিদায় নাহি মানি?

আমি বলি, আমার ভাষা কে-ই বা বোঝে, জানে?
বিচ্ছেদেরি করুণ মায়া লাগ্‌লো যে মোর গানে,
নীরবের এই গোপন রাতে
সে গান যারে আনলো সাথে
তোমার চেয়ে সেই তো, প্রিয়ে বুঝ্‌লো মোরে ভালো,
সেই-তো দেখে নিকষ-কালো তোমার যেথা আলো!

লোকের বাণী যায় কি চেনা অশ্রুজলের বর্ষণেই?
— তোমার লাগি আজকে, সখি, হৃদয়ে মোর হর্ষ নেই।

শ্রী পরিমল রায়

### অজানা

কোথায় যেন ফুট্‌চে ফুল পথের পাশে ঝোপ-ঝাড়ে,
হয়তো বা কোন্ কাঁটা-গাছের জঙ্গলে,
মনের মাঝে ছুট্‌লো তারি গন্ধ-গীতের বন্যা রে,
ছুট্‌লো মধু দখিন হাওয়ার অঞ্চলে।

আকাশ-কোণে ঝাপ্‌সা শশী একশো দিনের পথ-শেষে,
বিলোল হ'ল ধরণী তা'র জ্যোছনাতে,
হিল্লোলিত হাসির সাথে ফুল্ল আলোর রঙ্ মেশে
আমার মনে সঙ্গোপনে আজ রাতে।

অনেক দূরে করুণ মুখর বাজায় বীণা কোন্ গুণী,
বুকের মাঝে কাঁপ্‌চে যে তা'র অঙ্গুলি,
মুখর হ'ল বুকের বীণা — স্তব্ধ হ'য়ে তাই শুনি,
সুরের নেশায় উঠ্‌বে হৃদয় মন দুলি'।

চৈতী হাওয়া চঞ্চল হ'ল চিকণ-চুত-চুম্বনে,
মাতাল হ'ল কালো পাখীর উচ্ছ্বাসে,



জাগ্‌ছে ব্যথা, লাগ্‌ছে দোলা স্বপন-ভোলা মোর মনে,
দৃষ্টি-পাতে স্বর্গ-পুরী উদ্ভাসে।

হয়তো বা কেউ আস্‌বে গো এই ঝরা-পাতার পথ দিয়ে,
হয় তো বা কেউ কোনোকালেও আস্‌বে না,
তবু আমার ফুলের সাজি, রূপের ডালি—সব দিয়ে
তা'রি জন্যে কর্‌ব রচন বন্দনা।

বুকের মাঝে চরণ ধ্বনি—আস্‌বে সে গো কাল ভোরে,
আকাশ-পারে বারণ শুনি—আস্‌বে না,
গন্ধ দিয়ে, ছন্দ দিয়ে সাজাই তবু অন্তরে
তা'রি চরণ-পদ্ম-দলের বন্দনা।

নয়ন যাহার পায় না নাগাল, মন দিয়ে যার বন্দনা,
আস্‌বে সে — এই আনন্দেতেই ঘুম্ হারা,
কোন্ ফুলে তা'র গলার মালা, কোন্ ফুলে বা অর্চ্চনা —
কল্পনাতেই শিলার বুকে বয় ধারা।

আস্‌বে যে কে, জানি নে তা, আস্‌বে শুধু এই জানি,
আসার আশার আনন্দে ঘর মত্ত আজ,
প্রতীক্ষাতে কাট্‌বে রাতি, চোখের দিঠী সন্ধানী
থাকুক্ জেগে ঝরা পাতার নৃত্য-মাঝ।

নাই যদি কেউ আসে গো হায়, দুঃখ তা'তে মান্‌বো না,
আজ রজনীর আনন্দ মোর চিরন্তন,
আমার মনে গভীর স্বনে বাজ্‌লো যে তা'র বন্দনা,
চরণে তা'র নীরবে হোক্ সমর্পণ।

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

### আলো ও আঁধার

জ্যোছ্না-পুলক ফাল্গুণে যবে বিশ্বে ছড়ায়ে পড়ে,
নিবিড়-বেদনা স্তবক খুলিয়া হৃদয়ে গুমরি' মরে,
ব্যথা-দেবতার অপরূপ ছবি পলকে জাগিয়া মনে
করুণা-সজল কামনারে সব ডোবায় বিস্মরণে।
দূর-বনানীর আঁধার নিলয় বেদনে উঠিছে কাঁপি',
অন্তরে আজি জাগিয়াছ, সখি! বিরহে রজনী যাপি'।

মধু-বসন্তে মৃদু-ব্যথায় তোমার চিত্র স্মরি'
অন্তর হ'তে গুঞ্জরি' উঠে, প্রিয়তমা আজি মরি।
রুদ্র বহ্নি বাসনার জ্বালা নিথর চিত্তে জুটে;
হৃদয় দেউটি দারুণ পীড়নে মৃদু কঙ্কনে টুটে।
বিরহ-করুণা ক্ষণিক কাঁদিয়া উল্লসি উঠে ক্রোধে—
সব কল্যাণ নিমিষে টুটিয়া, কণ্ঠে হতাশা রোধে।
দুর্দম-ব্যথা বিরহে, প্রণয়ে, মিলনে সহিতে নারি,
দৃষ্টিতে রাতে কাঁপিছে আঁধারে তরু-বীথিকার সারি।

শ্রীরামেশ্বর বাগ্‌চী

## মুকুরে

বিশ্বের অরণ্য হ'তে দূরে বহুদূরে
আর এক জগত মোর গুপ্ত আছে আমার মুকুরে।
এ বিশ্বের দিবারাত্রি আলো আর আঁধার গভীর,
মরুভূর মরীচিকা, বরষার ক্লান্ত অশ্রু-নীর
লুপ্ত সেথা সবি—
সেথা শুধু নিরাশাতে শূন্য বিশ্ব-মাঝে
আমি আর মুকুরেতে মোর প্রতিচ্ছবি।

জগতের কোলাহলে নিত্য-নব সংঘাতে আঘাতে
অশ্রু যবে ভরে' ওঠে মোর আঁখিপাতে,
চেয়ে দেখি, মুকুরেতে বন্ধু ওই প্রতিচ্ছবি মোর
তেমনি সজল, ম্লান, ক্লান্ত, কালো আঁখি দু'টি ওর
আমার নয়নে তুলে' চেয়ে আছে মৌন ব্যথা ভরে
আমার বেদনা যেন আপনে বেদনা দিয়া মুছিবার তরে।
যবে শুষ্ক হাস্য দিয়া বক্ষ ভরা দারিদ্র্যেরে করি পরিহাস,
ওষ্ঠে ওর শুষ্ক মৃদু হাস
নীরবে জানায় যেন —হায়, বন্ধু ওই হাসি-তলে
কত দৈন্য, কত দুঃখ লুকায়েছ কত মত ছলে —
সব আমি জানি, প্রিয়, জানি আমি সবি,
নিভৃতে আমরা দোঁহে করি নিত্য মৌন আলাপন,
আমি আর মুকুরেতে মোর প্রতিচ্ছবি।
ঊষার অস্ফুট আলো, তারকার পুলক-কম্পন,
সন্ধ্যার মদিরা যবে ভরে' তোলে আমার নয়ন,
আঁখি ভরা প্রেম নিয়ে আমি যবে চাহি
দেখি সে-ও চেয়ে আছে, নয়নে পলক-পাত নাহি।
তা'র আঁখি মাঝে নাই কোনো হেলা, কোনো প্রত্যাখ্যান,



নাহি সেথা শুষ্কতার তীব্র-তীক্ষ্ণ-তিক্ত অপমান,
তা'র সনে নাহি মোর অভিমান; নাহি লজ্জাভয়,
শুধু মোর অন্তরের গোপন প্রণয়
ছবি-সনে রহিয়াছে বাঁধা,
ওর সনে নিরালায় অন্তরের হাসা আর কাঁদা
নিত্য বিনিময় করি কল্পনায় — আমি মুগ্ধ কবি,
এই মূক ছায়াখানি ভাষাহীন প্রিয়-সখা মোর
ওই মোর মুকুরের ছবি।

আমার সকল অঙ্গ ছাপি' ঝরে ঊষালোক সম
প্রাণ-পাত্র পরিপূর্ণ প্রেমের মোহন রূপ মম,
সে আমার অন্তরের প্রেম পাত্র হ'তে
অর্দ্ধ করিয়াছি দান নির্জীবের নয়ন-আলোতে;
ওর প্রাণ-হীন দেহে আমি করিয়াছি মোর অর্দ্ধ-প্রাণ দান,
ওর চোখে ফুটিয়াছে আমার রূপের জয়-গান,
অবিচ্ছেদ্য একখানি পরিপূর্ণ প্রাণ ল'য়ে মোর দোঁহে প্রণয়-গরবী
আমি আর মোর প্রতিচ্ছবি।

শ্রীঅজিতকুমার দত্ত

## আলোচনা

আজকাল বাঙ্‌লা দেশের সাময়িক পত্রগুলিতে যত ছোট গল্প প্রকাশিত হয়, তাহার অধিকাংশই কস্মিন্‌কালেও না লেখা হইলে বঙ্গ-সাহিত্যের খুব মস্ত বড় একটা ক্ষতি তো হইতই না, বরং অনেকখানি জঞ্জালের বোঝা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বীণাপাণি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতেন, এ-কথা অনেকের মুখেই শোনা যাইতেছে। এ-কথা অবশ্য ঠিক যে বর্ত্তমান সময়ে প্রথম শ্রেণীর গল্প-লেখক এ-দেশে নাই; তরুণদের মধ্যে প্রভূত ক্ষমতাশালী হয়-তো দু'-একজন আছেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রতিভা এখনও স্ফুটনের অপেক্ষা রাখে। অথচ পাঠক-সমাজের গল্প-পাঠ-লালসা এতই তীব্র যে, তাহা চরিতার্থ করিবার জন্য সম্পাদকদের নিয়মিতরূপে গল্প-সর্‌বরাহ করিতেই হয়, এবং একই কারণে 'বসুমতী'র মত পত্রিকাও সহস্রাধিক কাটিয়া যায়। যথার্থ পঠনযোগ্য গল্পের অভাবে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট রচনাই পাঠকদের হাতে দিতে সম্পাদকরা বাধ্য হন্, আবার ক্রমাগত নিকৃষ্ট বস্তু-সেবনের ফলে পাঠকদের রুচিও এমন বিকৃত হইয়া যাইতেছে যে ভালো জিনিষের মর্ম্ম-গ্রহণ করিবার ক্ষমতা তাহারা হারাইতে বসিয়াছে।

* * *

শ্রুতিকটু হইলেও এই কথাগুলি সত্য। এই সব কথা স্বীকার করিতে বেদনাবোধ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু লজ্জার কোনো কারণ নাই। বরং আমরা যদি মনে করিয়া বসি যে আমাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র জন্মাইয়াছেন বলিয়াই আমাদের সাহিত্য জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মধ্যে

অন্যতম, তাহা হইলেই নিজেরাও লজ্জিত হইব, অপরকেও লজ্জা দিব। আমাদের দেশে গল্প-সাহিত্যের দৈন্যের হেতু কি, তাহাই ভাবিয়া দেখা দরকার। যাঁহারা নবীন লেখকদের তিরস্কার ও উপহাস করিয়াই মনে করিতেছেন, সাহিত্যের একটা খুব বড় সেবা করা গেল, তাঁহাদেরও বিবেচনা করা উচিত যে তরুণদের অসংখ্য দোষত্রুটির জন্য কি তাঁহারা একাই দায়ী, না এমন-কোনো কারণও আছে, যাহা প্রতিমুহূর্তে তাহাদিগের অশুভ-সাধন করিতেছে অথচ যাহা দূর করা তাহাদের সাধ্যাতীত।

* * *

বাংলা দেশ ছোট গল্পের দেশ নয়, উহা কবিতার দেশ। বাঙালীর ভাব-প্রবণতা এত দূর পরিণতি লাভ করিয়াছে যে, তাহার সাহিত্য ভাবাবেগ (emotion)-এরই উৎকৃষ্ট প্রকাশ দেখা যায়-এই জন্যই বৈষ্ণব কবিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া এ-দেশে এত উচ্চশ্রেণী কবি এত উচ্চশ্রেণীর গীতি-কাব্য লিখিয়াছেন, এবং এখনও লিখিতেছেন। কিন্তু কেবলমাত্র হৃদয়ের অনুভূতি সম্বল করিয়া ছোটগল্প সৃষ্টি করা যায় না, তাহাতে দরকার ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া মানব-চিত্তের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ। কবিতায় যখন পড়ি

> "এমন দিনে তা'রে বলা যায়
> এমন ঘনঘোর বরিষায়,"

তখন শোনায় ভালো, কিন্তু ঐ কথা গদ্যে লিখিলেই তাহা গল্প হইত না, যেমন রবীন্দ্রনাথের "লিপিকা"র অন্তর্গত ,একটি রচনাও গল্প-পদ-বাচ্য হয় নাই। ঘটনা না হইলে গল্প হয় না, অথচ অধিকাংশ বাঙ্‌লা গল্পই ঘটনা-হীন সুসজ্জিত ফেণপুঞ্জ। বাঙালী কিছুতেই তাহার ভাব-প্রবণতাকে বাদ দিতে পারে না—উহা তাহার মজ্জায় মজ্জায় বসিয়া গেছে। ঐ জন্যই মনে হয়, বাঙলাদেশ ছোট গল্পের দেশ নহে—এখানে কোনোদিন মোপাসাঁ কি চেখব্ জন্মাইবে না। কেহ যেন মনে করিয়া না বসেন যে ছোটগল্পে ভাব বা emotion-এর কোনো স্থান নাই, একথা আমি বলিতে চাহিতেছি। হৃদয়াবেগ নিশ্চয়ই থাকিবে, তবে তাহা যেন লেখকের নিজের আবেগ না হয়। প্রথম শ্রেণীর কথাশিল্পী সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তাঁহার পারিপার্শ্বিক জগৎকে দেখিবেন, তাঁহার ব্যক্তিগত স্নেহ বা করুণা, রাগ বা বিদ্বেষ কিছুই যেন তাঁহার দৃষ্টিকে অনুরঞ্জিত করিতে না পারে। তাহা হইলেই যে-সব চরিত্র তিনি সৃষ্টি করিতে যাইতেছেন, তাহাদের হৃদয়ের ভাবগুলি তাঁহার চোখে স্পষ্টতর হইয়া ধরা পড়িবে। শ' একজায়গায় বলিয়াছেন যে তাঁহার মনের দৃষ্টিশক্তি normal অর্থাৎ জগৎটা ঠিক যেমনটি, তিনি তেমনটিই দেখিতে পান্ যাহা শতকরা ৯৯ জন লোক পারে না। বাঙলার লেখকদেরও এই normal eyesight এর একান্ত অভাব। হৃদয়াবেগের উচ্ছ্বাসে facts ঢাকা পড়িয়া যায়, অথচ facts — অর্থাৎ ঘটনাবিহীন ছোটগল্প অনেকটা হ্যামলেট্ বিহীন হ্যামলেট্ নাটকাভিনয়ের মতই।

বাঙ্‌লা ছোটগল্পের আরম্ভ রবীন্দ্রনাথকে দিয়াই বলা যাইতে পারে। তাঁহার প্রচুর তথাকথিত ছোটগল্পের মধ্যে বড় গল্প বা novelette-এর সংখ্যা অনেক হইলেও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ছোটগল্পও তাঁহার সাহিত্যে আমরা পাই। এখানে বলিয়া রাখা দরকার যে, শুধু তাহাকেই ছোটগল্প বলা যাইতে পারে যাহা 'ছোটও বটে এবং গল্পও বটে'। একটি ঘটনার বিবর্ত্তনে একটি চরিত্রকে



ফুটাইয়া তোলা এবং তদ্বারা পাঠকের মনে একটিমাত্র impression করাই ছোটগল্পের উদ্দেশ্য। সম্পূর্ণ জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনা একটিমাত্র ঘটনার আলোতে ব্যক্তিবিশেষের চরিত্র যতটুকু ফুটিল, তাহার বেশি দেখাইবার প্রয়োজন নাই। যথার্থ ছোট গল্প রচনায় ফরাসী কথা-শিল্পীগণ অদ্বিতীয়, দৃষ্টান্তস্বরূপ মোপাসাঁর "The Umbrella", "The Necklace" ইত্যাদি গল্পের নাম করা যায়। রবীন্দ্রনাথের "কাবুলীওয়ালা", "কঙ্কাল", "ক্ষুধিত পাষাণ" ইত্যাদি গল্পও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছোটগল্প বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ছোটগল্প-লেখক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের পরেই চারুবাবুর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার নামে না থাকিলেই তাঁহার রচনায় শ্রী আছে। তাঁহার "বন্ধু", "দেয়ালের আড়াল", "বায়ু বহে পূরবৈয়া" প্রভৃতি গল্প প্রথম শ্রেণীর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শরৎ বাবুকে ছোট গল্প লেখকরূপে কোনো আসন দেয়া যায় কিনা সন্দেহ, কারণ তাঁহার "রামের সুমতি", "বিন্দুর ছেলে" প্রভৃতি রচনা উৎকৃষ্ট ছোট গল্প নহে, উৎকৃষ্ট-উপন্যাস। উল্লিখিত উপাখ্যানদুইটি হইতে বাছিয়া নিয়া যে-কোনো একটি episode লইয়া চমৎকার ছোট গল্প লেখা চলিত। 'দৃষ্টি' ইত্যাদি গল্প সম্বন্ধে সেই একই কথা বলা চলে। প্রভাত বাবু সব স্কুল পাঠ্য ছোট গল্প লিখিয়াছেন, কিন্তু কালের নিকষ-মণিতে সে গুলি কত দিন পর্যন্ত টিকিয়া থাকিবে তাহা অনুমান করিয়া বলা দুঃসাধ্য। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় কথা সাহিত্যে যাহা দান করিয়াছেন তাহা অল্প; কিন্তু তাঁহার "আহুতি" ও "চার-ইয়ারী" কথা'র প্রত্যেকটি গল্প সম্বন্ধে এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, "It is worth its weight in gold"

অপেক্ষাকৃত আধুনিক গল্প-লেখকদের মধ্যে সর্বাগ্রে মনে পড়ে শ্রীমণীন্দ্রলাল বসুর নাম। বছর কয়েক পূর্বে তাঁহার ছোটগল্প বঙ্গদেশের মাসিক পত্রিকাগুলির একটি অবশ্যম্ভাবী অঙ্গসৌষ্ঠব ছিল। তাঁহার রচনায় বর্ণনার উচ্ছ্বাস ছিল, ভাষার কারুকার্য্য ছিল, কিন্তু ছিল না ঘটনা, ছিল না গতি। তাঁহার অধিকাংশ গল্পেই বিদেশী গল্প এত প্রবল ছিল যে যথার্থই মনে হইত যে, কাগজ কাটিয়া এই ফুল তৈরী করা হইয়াছে, তা-ও আবার বিলাতী কাগজ। লেখার ভঙ্গীতে তিনি হয়-তো টুর্গেনিভ্ পন্থী হইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু টুর্গেনিভের মধ্যে যে সাবলীল গতিছন্দ, যে সহজ, স্বাভাবিক মাধুর্য্য পাই, তাহা তাঁহার মধ্যে পাই না, তাঁহার রচিত মধ্-চক্র মাঝে-মাঝে কৃত্রিম ঠেকে। অল্প বিষয় নিয়া বিরাট বাক্ বিস্তার করা তাঁহার প্রধান দুর্বলতা। তিনি হয়তো বলিতে চান :"অমুক একটি মেয়েকে ভালোবাসিত, কিন্তু সে তাহাকে পাইল না।' এই ব্যাপার নিয়া তিনি এমন এক সপ্তকাণ্ড রামায়ণ সৃষ্টি করিয়া বসিবেন, যাহা পড়িতে-পড়িতে যথার্থই bored হইতে হয়। তবু এ কথা স্বীকার করিতেই হয় যে, তাঁহার মধ্যে কিছু ক্ষমতা ছিল; তাঁহার 'জন্মজন্মান্তর', 'নিশীথের কথা' প্রভৃতি যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারাই এ-কথা স্বীকার না করিয়া পারিবেন না। বর্ত্তমান সময়ে তিনি গল্প-রচনা ছাড়িয়া দিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়; ইহা যে বঙ্গ-সাহিত্যের পক্ষে মোটেই সুখের বিষয় নহে, এ-কথা ঠিক। গোকুলচন্দ্র নাগের অকাল-মৃত্যুতে সাহিত্যের কতখানি ক্ষতি হইয়াছে তাহা অনুমানে নিরূপণ করা যায় না। তবে "মাধুরী"র মধ্যে তিনি যে উজ্জ্বল প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা সুযোগ পাইলে আরো সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারিত, ইহা খুবই স্বাভাবিক মনে হয়। শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই গল্প-সাহিত্যে তাঁহার নিজস্ব একটি আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছেন, এ-কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কয়লার খনির কুলিদের জীবন নিয়া sketch লিখিয়াই তিনি প্রথম সাহিত্য-ক্ষেত্রে পরিচিত হন্, কিন্তু তাঁহার "অতসী" পুস্তকের অন্তর্গত গল্পগুলিই

তাঁহার প্রতিভার যথার্থ সাক্ষ্য দিতেছে ও দিবে। যুবনাশ্ব নিম্নতম শ্রেণীর লোকদের জীবন নিয়া গল্প লিখিয়া খ্যাতি এবং অখ্যাতি দুই-ই যথেষ্ট অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহার রচনাভঙ্গী জোরালো-এবং যে-বিষয় নিয়া তিনি লিখিয়া থাকেন, সে-বিষয়ে তাঁহার প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে। সেই জন্যই তাঁহার গল্পগুলি কৃত্রিম অথবা ধার-করা মনে হয় না। তবে তাঁহার অধিকাংশ রচনাই একটু sketchy ধরণের, ঠিক ছোট গল্প বলা যাইতে পারে, এমন লেখা তাঁহার অল্পই আছে। তবু এ-ক্ষেত্রে pioneer রূপে তাঁহার নাম বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে থাকিয়া যাইবে। শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র এ-পর্য্যন্ত অল্প কয়েকটি গল্পই লিখিয়াছেন, কিন্তু সেই কয়টি দিয়া বিচার করিলেও নব-যুগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী লেখক বলিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে আমাদের সঙ্কোচবোধ হয় না। তাঁহার "শুধু কেরাণী", "গোপন-চারিণী", "চিত্রা" "সংক্রান্তি", "বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী মোর ভগবান্ কাঁদে"—প্রত্যেকটিই অনুপম সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি। প্রেমেন্দ্র মিত্র তরুণ, তাঁহার নিকট হইতে আরো অনেক-কিছু আশা করিবার অধিকার আমাদের আছে। শ্রীযুক্ত অচিন্ত্য সেনগুপ্তের গল্প-রচনায় বড় মিঠা হাত; — তাঁহার "ওমোট" ও "চোখের চাতক"-এই তিনি এ-কথা প্রমাণ করিয়াছেন। ইহাঁরা সকলে মিলিয়া সাহিত্যে একটি নবযুগ আনয়ন করিতে চাহিতেছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁহাদের সমান বা তাঁহাদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প ক্ষমতাশালী লেখকের সংখ্যা এত কম যে এই নবযুগের কোনো একটা বিশিষ্ট মূর্ত্তি এখনও আমরা দেখিতে পাইতেছি না।

* * *

বাঙলা গল্প-সাহিত্যের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া গেল, তাহাতেই ইহার দৈন্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিতে হয়। ইহাদের উৎস যেন অতি অল্প সময়েই শুকাইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত যশস্বী বাঙালী কবির সংখ্যা ইহা অপেক্ষা অনেক বেশি। ইহাতেই বুঝা যায় যে, ছোট গল্প জিনিষটি বাঙলার মাটিতে ভালো ফলে না।

আমাদের দেশের লেখকদের অধিকাংশ গল্পই যে চলনসইও হয় না, তাহার প্রধান কারণই এই যে, তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা খুবই পরিমিত। জীবনটা বিচিত্র বিরাট ও সকলদিকে সমভাবে প্রস্ফুটিত না হইলে গল্পও যে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ও নীরস হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্যের কথা কি? আমাদের জীবন যেমন বৈচিত্রহীন ও একঘেঁয়ে, গল্পও তেম্‌নি। আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজ বিশেষ করিয়া সমাজ আমাদিগকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াইয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে, জীবনটাকে সব দিক দিয়া পঙ্গু করিয়া দিতেছে, কোনো দিক দিয়া মানুষ একটু ফুটিয়া উঠিবার অবকাশ পায় না। সহস্র নিষেধের বিড়ম্বনা যাহাদিগকে প্রতিমুহূর্তে লজ্জিত করিতেছে, অনুশাসনের অত্যাচারে যেখানে একটু হাত-পা মেলিয়া চলাফেরা করা যায় না, চারিদিক হইতে পর্দ্দা যেখানে চোখের দৃষ্টিকে অবরোধ করে, সেই দেশে, সেই জাতির মধ্যে একটা বিরাট প্রাণবন্ত গল্প-সাহিত্য সৃষ্টি কল্পনা চিরকাল কল্পনাই রহিয়া যাইবে বলিয়া আমাদের ভয় হয়। যাঁহারা বাঙলা গল্পের একঘেঁয়েমি দেখিয়া নাক সিটকান তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে যে দেশে কোনো পুরুষকে একটা প্রণয়ের ব্যাপারে বিজড়িত করিতে হইলে বন্ধুর বোন, বোনের বন্ধু, ব্রাহ্ম সমাজ বা চিৎপুর রোডের শরণাপন্ন হইতে হয়, (এতদ্ভিন্ন অন্য সবই অসম্ভব বা অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে) সে দেশের গল্প-সাহিত্যে কতটা বৈচিত্র্যই বা আশা করা যাইতে



পারে? এ সূত্রে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার "চার-ইয়ারী কথা"র প্রতিটি গল্পই যে বিলাতী atmosphereএ সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহা অনেকটা বাধ্য হইয়াই করিয়াছেন কারণ বাঙলা দেশে বাঙালী সমাজের মধ্যে ঐ ধরণের ঘটনা কখনও ঘটিতে পারে না বলিয়াই তাঁহাকে বিলাতী সমাজের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে। অথচ, প্রত্যেকটি গল্পের মধ্যেই যে একটি চমকপ্রদ বৈচিত্র্য আছে, তাহা না বলিলেও চলে। ইহাতেই বুঝা যায় যে সমাজের নাগপাশ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিলে আমাদের সাহিত্য নব-নব অস্বাদিত রূপে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

অনেকে বলিবেন যে, যাহা আছে, তাহার ভিতর হইতেও অনেক মাল মশলা বাহির করা যায়, ক্ষমতা থাকিলে পুরাতন জিনিষকেই নূতনরূপ দেয়া যায় ইত্যাদি। একথা সহস্রবার মানি; শরৎবাবুই "রামের সুমতি" ইত্যাদি গল্পে ইহার জ্বলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় শরৎ বাবুর মত বিরাট্ প্রতিভা সকল দেশেই দুর্লভ, সকল দেশেই এমন এক শ্রেণীর লেখক থাকেন, যাঁহারা সুযোগ পাইলে বেশ ভালো গল্প লিখিতে পারেন, অথচ সুযোগের অভাবে একেবারে নষ্ট হইয়া যান। বাঙলা দেশের সেই শ্রেণীর লেখক একেবারে নষ্ট হইতে বসিয়াছে, এবং সেজন্য সমাজের এই অমানুষিক বন্ধনই দায়ী, এই কথাটাই আজ আমাদের বিশেষ করিয়া বুঝা দর্‌কার। ইয়োরোপের অনেক দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর লেখকও এমন সব গল্প লিখিয়া থাকেন, যাহা পড়িয়া প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। ইহার কারণ এই যে তাঁহারা জীবনের অনেক কিছুই জানিবার দেখিবার এবং বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছেন এবং সেই সকল অভিজ্ঞতার উৎস হইতেই তাঁহারা নব নব রস আহরণ করিতে সক্ষম হন্। আমাদের দেশের ঠিক সমান ক্ষমতাশালী লেখকরা কিছুই লিখিতে পারেন না, কারণ তাঁহার পারিপার্শ্বিক জীবনে নূতন কিছুই ঘটে না যাহা তিনি দেখেন্, তাহা বহুপূর্ব্বেই পূর্ব্বতন শিল্পীদের দ্বারা নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। তা-ছাড়া ইহাও জিজ্ঞাসা করি, শরৎবাবুর মধ্যেই কি পুনরাবৃত্তি দোষ নাই? তাঁহার "বিন্দুর ছেলে", "রামের সুমতি", "বড় দিদি" ও "মেজদিদি" কি প্রকৃতপক্ষে একই গল্প নহে? এই বিভিন্ন চারিটি গল্প না লিখিয়া একটি কি বড় জোর দুইটি লিখিলেই কি চলিত না? আমাদের সমাজ বৃহৎ ও বিস্তীর্ণ হইলে বিভিন্ন ধরণে চারিটি উৎকৃষ্ট গল্প কি লেখা যাইত না? সামাজিক বন্ধনের অত্যাচার দেশের সাহিত্যের যে কত বড় সর্বনাশ করিতেছে, তাহা এতদিনে বুঝিবার সময় হইয়াছে। হতভাগ্য গল্প লেখকদের তৃপ্তচিত্তে গালি-গালাজ না করিয়া এই সব বাধা বন্ধ অস্বীকার করিয়া জাতির জীবনটাকে স্বচ্ছন্দ ও প্রতিবান্ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষীদের পক্ষে অধিক সুশোভন হয়। এই পঙ্কিল কূপ-মণ্ডুকতা বর্জন করিয়া যতদিন পর্য্যন্ত আমরা জীবন সমুদ্রের সমগ্র বিরাট্ স্রোতধারা তাহার উদারতা ও গভীরতার সহিত গ্রহণ করিতে না পারিব ততদিন দেশের সাহিত্যের পূর্ণ-বিকাশ হওয়া অসম্ভব।

গল্প-সাহিত্যের কথা আলোচনা করিতে করিতে একজনের কথা মনে পড়িয়া গেল, যাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ঠুর নিয়তি অনেক অনাগত সম্পদই হয়-তো বঙ্গ-সাহিত্যের ভান্ডার হইতে অপহরণ করিয়া লইয়া গেল। নীলিমা বসুর অকাল মৃত্যুসংবাদ আমাদের ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে; তরুণ বাঙলার লেখিকাদের মধ্যে তাঁহার রচনাতেই একটু বৈশিষ্ট্যের আভাষ পাইয়া আমরা তাঁহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বীত হইয়া উঠিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার সাহিত্য-প্রচেষ্টার

আয়ু যে এত পরিমিত, তাহা তখন ভাবিতেও পারি নাই। তাঁহার রচনার সংখ্যা খুবই অল্প, কিন্তু সেই ক'টিতেই তিনি এমন একটি সৌন্দর্য্য জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন, যাহা বিবেচনা করিলে তাঁহার অভাব বঙ্গ-সাহিত্যের পক্ষে যথার্থই ক্ষতিকর বলিয়া মনে হয়।

*(এই রচনার লেখকের কোনো নাম নেই। সম্ভবত এটি সম্পাদক বুদ্ধদেবরই রচনা। প্রগতির এই সংখ্যায় লেখকদের মূল বানানগুলি অপরিবর্তিত রাখা হল। এর ফলে ভাষা ব্যবহারের বিবর্তনটা পাঠকের কাছে ধরা পড়বে। — সম্পাদক)*



# গান্ধীর 'মহাত্মা' লাভ

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে মহাত্মা গান্ধী বা নিদেন গান্ধীজি না বললে আমরা ধরেই নি, যিনি গান্ধীকে শুধুই গান্ধী বলছেন তিনি গান্ধীকে পছন্দ করেন না। কিন্তু গান্ধী কীভাবে, কখন থেকে মহাত্মা গান্ধী নামে পরিচিত হলেন, তার কোনও ইসারা আমরা গান্ধীর অসংখ্য জীবনীকারদের কাছ থেকে পাই না। আর যেটা পাই, সেটা যথেষ্ট তথ্যভিত্তিক নয়।

গান্ধীর জীবনীকারদের মধ্যে যাঁরা অগ্রগণ্য—প্যারেলাল, সুশীলা নায়ার, টেণ্ডুলকার, বি আর নন্দ— এঁরা কেউই জানান নি, গান্ধী কবে থেকে মহাত্মা গান্ধী হলেন, কে বা কারা তাঁকে মহাত্মা উপাধি দিলেন। অন্যান্যরা অনেকেই জানিয়েছেন, গান্ধীকে মহাত্মা উপাধি রবীন্দ্রনাথ দেন। কয়েকটি উদাহরণ দেখা যাক।

H.S. Polak, H. N. Brailsford এবং Lord Pethick Lawrence তিন জনে মিলে ১৯৪৯ সালে লেখেন Mahatma Gandhi। এই জীবনীটির ভূমিকা লেখেন তখনকার ইউনাইটেড প্রভিন্স-এর গভর্নর সরোজিনী নাইডু। এই জীবনীর ১৯১৫ - ৩৯ অংশটির লেখক ব্রেইলসফোর্ড ছিলেন ইংল্যান্ডের সাংবাদিক ও সম্পাদক, ভারতের স্বাধীনতার প্রবক্তা। তিনি অনেকবার ভারতে আসার এবং লন্ডনের গোল টেবিল কনফারেন্সের সূত্রে গান্ধীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তিনি লিখছেন

Soon after his arrival [গান্ধীর ভারতে আসা ১৯১৫ সালে], in a published letter, the poet Rabindranath Tagore conferred on him the title of "Mahatma" of which the literal meaning is 'great soul'. It is custom among Indians to bestow such distinctions on leaders whom they love and admire, and this title was promptly adopted.

এই চিঠি কোন্ চিঠি? রবীন্দ্রনাথ চিঠিটি কাকে লিখেছিলেন? সেই চিঠির কথা সাধারণ লোক জানল কী করে? সাধারণ লোক জানতে পারে এমন চিঠি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন এবং সেই চিঠিতেই প্রথম গান্ধীকে মহাত্মা গান্ধী বলে উল্লেখ করেছিলেন সেটা দি ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ পত্রিকায়, ছাপা হয়েছিল ১৬ এপ্রিল ১৯১৯। কিন্তু ব্রেইলসফোর্ড বলছেন ১৯১৫ সালের কথা। গান্ধীকে মহাত্মা গান্ধী বলে প্রথম উল্লেখ করেন রবীন্দ্রনাথ সি. এফ অ্যান্ডরুজকে লেখা একটি চিঠিতে, সেটা লেখা ১৮ ফ্রেব্রুয়ারি ১৯১৫ সালে। তখনও গান্ধী ভারতে, কিন্তু সেই চিঠি সাধারণের জানার কথা নয়।

অ্যান্ডরুজ রবীন্দ্রনাথকে লেখা এক চিঠিতে গান্ধীর উল্লেখ করেছিলেন মহাত্মা বলে। সেটা অনেক আগে ১৯১৪ সালের জানুয়ারি মাসে। ইংল্যান্ডে অসুস্থ গোপালকৃষ্ণ গোখলে অনুরোধ করেছিলেন, অ্যান্ডরুজ যেন দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে গান্ধীকে আবার নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের আন্দোলন শুরু করা থেকে বিরত করেন। অ্যাণ্ডরুজ দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছন ২ জানুয়ারি। ৬ জানুয়ারি সেখান থেকে রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লেখেন যাতে তিনি গান্ধীকে মহাত্মা গান্ধী বলে উল্লেখ করেন। এর পর, গান্ধীর সঙ্গে জেনারেল স্মুটসের চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে, অ্যান্ডরুজ লন্ডনে চলে যান অসুস্থ মায়ের পরিচর্যার জন্য। তাঁর মায়ের মৃত্যু হলে ফেব্রুয়ারি মাসে রবীন্দ্রনাথ অ্যান্ডরুজকে যে চিঠি লেখেন তাতেও রবীন্দ্রনাথ গান্ধীকে মহাত্মা

গান্ধী বলে উল্লেখ করেন নি। করলেন যখন, এক বছর পর, গান্ধী বোলপুরে তাঁর ফিজিক্সের আশ্রমিকদের সঙ্গে থাকছেন, রবীন্দ্রনাথ তখন কলকাতায়। তিনি অ্যান্ড্রুজকে লিখলেন (১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯১৫) মহাত্মা গান্ধী নিশ্চয়ই বোলপুরে পৌঁছে গেছেন। তখনও, শান্তিনিকেতনের আশ্রম পত্রিকায়, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় গান্ধীকে মি: গান্ধী বলে উল্লেখ করা হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ গান্ধীকে চিঠি লিখছেন মি: গান্ধী বলে, ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫ তারিখে। গান্ধী রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে শান্তিনিকেতনে ছিলেন ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি, আবার ৫ মার্চ থেকে ১৩ মার্চ। প্রসঙ্গত বলা দরকার, গান্ধীর শান্তিনিকেতনে থাকার তারিখগুলো রবীন্দ্রজীবনীকারদের দেওয়া তারিখের সঙ্গে গান্ধীজীবনীকারদের তারিখের দুয়েক দিনের এদিক ওদিক আছে, তবে বর্তমান প্রশ্নে সেগুলো জরুরি নয়। গান্ধীর শান্তিনিকেতন-বাস নিয়ে রবীন্দ্রনাথ রথীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখছেন, সেখানেও তিনি শুধুই গান্ধী।

সুতরাং ব্রেইলসফোর্ডের দেওয়া খবরের হদিস পাওয়া গেল না। তিনি বলেনও নি, কোথায় চিঠিটি ছাপা হয়েছিল, কেনই বা ছাপা হবে। অনুমান করা যেতে পারে, তিনি ১৯১৯-এর চিঠিটিই ১৯১৫-এর চিঠি ভাবছেন।

গান্ধীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে ভারত সরকার তার প্রকাশন দফ্তর থেকে একটি গান্ধী জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করে ১৯৬৮ সালে। লেখক একজন মার্কিনী Vincent Sheean : Mahatma Gandhi — A Great Life in Brief। তিনি গান্ধী ও ভারতবর্ষকে ভালোই চিনতেন। তিনি লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ গান্ধীকে এক টেলিগ্রাম করেন ১৯১৬ সালে যাতে তিনি তাঁকে মহাত্মা গান্ধী বলে উল্লেখ করেন। টেলিগ্রামটি রক্ষিত আছে, তবে কোথায় বলেন নি। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ গান্ধীকে মহাত্মা উপাধি দেন, এই তথ্যে তিনি বিশ্বাস করেন না — তবে সেই প্রসঙ্গে আমরা পরে আসব।

গান্ধীর জীবনীকারদের মধ্যে লুই ফিশার বিখ্যাত। তিনি তাঁর The Life of Mahatma Gandhi (১৯৫১) লিখেছেন, It was Tagore, apparently, who conferred on Gandhi the title of Mahatma ; 'The Great Soul in beggar's garb' Tagore said. দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীকে মহাত্মা উপাধি দিয়েছেন, বলছেন লুই ফিশার, কিন্তু নি:সন্দেহে নয়।

তত বিখ্যাত নয়, তবে বৃহদাকার 'The Life and Death of Mahatma Gandhi (The Bodley Head, London, 1969) গ্রন্থের লেখক Robert Payne লিখছেন,

The Indians are passionately addicted to giving complimentary titles to those they revere and Tagore was already known as 'Gurudev', meaning 'Celestial Teacher'. Andrews was known as Deenbandhu, meaning 'The Friend of the Poor'. Gandhi was not yet 'Mahatma', though the title would soon be given to him by Tagore.

শান্তিনিকেতনে গান্ধীর প্রথম আসা উপলক্ষ্যে কথাগুলো বলা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীকে যিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে চিনতেন, উভয়েরই জীবনী যিনি লিখেছেন, সেই কৃষ্ণ কৃপালনী জানিয়েছেন Rabindranth Tagore: A Biography (১৯৬২) -তে, রবীন্দ্রনাথ গান্ধীকে মহাত্মা বলেন প্রথম ১২ এপ্রিল ১৯১৯-এ যখন গান্ধীকে গ্রেপ্তার করা হয়। চিঠিটি বেরিয়েছিল দি ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজে ১৬ এপ্রিল ১৯১৯-এ। আর তাঁর Gandhi : A Life



(১৯৬৮) গ্রন্থে লেখেন : Tagore was the first notable contemporary to refer to Gandhi as Mahatma which appellation stuck to him since.

এখন প্রশ্ন হলো, রবীন্দ্রনাথ কি নিজে গান্ধীকে মহাত্মা উপাধি দিয়েছিলেন, না, অন্যের দেওয়া উপাধি 'মহাত্মা' গান্ধী প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন। প্রশ্নটা জাগে Leonard Elmhirst - এর স্মৃতিচারণ থেকে। এলমহার্স্ট তাঁর Poet and Plowman (১৯৭৫) গ্রন্থে, যার মুখবন্ধ লিখেছিলেন কৃপালনীই, স্মরণ করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে একটি দিনের কথা বলেছিলেন। যেদিন, ১৯২১ সালে, গান্ধী রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিলেন জোড়াসাঁকোতে অসহযোগের মর্ম বোঝাতে। রবীন্দ্রনাথ মর্ম বোঝেন নি। রবীন্দ্রনাথ সেই তর্কের সময় গান্ধীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, And, Gandhiji, why do you allow your followers to call you Mahatma? Are you a Mahatma? গান্ধী উত্তর দিয়েছিলেন, না, তিনি মহাত্মা নন। তবে লোকে বললে তিনি আপত্তি করেন না, কেননা ভারতীয়রা প্রতীককে প্রতিমা পূজা করতে অভ্যস্ত। তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে যদি মহাত্মা ডাকে সাড়া তিনি দেন তাহলে অন্যায় কিছু হবে না।

রবীন্দ্রনাথ যদি নিজেই মহাত্মা নামে গান্ধীকে ভূষিত করতেন তাহলে এই প্রশ্ন তুলতেন বলে মনে হয় না। রোমাঁ রলাঁ মহাত্মা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ তুলেছিলেন, কিন্তু বলেছিলেন, তাঁর ১৯২৩ সালে 'মহাত্মা গান্ধী' নামে লেখা দীর্ঘ প্রবন্ধে (যেটা পরে বই হিসাবে গণ্য হয়), ভারতীয় জনগণ গান্ধীকে মহাত্মা উপাধি দান করে।

গান্ধী নিজেও বলেছিলেন, ১৯ মার্চ ১৯৩১-এর Young India তে, I have no relish for the title of the Mahatma given me by the people, if only because I am unworthy of it.

এই জনগণ কারা? কবেই বা তারা গান্ধীকে মহাত্মা উপাধি দিয়েছিল?

'মহাত্মা' উপাধির উৎপত্তি সম্পর্কে D. G. Tendulkar তাঁর আট খণ্ডের Mahatma গ্রন্থে কোনও মন্তব্য না করলেও একটি মানপত্রের ছবি দিয়েছেন গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডে। ছবিটির পরিচয় দেওয়া হয়েছে: Reception address at Jetpur, Kathiawad to Mahatma Mohandas Karmchand Gandhi, January 21, 1915. গুজরাটি মানপত্রের শীর্ষনাম : 'শ্রীমান্ মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী'। উল্লেখ করা যেতে পারে, দক্ষিণ আফ্রিকা চিরকালের জন্য ছেড়ে এসে গান্ধী তখন ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরছেন।

এটাই কি তাহলে গান্ধীকে প্রকাশ্যে মহাত্মা বলে সম্বোধন করা? তা নয়। ভারত সরকারের প্রকাশন বিভাগ ১৯৭১ সালে প্রকাশ করে Mahatma Gandhi - A chronology। এটা সংকলন করেন মহাত্মা গান্ধীর রচনাবলী প্রকাশের দফতরের কে পি গোস্বামী। তাঁর দিনপঞ্জীতে দেখা যাচ্ছে:

1914, July 9 : Was presented with addresses at farewell meeting in Town Hall, Durban. The meeting addressed Gandhi as ' Deshbhakta Mahatma'.

1914, July 12 : Addressed a farewell meeting which called him 'Mahatma' at Verulam; left for Johannesburg.

এই সংবর্ধনা কারা দিয়েছিলেন? Mahatma Gandhi (প্যারেলাল এবং সুশীলা নায়ার প্রণীত নয় খণ্ডের জীবনী) গ্রন্থে সুশীলা নায়ার জানিয়েছেন ডারবানের টাউন হলে (তিনি

অবশ্য তারিখ দিয়েছেন ১১ জুলাই ১৯১৪), গান্ধীকে বিদায় সংবর্ধনা দিয়েছিল ভারতীয়রা। তাদের সঙ্গে ইয়োরোপীয়ানরাও ছিল। শহরের মেয়র W. Holmes পৌরহিত্য করেন।

১২ জুলাই সংবর্ধনার বিষয়ে টেণ্ডুলকার লিখেছেন, ১২ জুলাই সকালে গান্ধীর সম্মানে ভেরুলাম এক অবিস্মরণীয় সংবর্ধনা দেয়। প্রায় ৩০০০ চুক্তিতে আবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিক জড়ো হয় তাদের দিব্য নেতা, তাদের রাজা গান্ধীকে প্রণাম করতে। তাদের অনেকেই গান্ধীর সামনে মাটিতে শুয়ে পড়ে প্রণাম জানায়।

আপাতত যা পাওয়া যাচ্ছে, তাতে এটাই প্রথম গান্ধীকে মহাত্মা বলা। কিন্তু ৬ জানুয়ারি ১৯১৪ অ্যান্ডরুজ রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখছেন, গান্ধীকে মহাত্মা বলে উল্লেখ করে। অর্থাৎ তার আগে থেকেই দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়রা গান্ধীকে মহাত্মা বলে ডাকে।

মহাত্মা উপাধি ভারতে, বিশেষত পশ্চিম ভারত বা উত্তর ভারতে তখন বিরল নয়। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এই সময়ে মহাত্মা মুনশীরাম বলে পরিচিত ছিলেন। আগে ছিলেন মহাত্মা ফুলে। বাংলা দেশে ছিলেন মহাত্মা অশ্বিনীকুমার। এই সব তথ্য থেকে এটা অনুমান করা যায়, দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের দেওয়া মহাত্মা উপাধির সঙ্গে অ্যান্ডরুজ পরিচিত হন এবং অ্যান্ডরুজের মাধ্যমে পরিচিত হন রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা উপাধির সঙ্গে।

কৃষ্ণ কৃপালনীর দেওয়া তথ্য: রবীন্দ্রনাথ উপাধি দিন বা না দিন, তাঁর 'মহাত্মা' উল্লেখই সাধারণের মধ্যে গান্ধীকে মহাত্মা নামে পরিচিত করায়। এটাই বা কতটা তথ্যসিদ্ধ?

'মহাত্মা' উপাধি নিয়ে গান্ধীর অন্যান্য খ্যাতিমান জীবনীকাররা মাথা না ঘামালেও, Vincent Sheean খোঁজ খবর নিয়েছিলেন। তিনি জানিয়েছেন, গান্ধীর জীবনী লেখার সময় এই উপাধির উৎপত্তি নিয়ে যথেষ্ট অনুসন্ধান করেছিলেন, কিন্তু জানতে পারেন নি। তিনি সরোজিনী নাইডুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সরোজিনী গান্ধীকে প্রথম দেখেন ১৯১৪ সালে লন্ডনে। গান্ধী ভারতে আসার পথে লন্ডনে গিয়েছিলেন, থাকতেন ব্লুমসবেরিতে। এই প্রথম সাক্ষাৎকার বিখ্যাত হয়ে আছে। গান্ধীর চেহারা, জামাকাপড়, বাড়ির চেহারা দেখে সরোজিনী হি হি করে হেসেছিলেন এবং সেই হাসি শুনে গান্ধী বলেছিলেন, হাসি শুনেই বুঝতে পারছি তুমি সরোজিনী নাইডু। সরোজিনী শিয়ানকে বলেছিলেন, তিনি তখন থেকেই শুধু নয়, তার আগে থেকেও গান্ধীকে মহাত্মা নামে জানতেন। সরোজিনী অবশ্য বলতে পারেন নি, কত আগে থেকে। জওহরলাল নেহেরু গান্ধীকে প্রথম দেখেন ১৯১৬ সালে এবং শিয়াজকে জানান, তাঁর কোনও সন্দেহই নেই, তার কয়েক বছর আগে থেকেই তিনি গান্ধীর মহাত্মা উপাধির কথা শুনেছিলেন।

Young India পত্রিকায় গান্ধী বারেবারেই জানিয়েছেন, তিনি মহাত্মা উপাধি পছন্দ করেন না। কয়েকটি উদাহরণ:

আমি জানি, আমি মহাত্মা নই। আমি জানি আমি অল্পাত্মা। (সেপ্টেম্বর ৪, ১৯২৪) আমি যদিও অসহযোগী, কিন্তু যদি কোনও বিল আসে যাতে আমাকে মহাত্মা ডাকা অপরাধ বলে গণ্য হবে, অথবা আমার পা ছোঁয়াও হবে অপরাধ, তাহলে সেই বিলে আমি রাজি হব। যেখানে আমি সেই আইন নিজেই বলবৎ করতে পারি, অর্থাৎ আমার আশ্রমে, এই ডাক আর আচরণ অপরাধ বলে গণ্য। (মার্চ ১৭, ১৯২৭) ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, উচ্চ কণ্ঠে আমাকে মহাত্মা বলা হলেও আমি তাতে বিচলিত হই নি। (জানুয়ারি ১২, ১৯৩০) যতই আমি এটা অগ্রাহ্য করি, ততই এটা (মহাত্মা উপাধিটা) ব্যবহৃত হয়। (জানুয়ারি ১২, ১৯৩০)।



গান্ধীর প্রথম জীবনী বের হয় ১৯০৯ সালে দি লন্ডন ইন্ডিয়ান ক্রনিকল্-এ, পরে ১৯১৩ সালে গ্রন্থাকারে। লেখক রেভারেন্ড জোসেফ জে ডোক। ১৯০৮ সালে জোহানেসবার্গে গান্ধীকে মারধোর করার পর এই ব্যাপটিস্ট চার্চের মিশনারি গান্ধীর শুশ্রূষা করে ভালো করে তোলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি গান্ধীর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি গান্ধীকে মহাত্মা উপাধিতে ভূষিত করেন নি।

এটা সবারই জানা, রবীন্দ্রনাথ গান্ধীকে মহাত্মা বলেই সম্বোধন করতেন ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। তর্কের সময় মহাত্মার তাৎপর্য নিয়ে সংশয় প্রকাশ করলেও, গান্ধীর সবরমতী আশ্রমে যখন তিনি যান ১৯২০ সালে, তখন, রলাঁ তার গান্ধীজীবনীর মুখবন্ধে লিখেছেন, উপনিষদের এই শ্লোকটি আবৃত্তি করেছিলেন, যার ইংরেজি

He is the One Luminous, Creator of All, Mahatma,
Always in the hearts of the people enshrined,
Revealed through Love, Intuition, and Thought,
Whoever knows Him, Immortal becomes...

১৯২৩ সালে রলাঁর গান্ধীজীবনীর নামও ছিল, ইংরেজি অনুবাদে, Mahatma Gandhi— the Man who Became One with the Universal Being.

—রলাঁর গান্ধীজীবনী বের হবার পর গান্ধীজীবনীকাররা, ব্যতিক্রম সামান্যই, গান্ধীকে মহাত্মা বলেই তাঁর জীবনীর নামকরণ করেছেন। গান্ধীর সমসময়ে মহাত্মা উপাধিধারী অনেকেই থেকে থাকবেন সাধারণ লোকচক্ষুর অন্তরালে, কিন্তু গান্ধীর পর মহাত্মা বলতে পৃথিবীশুদ্ধ লোক গান্ধীকে বোঝে।

(পুনশ্চ: প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় গান্ধীর মহাত্মা উপাধি লাভ বা সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ তোলেন নি। কিন্তু প্রশান্তকুমার পাল তুলেছেন এবং বলেছেন, গান্ধীকে রবীন্দ্রনাথ প্রথম মহাত্মা বলেন, এই প্রচলিত ধারণাটা ভুল। প্রশান্তবাবুর ধারণা, দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকার সময় সেখানকার ভারতীয়রা গান্ধীকে মহাত্মা উপাধি দিয়ে থাকবেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে তাঁর একটি উদ্ধৃতি অস্বচ্ছ। Letter to a friend নামে রবীন্দ্রনাথ— অ্যান্ডরুজ যে পত্রাবলী ছাপা হয় ১৯২৮ সালে তাতে দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯১৫ সালে গান্ধীকে মহাত্মা নামে অভিহিত করছেন। ওই একই চিঠি যখন প্রশান্তবাবু উদ্ধৃত করছেন তাতে দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ মি: গান্ধী বলছেন, মহাত্মা নয়। এটা কী করে সম্ভব? প্রশান্তবাবু সব সময়ই প্রায় তথ্যের উৎস নির্দেশ করেন। কিন্তু এই চিঠির উৎস দেন নি। তাহলে কি, রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত রবীন্দ্রনাথ - অ্যান্ডরুজ পত্রাবলীতে, ওই চিঠিতে মি: গান্ধী আছে? তাহলে বিশ্বভারতী প্রকাশিত পত্রাবলীতে 'মহাত্মা' ছাপা হলো কেন? এই পত্রাবলী তো অ্যান্ডরুজ তাঁর জীবদ্দশাতেই প্রকাশ করেছিলেন। এই পাঠান্তর কি প্রশান্তবাবু লক্ষ্য করেন নি?)

# শিল্প সমালোচনায় কবি গীওম আপোলনীয়র

কমলেশ চক্রবর্তী

বলা হয় ১৯০৫ থেকে ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ফরাসি সাহিত্য- শিল্পকলায় এমন কোনো পথ পাওয়া যাবে না যেখানে গীওম আপোলনীয়রের পরকায়ার দর্শনলাভ হবে না। তাঁর প্রায় প্রতিটি কবিতাই মনে হয় যেন ভিন্ন ভিন্ন কবির রচনা। ফলে রচয়িতা হিসেবে আপোলনীয়রকে ধরা প্রায় অসম্ভব কাজ। আমরা পাঠকরা যে মুহূর্তে কবির একটা কোনো ভাবনার উপর আলো নিক্ষেপ করতে সচেষ্ট হই তৎক্ষনাৎ যেন বর্ষার আকাশের মতো নানা ভাবনার মেঘ তা আবরিত ক'রে দেয়। সুপোল্ত লিখেছেন, 'অন্যান্য কবিদের আপনাপন কবিতা রচনার প্রয়োজনে তাঁর পক্ষে একটি কবিতা লিখে ওঠা যথেষ্ট ছিল। তাঁর " আলকুলস্" কাব্যগ্রন্থই সমসাময়িক সকল কবিই আকর গ্রন্থ হিসেবে লাভ করেছিলেন।' আপোলনীয়র নিজেও লিখেছেন, ' আমি আমার কবিতা এমনভাবে বপন করেছি যেন তা অন্যান্যদের কাছে শস্যদানার বীজ হিসেবে গণ্য হয়।'

আপোলনীয়র কবিতা ভিন্ন আর সংখ্যায় অধিক যা লিখেছেন তা শিল্প সমালোচনা। এইসব রচনা দীর্ঘকাল ছড়িয়ে ছিল নানা কারণে। বস্তুত ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে কবির প্রয়াণের পর বা সমসাময়িক সময়ে প্রথম একটা তন্বী সংকলন প্রকাশিত হয় 'লে পেত্রে কিউবিস্তে' নামে। নানা সময়ে এইসব শিল্পবিষয়ক রচনা যা সম্প্রতি 'আপোলনীয়র অন আর্ট : এসেজ এণ্ড রিভিয়ুস' গ্রন্থে সন্নিবেশিত হওয়া সত্ত্বেও আপোলনীয়রের খ্যাতি সমকালীন ফরাসি শিল্পজগতে প্রাথমিকভাবে প্রচলিত হয়েছিল আধুনিক চিত্রকলা বিষয়ক নানা কাজের মধ্য দিয়ে।

চিত্রকলার ইতিহাসে পিকাসো ও ব্রাকের বন্ধুতা যে কতখানি ফলপ্রসু তা সকলেরই জানা। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে আপোলনীয়র এই দুইজনের বন্ধুতার প্রথম ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনিই আবার ১৯১১ তে কিউবিস্টরুম ৪১ সংগঠিত করেন সার্লো দে আঁদেপেঁদাতে। তাঁর রচনার অলংকারিক হিসেবে চয়ন করেন দুফে ও দেরাঁকে।

দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে, বলা হয়, মানুষ আপোলনীয়রের সম্পর্কে যত কিছু পাঠ করেছে সেই তুলনায় তাঁর রচনা পাঠ করেছে অনেক কম। বস্তুতপক্ষে এই সময়টায় তিনি হ'য়ে উঠেছিলেন একটি উপকথার নায়ক তুল্য। ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে আপোলনীয়র সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে এইস, এল, মেনকেন কবির নাম উর্ধকমার বন্ধনে রেখে লিখলেন— ইনি আসলে ন্যুয়র্কের গ্রীনিচ ভিলেজের ঠাট্টা। ম্যাথু জোসেফসন নামক অন্য একজন লেখক দাবি করেছেন " আপোলনীয়র" মন্টিকার্লোতে এক পোলিস অভিজাত রমণীর গর্ভে এবং ক্যাথলিক চার্চের একজন উচ্চপদস্থ যাজকের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে জানা গেছে আপোলনীয়র ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে রোম-এ জন্মেছিলেন এবং মাতা ছিলেন ভাটিকানের এক কর্মচারীর কন্যা আঞ্জেলিকা দ্য কোস্ট্রোভিৎস্কি। কবির পিতা সম্পর্কে আজো তেমন কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি। তবে অধিকাংশের মতে তিনি ছিলেন সম্ভবত একজন ইতালীয় সামরিক অফিসার এবং তাঁর নাম ফ্রাঙ্গেসকো ফ্লুগি দ্যাসপারমো।

ইংরিজি ভাষাভাষী জগৎ এই কবির বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করেছিলেন গেরট্রুড স্টেইন-



এর গ্রন্থ 'এলিস বি, টোকলাস-এর আত্মচরিত' থেকে যা এই শতকের তৃতীয় দশকে প্রকাশিত হয়েছিল। আপোলনীয়র বিষয়ে স্টেইন লিখেছিলেন, "গী ওম আসলে ছিলেন অনন্যসাধারণ মেধাবী।" এর থেকে অনুমান করা যায় আপোলনীয়রের দুই মহাসমরের মধ্যবর্তী সময়ে পাঠক সংখ্যা যথেষ্ট বিস্তৃতি লাভ করেছিল। ইংরিজিতে 'দ্য লিটল রিভ্যু' কাগজে তাঁর রচিত কিউবিস্টচিত্রকরদের বিষয়ে একটা আলোচনার অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ায় উইলিয়ম কালোস উইলিয়মস ১৯২২-এ কাগজের সম্পাদককে একটি প্রশংসামূলক চিঠি লিখেছিলেন। অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল ফরাসি ভাষার একজন অন্যতম কবি হিসেবে স্বদেশে বা বিদেশে স্বীকৃতি লাভ করতে। আপোলনীয়রের কাব্যগ্রন্থ 'আলকুলস'এই সময়ই ফরাসি ভাষার এক অন্যতম কাব্যগ্রন্থ হিসেবে গ্রাহ্য হয়েছিল। আলবেয়ার কাম্যু ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর অকস্মাৎ প্রয়াণের পূর্বে ঘোষণা করেছিলেন আর্তুর র‍্যাঁবোর ইলুম্যাঁসিয়োর ন্যায় আপোলনীয়রের এই গ্রন্থও এই শতাব্দীব্যাপী ফরাসি কবিতার সর্বোৎকৃষ্ট সংকলন হিসেবে গ্রাহ্য হবে। এরমধ্যে 'লে পেত্রে কিউবিস্তে' শিল্প সমালোচনার ক্ষীণতনু গ্রন্থটি সবগুলি য়ুরোপীয় ভাষায় তথা জাপানি ভাষায় পর্যন্ত অনুবাদিত হয়েছে। এবং কবি শিল্পসমালোচক হিসাবে অসামান্য খ্যাতি অর্জনের ফলে তাঁর নতুন ক'রে শিল্প সমালোচনার প্রেরণা লাভ ঘটলো। পারি শহরে নানা অখ্যাত পত্র পত্রিকা ও চিত্রপ্রদর্শনীর তালিকা থেকে তাঁর ছিন্নবিচ্ছিন্ন শিল্প বিষয়ক রচনার উদ্ধার কর্ম শুরু হলো। এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে যখন মার্সেল আদেমা প্রথম কবির সবচেয়ে মূল্যবান ও পরিশ্রমসাধ্য জীবনী প্রকাশ করলেন তখন সেখানে সংযোজিত হ'লো গীওমের এইসব ছড়িয়ে থাকা শিল্প বিষয়ক দুষ্প্রাপ্য রচনা সমূহ। এর থেকেই প্রমানিত হলো রচনার আয়তনে কবির শিল্পবিষয়ক রচনা সমূহ যা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তা প্রকাশিত রচনার চেয়ে অনেক বেশি। তার প্রমাণ পাওয়া গেল সম্প্রতি প্রকাশিত আলোচ্য সংকলনের কলেবর ও বিষয় বৈচিত্র্য দেখে।

সাহিত্যশিল্পে প্রতিটি যুগারম্ভ হয় সেই যুগের প্রতিভূ এক একজন সাহিত্যশিল্প সংযোগী মানুষের উপস্থিতির ফলে। তাঁরা এমনসব নবতম চেতনার অধিকারী হন যা সহজেই সংবেদনশীল সমকালের নিকট প্রতিভাত হয়। এটাও তো ঠিক যে সাহিত্য শিল্পে কখনই প্রাচীন ও নতুন দুই ধারার মধ্যে অন্তর্লীন সাজুয্য বিচ্ছিন্ন হয় না। অধিকাংশ সময়ই ব্যবহৃত ভাবনাধারার নতুন ভাবে পরিচর্যা ও নতুন ভাবে সংস্থাপনা ঘটে। প্রক্ষেপিত হয় নবতম আলোক, নবতম অর্থদ্যোতনা কোনো চিরকালীন সমস্যা ও ভাবনার অবয়বে। যে সমস্ত নান্দনিক বিশ্বাস দীর্ঘকাল ব্যাপী একটা সংস্কৃতিতে, কোনো একটি ভাষায় বা প্রকাশরীতিতে প্রচলিত ছিল তা কোনো আপাত যুক্তিগ্রাহ্য কারণে সমকালে অগ্রাহ্য ব'লে চিহ্নিত করার কোনো দাবী মেনে নেওয়া যায় না। তবে এই পরিবর্তনশীল জগতে, কালে, পরিমার্জিত সংস্কৃতির ফলে যুগান্তের মতাদর্শ আমাদের সর্বদাই গ্রাহ্যের অতিরিক্ত হিসেবে মনে করা বিধেয় নয়।

ফারাসি শিল্পের ক্ষেত্রেও তেমনি যখন কিউবিজম প্রয়োজন হিসেবে জরুরি জ্ঞান করা হয়েছিল তখন কেউ কেউ অনুমান করতে সক্ষম হয়েছিলেন গীওম আপোলনীয়রই সেই ব্যক্তি যাঁকে এই নব্যরীতির প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আপোলনীয়র ছিলেন সমকালীন

সময়ের মধ্যমণি যেমনটি দেখা যায় একশ্রেণীর মাকড়সার জালে। সেখান থেকে তিনি লক্ষ করছিলেন চারিপাশের পরিক্রমণরত শিল্পকর্মী মাছিদের। এমন কী বলা চলে তিনি ছিলেন বস্তুতপক্ষে একজন নির্জনতা-অধিকারী মানুষ যিনি তৎসত্ত্বেও আপন নিঃসঙ্গতা পরিত্যাগ করে বাইরে পদার্পণ করতে সক্ষম হচ্ছিলেন না। তাঁর কণ্ঠে ছিল বিংশ শতকের ভাষা এবং সম্ভবত তাঁর কণ্ঠেই প্রথম শ্রুত হলো এই শতাব্দীর যুগান্তের সাহিত্য- শিল্পের ভাবনা।

১৯০২-০৩ খ্রিষ্টাব্দের যে সব কাফে পারির শহরজুড়ে ছড়িয়ে ছিল তার যে কোনো একটিতে পদর্পণ করলেই এই তরুণ রহস্যময় যুবকটির দর্শনলাভ ঘটতো। তবে সম্ভবত ক্লোজেরি দে লিলা এমনি একটি পানশালা যেখানে এই তরুণ প্রথমত পারি শহরের সাহিত্য সমাজের প্রধানতম একটি গোষ্ঠীর সকাশে উল্লেখযোগ্য কৌতূহল জাগ্রত করতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। উল্লেখযোগ্য কারণ এখানে ঐতিহ্য অনুযায়ী নবাগতকে বিশেষ স্বাগত জানানো হতো না। শুনেছি কাফেটি অদ্যাপি অনেকের কাছে আকাঙ্খিত স্থান হিসেবে গ্রাহ্য হয়। এই সেই স্থান যেখানে পোল ভেরলেন একদা তাঁর কেন্দ্রস্থান হিসেবে অধিকাংশ সময় কাটাতেন। এখানেই তাঁর তরুণতম বন্ধু আর্তুর র‍্যাঁবো আসতেন আবসিন্থ পান করতে এবং কবিতা আবৃত্তি ও তার সঙ্গে নীচের রাজপথে জনস্রোত দেখতে। ভেরলেন বা র‍্যাঁবো আর নেই। ইতিমধ্যে সবকিছুই অনেক পরিবর্তিত হয়েছে অথচ এখন পর্যন্ত সেখানে সমকালীন কবিদের, সাহিত্যকর্মীদের সমাগম প্রচলিত রয়েছে। আমরা বিশ শতকের একেবারে প্রথম দিককার যে সময়ের কথা আলোচনা করছি তখনও ক্লোজেরি কবিদের পীঠস্থানই ছিল। প্রধানত তিনজন লেখক এই সময়টা এই ইতিহাসখ্যাত পানশালাটি শাসন করতেন। তাঁরা — জাঁপাপাদিয়ামান্তোপোলোস, একজন গ্রিক অভিজাত, যিনি জাঁ মোরেস, ছদ্মনামে তাঁর সমসাময়িক সকল ফরাসি লেখকদের তুলনায় অধিকতর বিশুদ্ধ ফরাসি ভাষায় কবিতা রচনা করতেন। এবং তাঁর সহযোগী জন্মগতভাবে ফরাসি অথচ তদনুরূপ উল্লেখযোগ্য বিশুদ্ধ ফরাসিতে রচনাকর্ম সাধিত করতে অক্ষম তাদের তিনি ক্ষমার অযোগ্য কাজ হিসেবে গণ্য করতেন। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে স্তেফান মালার্মে অবশ্য নানা চিঠিতে সবিনয়ে তথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চেয়েছেন যে কোনো বিদেশীর পক্ষে কদাপি ফরাসি জ্ঞান বিশুদ্ধতার সীমানা স্পর্শ করতে পারে না এবং এই প্রসঙ্গটি অবশ্যই দুঃখজনক ভাবে লক্ষণীয়, জাঁ মোরেস বিষয়েই উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে আজো অনেক ফরাসি সাহিত্য সমালোচনা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় যেখানে এই বিদেশী লেখকের নামোল্লেখের সঙ্গে একধরনের শিহরণ জড়িত থাকে। মোরেস ধ্রুপদী সাহিত্য বিষয়ে এতোটাই দক্ষ ছিলেন যে অন্যান্যদের মনে হতো তিনি বস্তুতপক্ষে প্রাচীন কালের আবহাওয়ায় বাস করেন। তাঁর সাহিত্য বিচার ছিল উদ্ধত কর্তৃত্বপূর্ণ এবং তাঁর কর্কশ গ্রিকটান তাঁর ভাষায় অতিরিক্ত ভার আরোপ করতো। তাঁর মতে 'ফ্লবেয়ার, অবশ্যই নিখুঁত, কিন্তু তাঁর বিশুদ্ধতা নির্বীজিত জলের মতো'এবং ' সাতোব্রিয়াঁ, একজন বারোক লেখক!'। এই বারোক বা চটকদার নির্মাণ পদ্ধতি মোরেসের শুদ্ধ ধ্রুপদী ওষ্ঠে এক প্রবল অসম্মানকর বিচার ব'লে প্রতীয়মান হতো। তিনিই প্রথম দিকে প্রতীকবাদীদের দলভুক্ত কবি হিসেবে থেকে সহসা নিজেকে প্রতীকবাদ থেকে বিচ্যুত ক'রে স্থাপন করেছিলেন 'রোমান স্কুল', কবিতার, সঙ্গে নিয়েছিলেন মরাস, বারেস এবং এরনেস্ট রেনোকে। ক্লোজেরির সভায় যদি মোরেসকে নৃপতি ব'লে অভিহিত করা হয় তবে যুবরাজ হিসেবে অবশ্যই তরুণতর



পোল ফোর্তকে মেনে নিতে হবে। যে সাহিত্যসভা তিনজনে মিলে শাসন করছিলেন তার দ্বিতীয় জন অবশ্যই এই তরুণ কবি যিনি তাঁর তরুণ বয়েসেই নব কবিযশপ্রার্থীদের কাছে কবিতার জন্য নতুনতর পথ নির্দেশক হিসেবে প্রতীয়মান হ'য়ে উঠেছিলেন। ফোর্ত ছিলেন এক অতীব দক্ষ আবৃত্তিকার এবং তিনি অনর্গল নিজের কবিতা স্মরণ থেকে উদ্ধার করতেন। আর যখন যামিনী শেষে পানশালার তৈজস গোছানোর সময় তখন নির্গত হতো তাঁর তীক্ষ্ণ সরু গলার প্রাচীন রীতিতে রচিত গাথাসমূহ — যে সব আঙ্গিক মানুষজন অনেককাল পূর্বেই ভুলে গিয়েছে।

এই সভার তৃতীয়জন ছিলেন অন্যান্য সব বিচারে মোরেস বা ফোর্ত দুজন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং অত্যন্ত প্রতিভাসম্পন্ন —আলফ্রেদ জারি। প্রথম দুজন তাঁদের যথার্থ ভবঘুরে জীবন যাপন সত্ত্বেও বস্তুতপক্ষে ছিলেন ভদ্রমহোদয়। জারির ছিল দীর্ঘ কৃষ্ণ কেশ, মাঝখানে সিঁথি এবং স্কন্ধ ছাড়ানো দৈর্ঘ্য। মুখমণ্ডল গোলাকৃতি, অস্বাস্থ্যকর চর্বিভরা, বিপুলায়তন দেহ যেন তুলনায় অতি সংক্ষিপ্ত দুপায়ের ওপর তা যেমন কুরূপ তেমনি ভয়াবহ। তাঁর বাচন ভঙ্গী ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের গ্রাম্য চাষকর্মে নিয়োজিত দূর অজানা প্রত্যন্তের মানুষের মতো। অজানা, কারণ ফরাসি দেশের কোনো প্রান্তেই এমন নিম্নমানের উচ্চারণ পদ্ধতির অস্তিত্ব নেই। আলফ্রেদ জারি স্বয়ং এই 'উবু' নামক উচ্চারণ পদ্ধতির প্রবর্তক। উবু তাঁর সৃষ্ট এক অভূতপূর্ব চরিত্র— যা মানুষের মূঢ়তার বিজয়োল্লাসের প্রতীক, জাগতিক নিষ্ঠুরতা ও দুর্নীতিপরায়ণতার প্রতীক। যে তার রচয়িতার জন্য মাত্র কয়েক বছর পূর্বেই সহসা খ্যাতির শীর্ষে আরোহন করেছে। উবু নাটকটি যখন পারিতে অভিনীত হয়েছিল তখন বিদগ্ধ দর্শকদল উবুপন্থী ও উবু বিরোধী এই দুই ভাগে বিভক্ত হ'য়ে যায়। তবে উবু ক্রমে ধীরগতিতে ফরাসি সাহিত্যে এক প্রায় ধ্রুপদী চরিত্র হিসেবে স্থান লাভ করেছে। আলফ্রেদ জারি তখন কেবল উবু চরিত্র সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত না হ'য়ে নিজেই ক্রমে উবু চরিত্রে রূপান্তরিত হ'য়ে উঠলেন। এই সময় এই পানশালার সভায় উপস্থিত হলেন একজন নতুন মানুষ, যিনি নিজেকে আপোলনীয়র নামে পরিচয় প্রদান করলেন। যদিও দীর্ঘকাল সবাই মনে করতেন তাঁর এই নাম বস্তুত অসাধ্য- উচ্চারণের এক যথার্থ নামের ছদ্মনাম। এই তরুণ তখন সভার সর্বকনিষ্ঠ সভ্য সালমোঁর তুলনায়ও বয়োকনিষ্ঠ ছিলেন। দর্শনে তিনি ছিলেন হরিদ্রাবর্ণ ঝুরো কেশ, সামান্য দীর্ঘ মেদবহুল চোয়ালযুক্ত মুখ, যেমনটি দেখা যায় রোম সম্রাটদের মুখমণ্ডলের চিত্রে — দীর্ঘ, অত্যন্ত যত্নে নির্মিত নাসিকা ও ক্ষুদ্রায়তন, ইন্দ্রিয়পরায়ণ ওষ্ঠ সম্পন্ন মানুষ। শরীরের আকৃতি ছিল দীর্ঘ অথচ দুপায়ের দৈর্ঘ্য তুলনায় খর্বাকার। সমস্তটা মিলিয়ে এই নবাগত তরুণ ছিলেন স্বাস্থ্যোজ্জ্বল এবং রসিকচূড়ামণি। যদিও তিনি ছিলেন বিদেশী যেমনটি ছিলেন মোরেস ও মারিনেত্তি অথচ ফরাসি ভাষায় তাঁর উচ্চারণ ছিল কোনো অমার্জিত বিদেশী টানহীন। বান্ধবরা কেউ তাঁর স্লাভ উৎপত্তি বিষয়ে কোনো কটাক্ষপাত করলে এই তরুণ কবির উষ্মা সকলের হাস্যরোলের কারণ হ'তো। হয়তো বা তাঁর নিজের সম্পর্কে এই রহস্যময়তা তিনি যত্নসহকারে রক্ষা করতেন। তবু এই প্রশ্নটা থেকেই যায় যে আমাদের প্রিয় কবি আপোলনীয়র আসলে কে?

উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি য়ুরোপের অধিকাংশ দেশে এক প্রবল ঝড়বাদলের কথা সাহিত্যের ইতিহাসে মূল্যবান দলিল হিসেবে গ্রাহ্য হ'য়ে আছে। এরফলে বহু মানুষ দেশান্তরী

হ'য়ে যায়। এমনি একটি পরিবার যারা পোলান্ড থেকে পলায়ন করে পত্নীর জন্মসূত্র ধ'রে এসে পৌঁছায় রোমে। তাদের কর্তার নাম মাইকেল আপোলনারিস বেস্তোভিৎস্কি। ভাটিকানে তখন এইরকম অনেক পরিবার এসেছিল ক্যাথলিক হিসেবে পোপের দাক্ষিণ্যের আশায়। তাদের ছিল একটি ছোট্ট কন্যা যে ভবিষ্যতে যথার্থ রূপসী হ'য়ে উঠবে তার সম্ভাবনা তখনি বোঝা গিয়েছিল। তার জন্ম হয়েছিল হেলসিঙ্কিতে এবং নাম ছিল, আঞ্জেলিকা আলেকজান্দ্রিন। শৈশবেই এই কন্যা এতটাই দুষ্টু হয়েছিল যে স্বয়ং পোপকে তার ভর্তির জন্য সমকালীন রোমান অভিজাতদের জন্য নির্বাচিত বিদ্যালয় 'পবিত্র হৃদয়' নামক ফরাসি পঠনপাঠনের কেন্দ্রে চেষ্টা করতে হয়েছিল। এবং পোপের স্নেহধন্য হওয়া সত্ত্বেও এই রূপমতীকে বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হল। পিতামাতা বয়সের উপযুক্ততার পূর্বেই কন্যার একটা বিবাহজীবন তৈরির জন্য প্রচেষ্টা আরম্ভ করল। এটা সম্ভব ছিল প্রচলিত বিখ্যাত কোনো সালোঁর সঙ্গে কন্যার সংযুক্তি সাধনের দ্বারা। আঞ্জেলিকা আলেকজান্দ্রিন আকৃষ্ট হলেন সিসিলির রাজকীয় সৈনিকদলের অফিসার, রূপবান এবং চল্লিশোর্ধে বয়ঃক্রম, ফ্রান্সেসকো ফ্লুগি দাসপারমোন্তর প্রতি তার আকর্ষণ শক্তির প্রলোভনে , যিনি যা লভ্য ব'লে মনে করতেন তাই লাভ করতেন। তিনি ওঁর দিক থেকে এক অভিজাত সুইস-ইতালীয় পরিবারের কনিষ্ঠ পুত্র। এই লোকটি আসলে ছিলেন একজন ভ্রমণকারী যাঁর কিছু দুর্নাম থাকা সত্ত্বেও আপন পরিবারের সঙ্গে একটা সমঝোতা রাখছিলেন। এই বিবাহ মহামান্য পোপের আর্শীবাদপুষ্টই হ'তে পারতো অথচ এরা গোপনে পলায়ন করলো ভাটিকান ছেড়ে। ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ এরা দুজনে উদয় হলো রোমে । আলেকজান্দ্রিন তখন সন্তান সম্ভবা । এই বছরের ২৬শে অগষ্ট তাদের এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করলো যার নাম খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করার সময় দেওয়া হ'ল উইলহেলম আলবার্তো আপোলিনারীয়ো। এর ঠিক ছয়মাস পর মাতা এক অনুজ্ঞাপত্রে ঘোষণা করলো এই পুত্র তার জারজ সন্তান সুতরাং তার নাম হবে মায়ের নামানুসারে কোস্ত্রোভিৎস্কি। আবার দু বছর পর মায়ের দ্বিতীয় সন্তান জন্মালে তার নাম হলো আলবার্তো। ইতিমধ্যে আঞ্জেলিকার বৃদ্ধস্বামী ক্রমাগত অনুপস্থিতির মধ্য দিয়ে একেবারেই তাদের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেলেন। উইলহেলম কোস্ত্রোভিৎস্কি যখন মাত্র পাঁচ বছরের শিশু তখন তাদের আনা হলো মোনাকোতে, যদিও তার শৈশব কেটেছে ভাটিকানের ছায়ায়। মা ও দুই পুত্রকে পিতা ফ্রান্সসকো ফ্লুগির ভ্রাতা নিকোলাস মোনাকোর বিশপের কাছে থাকবার ব্যবস্থা করেছিল পরিবারের সম্মান রক্ষার্থে। দুই ভ্রাতাকে দেওয়া হলো এক শিক্ষায়তনে দুইজন সন্ন্যাসিনীর কাছে ফরাসি শিক্ষার অভিপ্রায়ে। গীওম জীবনে কখনোই পোপের ছত্রছায়ার একাধারে রাজসিক ও অযৌক্তিক জীবন ভুলতে সক্ষম হন নি। তাঁর জীবনের নানা সমস্যার অসমাধানযোগ্যতার মধ্যে এটাই ছিল অসামান্য । মায়ের সঙ্গে সংযোগও তেমনি এক তুলনাহীন সমস্যা যা তিনি কিছুতেই পরিত্যাগ করতে সক্ষম হন নি। অথচ এই সময় থেকেই গীওম সচেতনভাবে নির্বাসন দিচ্ছিলেন তাঁর তরুণ গাত্রত্বক থেকে পোলিস-রোমান বর্ণগন্ধ যথার্থ একজন ফরাসি মানুষ হিসেবে নবজন্ম লাভের জন্য। তাঁর পরবর্তী জীবনের একটি দীর্ঘ কবিতা 'জোন' যাতে কবির এই সময়কার মানসিক যন্ত্রণার কথা লক্ষ করা যায় — যেখানে তিনি বিবৃত করেছেন তাঁর উইলহেলম থেকে গীওম হ'য়ে ওঠার কথা। মোনাকোতেই নিতান্ত তরুণ বয়সে গীওম কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। প্রেরণা হিসেবে একজন শিক্ষকের উৎসাহ তাঁর প্রাথমিক রচনার সহায়ক



হয়েছিল। অবশ্য আজ আর সেইসব রচনার কোনো হদিস পাওয়া যায় না। এই সময়ই তিনি তাঁর বয়ঃসন্ধিক্ষণে অনুমান করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁর উড়নচণ্ডী, খেয়ালি অথচ বুদ্ধিমতী মাতাকে, যাকে তিনি জীবনে আদর্শ জ্ঞান করেছিলেন, তিনি বস্তুতপক্ষে গীর্জে ও সমাজ উভয়ের বিবেচনায় পাপ কর্মে লিপ্তা রমণী। এখন এই তরুণের মনস্থির করতে হবে কাকে সে জীবনে বর্জন করবে এবং তাঁর কাছে মায়ের উজ্জ্বলতা এতই প্রবল ছিল যে সমস্ত জীবনের মতো মায়ের দিকেই টান র'য়ে গেল। তিনি চ'লে এলেন নিসে। ভর্তি হলেন নিসের লিসিতে। তখন তিনি স্পষ্টতই জ্ঞাত আছেন তাঁর মায়ের প্রকৃতচরিত্র —আর তাই তাঁর জীবনের তীব্র, তিক্ত অনুশোচনার সূত্রপাত। এখন তো গীওম যুবক। রচনা করছেন, পরিকল্পনা করছেন নিজের খরচে প্রকাশ করবেন প্রথম কাব্যগ্রন্থ। সমকালীন বন্ধু লুকাকে চিঠিতে লিখছেন, 'গদ্য! কী যে কঠিন! অন্যপক্ষে ভালো কবিতা রচনা তো খুবই সহজ কাজ'। অনুবাদ করছেন মধ্যযুগের ইতালিয়ান রচনা থেকে। সমসাময়িক বন্ধুদের কাছে তাঁর সুনাম ক্রমশ ছড়িয়ে গেল যখন তারা জ্ঞাত হলো তাঁদের সহপাঠী পারি শহরের সব স্বনামধন্য কবিদের কাব্যের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত। তখন ফরাসি কবিতার সাম্রাজ্য শাসন করছেন স্বয়ং স্তেফান মালার্মে।

গীওম-এর মাতা এই সময় তার চেয়ে ১০/১২ বছরের বয়োকনিষ্ঠ জুলে ওরেইল নামে এক ইহুদি বিত্তবানকে আশ্রয় করেছে। তারা দুই পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে এ শহর ও শহর ক'রে ক'রে এসে পৌঁছালো পারিতে শতাব্দীর শেষ বছরের এপ্রিল মাসে। মালার্মে প্রয়াত হলেন সেপ্টেম্বরে গীওম তখনো এমন কবিখ্যাতি অর্জন করেন নি যে ফরাসি কাব্য সমাজে তাঁর পরিচিতি ঘটবে। মা এই ইহুদির অবশিষ্ট বিত্তানুকূল্যে পারির এক অভিজাত অঞ্চলে গৃহ স্থাপন এবং সেটুকুও ক্ষয় ক'রে শূন্য হাত হলো। এই রিক্ত জীবনে কখনো বেলজিয়াম কখনো ফ্রান্স ঘুরে ঘুরেই গীওম এমন এক বয়সে পৌঁছালেন যখন তাঁর উপার্জনের চেষ্টা প্রধান উদ্দেশ্য হ'য়ে উঠলো। অনুভব করতে পারলেন পারিতে একজন বিদেশীর পক্ষে কাজ পাওয়া সে সময়ে কী ভয়ানক দুঃসাধ্য ছিল। সে দেশের অধিকাংশ কবি বা লেখকদের পক্ষে সিভিল সার্ভিসে স্থান সুনিশ্চিত থাকলেও তাঁর পক্ষে এ কাজ পাওয়া সম্ভব ছিলনা। পক্ষান্তরে গীওম-এর ছিল না এইসব কর্মের উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা। ফলে গীওম কিছুকাল সর্টহ্যান্ড ইত্যাদিও শিখেছিলেন কাজের সন্ধানে। ফলে তাঁকে যে নানা কাগজে নানা ফরমায়েশি রচনা লিখতে হতো তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

যে সময়ে তরুণ গীওম ও তাঁদের মাতা পারিতে পদার্পণ করেন সেই সময়ই তাঁর চেয়ে কয়েক মাসের বয়োকনিষ্ঠ এক যুবক স্পেইন থেকে পারিতে আসেন। পাবলো রুইজ, যিনি কিছুদিনের মধ্যে পিকাসো নামে পরিচিত হ'য়ে উঠলেন। তিনি এলেন স্পেইনের মালাগা অঞ্চল থেকে এবং তিনি পঠনপাঠন করেছিলেন বারসেলোনার শিল্পকলার বিদ্যালয়ে যেখানে তাঁর পিতা ছিলেন একজন শিক্ষক। পিকাসোর বয়স যখন পনেরো তখনই তিনি একজন পরম প্রতিভাসম্পন্ন ব'লে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি এমন নিশ্চিতভাবে এবং সূক্ষ্ম অনুভূতির সঙ্গে ছবি আঁকতেন যা কেবলমাত্র শিল্পকলার প্রাচীন মহাপুরুষদের ক্ষেত্রেই লক্ষ করা যায়, তিনিও তেমনি দক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন। সঙ্গে ছিল তাঁর তৎকালীন শিল্পগুরু এল গ্রোকোর ঔদ্ধত্য। ফলে তিনিও গীওম-এর ন্যায় শিল্প সাহিত্যের য়ুরোপীয় কেন্দ্রবিন্দু পারিতে স্থানার্জনের স্বপ্ন দর্শন করতেন। তাঁর যখন ষোড়শ বৎসর বয়স তখন তাঁর প্রথম

প্রদর্শনী হয়। বলা বাহুল্য প্রদর্শনীটি অত্যন্ত সার্থক হওয়া সত্ত্বেও এরপর এমন কিছু ঘটনা ঘটলো না যা তাঁকে শিল্প সমাজে স্থায়ী আসন লাভে সহায়তা করতে পারে। পারিতে তখনও অগণিত শিল্পী ও গণনাতীত চতুর শিল্পী উপস্থিত এবং অসংখ্য সার্থক শিল্প প্রদর্শনী প্রত্যহ ঘটছে। এবং আমাদের বাঙলা সাহিত্যের ন্যায়ই ফরাসি দেশের, মানুষের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে আজ তারা যাঁকে নিয়ে মশগুল হয় আগামীকাল তাঁর বিষয়ে তাঁদের বিস্মরণ ঘটে। তবুও পিকাসো ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে গীওম-এর মতো পারিতেই তাঁর দুঃখের তরী ভেড়ালেন। সেই বছরই মালার্মে প্রয়াত হলেন। গীওম এরমধ্যে একটা ব্যাঙ্কের একজন কর্মচারী, যে ব্যাঙ্ক ব্যবসা গুটিয়ে নিল। একটা ছোটখাটো আর্থিক রিভিয়ু কাগজে কাজ পেলেন সম্পাদকের। এই কাজে তাঁর তেমন অতিরিক্ত সময় ব্যয় না হবার জন্য গীওম যথেষ্ঠ সময় পেতেন প্রভূত প্রবন্ধ রচনার, নানা সময়ে তাঁর যথার্থ রচনা কবিতা ছাড়াও। কিছু কিছু কাহিনীও তিনি এই সময় লেখেন। লেখেন কয়েকটি অশ্লীল যৌন আবেদনমূলক উপন্যাস বেঁচে থাকার প্রয়োজনে। আর সেই যুদ্ধে লিপ্ত থাকার কারণে তাঁর সঙ্গে পিকাসোর প্রথম পরিচয় ঘটে ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁদের দুজনের একধরণের কয়েকজন বন্ধু ছিল। তারাই একদিন পিকাসোকে নিয়ে এলো আমস্টারডাম পথে র একটা পানশালায় যেখানে সে সময় গীওম প্রত্যহ তাঁর শহরের বাইরে যাবার শেষ ট্রেইনের সময় পর্যন্ত কাটাতেন। এখানেই বন্ধুতা হলো মাক্স যাকোব- এর সঙ্গে। তারপর তিনজনের বন্ধুতা চললো দীর্ঘদিন। পিকাসোর ছবির সঙ্গে প্রথম গীওম-এর পরিচিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তা কবিকে এমনই মস্তিষ্কে আঘাত দিয়েছিল যা তাঁর মনের দরোজা নবদিগন্তের দিকে উন্মুক্ত ক'রে দিল। তিনি এর পূর্ব পর্যন্ত শিল্পকলা বিষয়ে তেমন মনোযোগ দিয়ে কোনো ভাবনাচিন্তা করেন নি। এমন কী এই বিষয়ে তেমন আগ্রহও তাঁর ছিল না। অথচ শিল্প বিষয়ে এই মুহূর্ত থেকে তিনি এমন সব দিগন্তের সন্ধান লাভ করলেন যা অত্যুক্তি হবে না যদি বলি, স্বয়ং শিল্পীও কল্পনা করেন নি। যিনি বস্তুত এই সব চিত্রাবলীর বিশ্লেষণ না ক'রে কেবলমাত্র সজ্জার অনুপ্রেরণায় তুলি চালিয়েছেন। প্রথমত আপোলনীয়র এই চিত্রাবলী দর্শন করেছিলেন একজন লেখকের চোখ দিয়ে অর্থাৎ তিনিই প্রথম অনুমান করতে সক্ষম হয়েছিলেন পিকাসোর ব্লু পিরিয়ডের কাব্যিক সম্ভাবনা। ফলে শিল্প বিষয়ক তাঁর প্রথমদিককার প্রবন্ধগুলো ক্যানভাসে যা চিত্রিত হয়েছে তাঁরই একরূপ নবীকরণ। আমরা এখানে এমনি একটি রচনার উদাহরণ নিবেদন করছি বর্তমান পাঠকদের অবগতির জন্য। 'শিশুরা যারা নিজেদের খেয়াল খুশি মতো ঘুরছিল এবং শিক্ষাদীক্ষার কোনো পদ্ধতিই তাদের উপকারে আসে নি। তারা স্থির হ'য়ে দাঁড়ালো এবং বৃষ্টিও সেই মুহূর্তে থেমে গেল।' এই বর্ণনা আপোলনীয়র-এর রচিত দ্বিতীয় পিকাসো বিষয়ক আলোচনা—১৯০৫-এর মে মাসে প্রকাশিত। এই রচনাটিতেই আছে, 'বিশুদ্ধ সূর্যালোকে, নারীরা নিস্তব্ধ থাকে, তাদের শরীর দেবদূতোপম আর চোখের দৃষ্টি কম্পিত। 'এবং 'শয়নকক্ষে, দরিদ্র চিত্রকররা প্রদীপের আলোয় অঙ্কন করছেন রোমশ নিরাবরণ নারীর শরীর। বিছানার কাছে পরিত্যক্ত রমণীদের পাদুকা স্মরণ করায় কোমল ত্বরা।' এমনি সব কাব্যমণ্ডিত ভাষ্য একের পর এক তিনি রচনা করেছেন চিত্রাবলীর নিহিতার্থ উদঘাটনের জন্য। একই সঙ্গে আপোলনীয়র নন্দনতত্ত্বের তত্ত্বগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য নব নব দিগন্তের উন্মোচন করেছেন। এই সময় অর্থাৎ ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাস থেকে, যেদিন পিকাসো প্রথম কবির সামনে দেয়ালে হেলান দেওয়া এক একটি ক্যানভাস তুলে ধরেছেন যাতে কবি



প্রত্যক্ষ করলেন মাধুর্যময় নীলবর্ণ মানুষের দুঃখের সারি — সেই মুহূর্ত থেকেই বস্তুত কবি গীওম আপোলনীয়র হ'য়ে উঠলেন একজন অন্যতম চিত্রসমালোচক। যদিও তাঁর ছিল না কোনো প্রাক্তন অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান এই শিল্পকলা বিষয়ে তবু তিনি কোনো এক অজানিত ক্ষমতা বলে মুহূর্তে অনুভব করতে পারলেন পিকাসো যা এঁকেছেন তা তিনি কেন আঁকলেন। এরপর থেকে প্রতিদিন তিনি সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে উঠতে লাগলেন রাভিগনাঁর আস্তানায় যেখানে পিকাসো নিমগ্ন চিত্রাঙ্কনে এবং যুগপৎ ব্যস্ত থাকতেন কবির সঙ্গে আলোচনায়।

পিকাসো পরিবর্তিত হচ্ছিলেন এবং আপোলনীয়র লক্ষ করছিলেন এই বদল যা তিনি তাঁর নিজের মতো ক'রে ঘোষণা করছিলেন। 'এক বছর পিকাসো এই তরল চিত্রাবলীতে আবদ্ধ ছিলেন, তা ছিল নীল যেন বেদনার্ত, সমুদ্রের তরল গভীরতা।' 'এই বেদনা পিকাসোকে আরো গভীরতর তিক্ত ক'রে তুলছিল। তাঁর খোলা জায়গায় দেখতে পাওয়া যাবে, পথচলতি মানুষের তির্যক মাথার উপর, গৃহসমূহের উপর প্রলম্বিত একজন ফাঁসিতে ঝোলান মানুষ। এইসব শাস্তিপ্রাপ্ত মানুষজন যেন অপেক্ষা ক'রে আছে কোনো মুক্তিদাতার। দড়ি প্রলম্বিত আছে দৈবকৃপায় চিলেকোঠার উপর; জানালার কাচ প্রজ্বলন্ত পুষ্প সম্ভারে .....'

বস্তুতপক্ষে পিকাসো যখন আপোলনীয়রের সঙ্গে পরিচিত হলেন তখন তিনি তাঁর ভাঁড় রচনার অধ্যায়ে যাচ্ছেন। এই অধ্যায়ের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হবে পিঙ্ক পিরিয়ড। তাঁর চিত্রের আকার, খুবই ভঙ্গুর, দীর্ঘায়ত, ক্রমে হ'য়ে উঠছিল বৃহদাকার প্রায় স্থাপত্যের অনুরূপ। রঙ ক্রমে অধিকতর পিংক তার থেকে রক্তিমাভ বাদামি ছায়া চিত্রাবলী শোভিত করছিল এই অধ্যায়ে। আপোলনীয়র এই প্রবণতা বিষয়মুখীনতা ব'লে অভিহিত করলেন যা আসলে ধীরে কিউবিজমের দিকে চালিত হচ্ছিল। পরবর্তী কালে আপোলনীয়র লিখেছেন, 'পিকাসো, সেইসব শিল্পীদেরই দলভুক্ত যাঁরা বস্তুতপক্ষে মানুষ নয়, শিল্পের যন্ত্র। তাঁদের যুক্তি ক্ষমতা আপন বিরুদ্ধাচারণে অক্ষম। তাঁরা কখনই কোনো সংগ্রাম করেন না এবং তাঁদের সৃষ্টি কোনো প্রকার সংগ্রামের চিহ্ন ধারণ করে না। মনে হয় যেন তাঁরা প্রকৃতির প্রসারণ এবং তাঁদের সৃষ্টি কখনোই বুদ্ধিমত্তার মধ্য দিয়ে চলাচল করেনা।'

এমন কথা অনুমান প্রায় অসম্ভব পিকাসোর এইসব পরিবর্তন, নবনব অধ্যায়ের চিত্রকলার পশ্চাতে শিল্প সমালোচক কবি আপোলনীয়রের কতখানি অবদান বর্তমান। তবে পিকাসো স্বয়ং একবার তাঁর যৌবনের কথা বিবৃত করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'তখনকার দিনে, চিত্রকর ও লেখককুল পরস্পরকে স্বেচ্ছায় প্রভাবিত করতেন'। একথা যে তিনি আপোলনীয়রকে স্মরণে রেখে উচ্চারণ করেছিলেন তাতে বোধকরি কারো সন্দেহ থাকবে না।

'বাতো লাভোয়ার' পানশালায় আপোলনীয়র ও পাবলো পিকাসোর প্রথম সাক্ষাতের পরপরই আপোলনীয়র তাঁর প্রথম যথার্থ শিল্পসমালোচনা রচনা করলেন ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে, তার বিষয় পিকাসো। এই রচনার প্রথম ছত্র, 'পিকাসো সম্পর্কে এমন কথা প্রচলিত যে তাঁর চিত্রাবলী একধরনের বালপ্রৌঢ় মোহমুক্তির পরিচয় বহন করে।

আমি বিশ্বাস করি এর বিপরীতটাই সত্য।

সবকিছুই তাঁকে ভূতগ্রস্ত করে, আর তাঁর তুলনারহিত প্রতিভা, আমার মনে হয়, এমন এক কল্পনার পরিচর্যায় নিয়োজিত যা পরমানন্দের সঙ্গে ভয়ঙ্কর, হীনতার সঙ্গে সুরুচিপূর্ণতার যথাযথ মিশ্রণ ঘটাতে সমর্থ হয়।'

এই শিল্প আলোচনার পূর্বে আপোলনীয়র জর্মানি ভ্রমণকালে অর্থাৎ ১৯০২ ও ১৯০৩ যে চারপাঁচটা ছোট বড় গদ্য রচনা বিচ্ছিন্নভাবে লিখেছেন, বস্তুতপক্ষে তাতে প্রমাণ হয় শিল্প সমালোচনার ভাষা তৈরির অনুশীলন চলছে। আপাতভাবে এই চিত্রসমালোচনা জাতীয় কাজের জন্য আপোলনীয়রের কোনো শিক্ষানবিশী ছিল না। আমরা জ্ঞাত আছি তিনি মোনাকোতে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রাবস্থায় কোলেজ স্যাঁৎ- শার্লেতে নকশা অঙ্কনে প্রথম পুরস্কার অর্জন করেছিলেন যদিও তাঁর নিজেরই তেমন বিশেষ স্মরণ ছিল না এই সময়কার অন্যান্য ঘটনা। ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে লিখেছেন, 'যখন আমি স্কুলের ড্রইং ক্লাশ মনে করি, আমি স্মরণ করতে পারি কী হতশ্রী লিথোগ্রাফ আমাদের দেওয়া হতো মডেল হিসেবে—অজ্ঞাত সব শিল্পশিক্ষকদের কাজ.....।' সুতরাং একথা অনুমান করা অসম্ভব নয় তাঁর যা জ্ঞানগম্যি চিত্রকলা স্থাপত্য বিষয়ে তা বস্তুত নিজেরই অর্জিত। কেবলমাত্র ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে গৃহশিক্ষক হিসেবে রাইনল্যাণ্ড অর্থাৎ জর্মানিতে যাবার পূর্বে পারিতে এক বছরের জন্য একটা আর্ট কলেজে ক্লাশ করেছিলেন। সুতরাং জর্মানি থেকে তাঁর প্রথম শিল্প আলোচনাগুলো 'লা রভু ব্লাঁসে' ও 'লোরোপেঁয়' তে পাঠানোর মধ্যদিয়েই তাঁর শিল্প-স্থাপত্য বিষয়ে জ্ঞানার্জনও পরিশীলিত হচ্ছিল।

তাঁর খ্যাতি শিল্পসমালোচক হিসেবে ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে যথেষ্ট বিস্তৃত হওয়ায় তাঁর নাম সুপারিশ করা হ'লে তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকার 'লা ভি আর্টিসর্টিক' নামক শিল্প সমালোচনা কলমের লেখক হিসেবে। এই সময়ে তরুণ শিল্পীদলের সপক্ষে আপোলনীয়রকে, ঐতিহ্য ও নীতিবাদীদের বিরুদ্ধে যে নিরলস কলমযুদ্ধ চালাতে হয়েছিল তার সীমাহীন সাক্ষ্য এই গ্রন্থের প্রত্যেকটি রচনায় যেমন প্রত্যক্ষ করা যাবে তেমনি লক্ষ করা যাবে নানা প্রদর্শনীর তালিকার শাদা অংশে তাঁর সচকিত মন্তব্য পাঠে। এই সংগ্রামের মাঝে মাঝে তিনি রচনা করেছেন বিগত শতাব্দীর অনেকানেক অবহেলিত স্থপতি যেমন 'বারে', 'কারপো' অথবা 'আলবেয়ার বেসাঁর্দ' তেমনি তাঁর দৃষ্টিতে লক্ষিত হয়েছে কাণিয়েল্লোর মতো ইস্তেহার অঙ্কনবিদের তুলনারহিত ক্ষমতা। মনে রাখতে হবে এই কাগজ যার কলমে অর্থাৎ 'লা ভি আর্টিসর্টিক'- এ গীওম লিখতেন তার সর্বশক্তিমান সম্পাদকমণ্ডলী ছিলেন আধুনিক শিল্পকলার একান্ত বিরোধী। সোচ্চাররূপে বিমুখ। তাদের মতে এইসব শিল্প কর্ম বস্তুতপক্ষে একদল মানুষের বিকৃতমস্তিষ্কের ফলপ্রসূত। বস্তুত প্রগতিবাদী পত্রিকাসমূহ তিনি যেসব সমালোচনা লিখতেন, যেমন ' সোঁৎযোই।' 'ডের স্টুর্ম' এবং বিশেষভাবে 'লে সোয়ারি দ্য পারি'— সে সব অধিকতর আক্রমণপ্রবণ রচনা হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। বলা যায় তখন আপোলনীয়রের যে কঠোর আক্রমণকারী অভিধা প্রচলিত তা হয়তো তেমন মিথ্যাশ্রয়ী নয়।

আপোলনীয়র ১৯১২ তে যখন তাঁর বিগত পনের বছরে রচিত কবিতাবলী থেকে নির্বাচিত করছিলেন যোগ্য রচনা যা তিনি 'আলকুলস' নামক তাঁর অন্যতম কাব্যগ্রন্থে সংগ্রথিত করবেন সেই সময়ই প্রয়াস চালাচ্ছিলেন শিল্পসংক্রান্ত রচনাবলীর একটা উপযুক্ত সংকলন প্রকাশ করার। পরের বছর অর্থাৎ ১৯১৩ - তে দু'টি নামে এক মলাটে একটি তন্বী বই প্রকাশিত হলো মুষ্টিমেয় শিল্প সংক্রান্ত রচনা নিয়ে। কাব্য বা শিল্প আন্দোলনে 'ইজম' বা 'বাদ' নিয়ে সংশয়, সন্দেহ ১৯১৪- তে কবির মনে গভীর আসন নিল। লিখলেন, 'ফলত নানা স্কুল অর্থাৎ কিউবিষ্ট, অরফিষ্ট, ফিউচারিষ্ট, সিমালটেনেইষ্ট ইত্যাদি নামগুলো কারও যথাযথ অর্থে গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। কিছুকাল ধ'রে এসবের বস্তুত কোনো যথার্থ অর্থ নেই।' এই



ঘোষণা সত্ত্বেও ১৯১৪ - এর মার্চ মাসে এই সব অভিধার কোনো একটির জন্য তিনি 'লিত্রাঁজিগাঁ'-এর কলাম লেখার কাজটা হারালেন। এরপর 'পারি জুরনাল'- এ 'লেজার্ত' কলাম লেখার কাজ পেলেন এবং মে থেকে অগষ্ট পর্যন্ত তিনি তাঁর জীবনের মূল্যবান প্রবন্ধগুলো রচনা করেছেন— আধুনিক চিত্রকলা প্রসঙ্গে। এই জয় পরাজয়ের টানাটানিতে বিব্রত অবস্থায় তাঁর প্রখ্যাত দু বছর পূর্বে দেওয়া ভাষণের ফলে 'তুস লেজার্ত' নামক পরিকল্পিত এক শিল্পগ্রন্থমালার প্রধান সম্পাদক নির্বাচিত হলেন গীওম আপোলনীয়র। এবং তাঁরই প্রবন্ধ সংগ্রহ এই গ্রন্থমালার প্রথম ও একমাত্র গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হল। এই বইয়ের পেছনের মলাটে প্রকাশিতব্য ১৪টি গ্রন্থের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। এরমধ্যে কিউবিজম থেকে নির্গত এক নবতম ধারার চিত্রের নামকরণ তিনিই করেছিলেন— অরফিস্টস—যার বিষয়ে তাঁর পরিকল্পিত গ্রন্থটিও ছিল। ১৯১১ তে অন্যপক্ষে ঘোষণা করেছিলেন একটি পুরো গ্রন্থের পরিকল্পনা বন্ধু পাবলো পিকাসোর বিষয়ে। এর থেকে স্পষ্ট হয় আপোলনীয়র চিত্রকলা বিষয়ে এমন সব রচনা সম্পর্কিত উচ্চাশা পোষণ করতেন যা সম্ভবত তার সামর্থের বাইরে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করেছিলেন গোলন্দাজ বিভাগে এবং পরে নিজেই অনুরোধ জ্ঞাপন করেন পদাতিক বাহিনীতে যোগদানের। এইভাবে ১৯১৫ পর্যন্ত মাঝে মধ্যে কিছু কিছু রচনা ও অন্যান্য উপায়ে শিল্পজগতের সঙ্গে ক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এরপর ১৭ মার্চ ১৯১৬ -তে মস্তিষ্কে আঘাতের পর থেকে যেমন আমরা বিখ্যাত চিত্রটিতে দেখতে পাই, পিকাসোর অঙ্কিত, মাথায় পট্টি বাধা, নতুন উদ্যমে শিল্পের মুক্তি সংগ্রামে অবদমিত রচনায় কলম তুলে নিলেন এবং জীবনের অবশিষ্ট দুই বছর আর কোনো সংবদ্ধ ক্ষমতাই তাঁর অনলস কলম স্তব্ধ করতে পারে নি।

আপোলনীয়র ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে ঘোষণা করলেন, তাঁর রচিত সব কবিতা যার বিষয় অসংখ্য চিত্রশিল্পী এবং চিত্রাবলী— তা 'ল মারসাঁ দোয়াজো' অর্থাৎ 'পাখিওয়ালা' নামে একটি মলাটে একত্রিত করবেন। হয়তো বা এমনি আরো কিছু কিছু বাসনা যুদ্ধবিরতির পর পরিপূর্ণতা লাভ করতো কিন্তু ৯ নভেম্বর ১৯১৮ -এর য়ুরোপব্যাপী ইনফ্লুয়েঞ্জার যে মহামারীর তাণ্ডব শুরু হয়েছিল তার আক্রমণে মাত্র ৫ দিন রোগাক্রান্ত অনেক যুদ্ধে বিজেতা গীওম আপোলনীয়র প্রয়াত হলেন। আশ্চর্যের কথা এই ইন্দ্রপতনের ঠিক এক সপ্তাহ পূর্বে ফ্রানৎস সাইমোঁ নামক এক তরুণ ফরাসি কবির মৃত্যুতে আপোলনীয়র লিখলেন 'স্পেইনের ফ্লু, অথবা এশিয়ো, যে নামই তুমি পছন্দ কর না কেন, নিয়ে গেল জাস্টিন ফ্রানৎস সাইমোঁকে মাত্র চার দিনের মধ্যে তাঁর তরুণী পত্নীর পাশ থেকে, যে নিজেও একই অসুখে শয্যাশায়ী ছিলেন।

এই কবি জীবনকে পছন্দ করতেন, পছন্দ করতেন এই আধুনিক জীবন, এবং তাঁর তরুণ প্রতিভা ছিল সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ যা মৃত্যু এই মুহূর্তে নস্যাৎ করে দিল।'

জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আপোলনীয়র ছিলেন বস্তুতপক্ষে একজন যুবক, তেজস্বী এবং শিল্পের ভবিষ্যত বিষয়ে পরিপূর্ণ আশাবাদী। যুদ্ধের সময় আঁদ্রে ব্রেতোঁকে একটা চিঠিতে লিখছেন : 'আমি স্থির জানি শিল্প কখনো বদলায় না এবং আমরা যাকে পরিবর্তন ব'লে বিশ্বাস করতে চাই তা আসলে ক্রমান্বয় এক প্রচেষ্টা যা মানুষ চালায় শিল্পকে এমন এক উঁচু পর্যায়ে রাখতে যেখানে তা থাকতে সমর্থ হয় না।' তাঁর এই বিশ্বাস যাকে তিনি প্রায়শই

'মহোত্তম' আখ্যায় ভূষিত করতেন, তার পরস্পর বিরোধী অভিব্যক্তি, তিনি জীবনের দীর্ঘ ষোলটি উল্লেখযোগ্য বছর ধরে যেমন পরিচর্যা করেছেন তেমনি তার নেতৃত্বও দিয়েছেন। তাঁর চিত্রসমালোচনাসমূহ তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশক তথা ইমপ্রেশনিস্টিক। তিনি কখনোই সরাসরি লিখতে দ্বিধা করতেন না: ' আমি ঐ ছবিটি পছন্দ করি' অথবা 'আমি ঐ ছবিটি রুচিহীনতার পরিচায়ক ব'লে মনে করি'। আর যখনই প্রবল বুদ্ধিমত্তাযুক্ত ব্যাখ্যা করতেন তখন তারজন্য তিনি কাব্যধর্মী মন্তব্য ব্যবহার পছন্দ করতেন। আসলে পারিপার্শ্বিকতা, উপস্থিত ব্যক্তিত্ব বা পাঠককুল বিবেচনা ক'রে সেই অনুযায়ী তিনি তাঁর বক্তব্যর প্রকাশ পদ্ধতির বদল ঘটাতেন। আঁদ্রে সালমোঁ তাঁর চিত্র-সমালোচনা বিষয়ে মন্তব্য করেছেন যা আজো অত্যন্ত উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়: 'তাঁর প্রতিভা সমালোচক হিসেবে, তাঁর কবি প্রতিভা থেকে পৃথক করা যায় না।' যদি আমাদের মনে হয়, আপোলনীয়র এই পদ্ধতির অনুসরণ করতেন, কারণ এই বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের স্বল্পতার জন্য; তবে তাদের স্মরণ করা উচিত আপোলনীয়র তেমনি বলিষ্ঠ রচনা পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন তাঁর সাহিত্য সমালোচনাগুলোর বেলায়ও যেখানে তাঁর ক্ষমতা বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। আসলে এই রচনা পদ্ধতির যা কিছু ঝুঁকি থাকুক না কেন, আপোলনীয়র এমন এক সমালোচনার প্রতিভার অধিকারী ছিলেন যা অন্য সকল পেশাদার সমালোচকদের ঈর্ষার উপাদান যোগাবে।

# ক্রোড়পত্র-২

## বড়বাজার

দেবব্রত মল্লিক

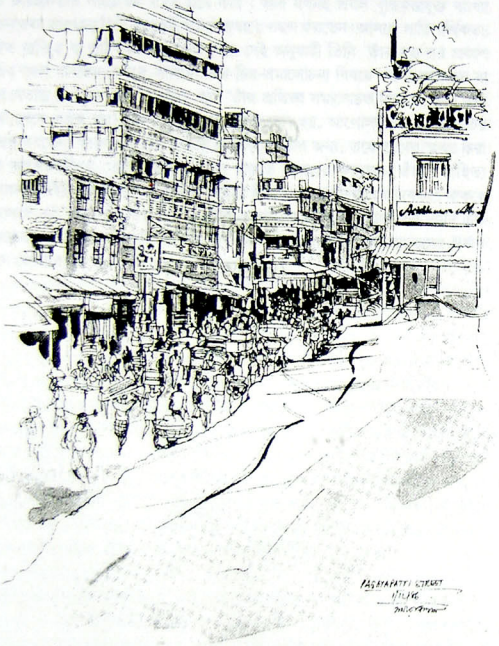

# বড়বাজার

দেবব্রত মল্লিক

[বড়বাজারের সূচনা হয় ৪৮৮ বিঘা জমি নিয়ে। বড়বাজার শুধুমাত্র বড়ই নয়, বৈশিষ্ট্য, প্রকরণ এবং কর্মকাণ্ডের প্রাচুর্য নিয়ে এক বিশাল বাজার। ইংরেজদের প্রথম আমলে এই বাজার উল্লিখিত হয়েছে 'গ্রেট বাজার' নামে। একটা সময় ছিল যখন অন্যান্য দেশের কাছে ভারতবর্ষ ছিল উপমা। দূর দূরান্তের দেশ থেকে ব্যবসায়ীরা এখানে এসে ব্যবসা করতে পারলে খুশি হতেন, গর্ববোধ করতেন। কেননা সেই সময় সামাজিক অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর শীর্ষে ছিল আমাদের এই বাজার। ক্রমে ক্রমে এ জায়গা এক অসহনীয় অবস্থার দিকে এগুতে থাকে। তাই ১৯১৯ সালে প্রফেসর প্যাট্রিক গিডেস নক্সা একে পরিকল্পনা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন কি ভাবে এলাকার পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন। কিন্তু আজ পর্যন্ত পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনাতেই রয়েছে, তার বিন্দুমাত্র রূপায়ণ সম্ভব হয়নি।..... সম্পাদক)]

## কলকাতায় প্রথম হাট

মানুষের বসবাস করার সঙ্গে সঙ্গে তার দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত করার জন্য কিছু তাগিদ এসে হাজির হয়। প্রতিনিয়ত সেই লেনদেনের সূচি প্রলম্বিত হতেই থাকে। কেননা শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্যই বেঁচে থাকা নয়। কতগুলো প্রতিক্রিয়ার মধ্যে গিয়ে বেঁচে থাকার পথ সুগম করে নিতে হয়। ক্রমে ক্রমে সেই পথেরও দিক গতি রূপান্তরিত হতে থাকে। দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে তাই কোন নিয়ম সঠিক সংজ্ঞায় আটকে থাকতে পারে না।

ব্যবসা বাণিজ্য রুজি রোজগার বাজার মানুষের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই কলকাতায় বসবাস শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রাদির লেন দেন করার নতুন জায়গার সূত্রপাত ঘটে। খুব স্বাভাবিক ভাবে সেই জায়গার অর্থাৎ বাজারের আকৃতি তৈরি হয়। প্রকৃতি : মানুষ এবং সমাজের প্রতিচ্ছায়ায় লালিত।

কলকাতার অন্যান্য আর সবকিছুর মত বাজার তার ইতিহাস নিয়ে এগিয়ে এসেছে। শুধুমাত্র আসা যাওয়া এবং কেনা বেচাই নয়। তৈরি হয়েছে সম্পর্ক। ক্ষমতার বড়াই এবং প্রাধান্য দেখানোর ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া। ইতিহাস সব কিছুরই সাক্ষী। তাই আতিপাতি করে বাজার হাতড়ালে দোকান পাট জিনিসপত্রের খবর যেমন পাওয়া যাবে তেমনি পাওয়া যাবে তখনকার সমাজ ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি।

মানুষ সমাজবদ্ধ। তাই মানুষের অতীতকে আশ্রয় করে যে সমস্ত তথ্যনিষ্ঠ ঘটনা ক্রমে ক্রমে পুঞ্জিভূত হয়েছে, সত্যিকারের ইতিহাস সেটাই। শুধুমাত্র রাজ্যবিস্তার, শাসন কিংবা দেশ সম্পর্কিত অন্যান্য ঘটনা ইতিহাসের বিষয় নয়। দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনা জীবন ধারণের জন্য ছোটখাটো বিষয় নিয়ে ইতিহাসের সূচী গ্রথিত।

কলকাতায় মানুষ জন আসে। ধীরে ধীরে বসবাস শুরু হয়। জন বসতির ঘনত্বে এবং বিভিন্ন কার্য কর্মের ব্যস্ততায় জন্ম নেয় শহর কলকাতা। যতদিন যেতে থাকে জীবন যাপনের পদ্ধতি দ্রুততর হতে থাকে। সেই যাত্রার গতি এখনো ক্রমবর্দ্ধমান। আমরা এই সবকিছুর সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলতে চেষ্টা করছি মাত্র। বিশেষ বিশেষ ঘটনা তার তথ্যের সূত্র রেখে ইতিহাস হয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। আমরা একের সঙ্গে অন্য, সূত্রের সঙ্গে সম্ভাবনা মিলিয়ে যেন নতুন কিছু উদ্ভাবনের আনন্দ পাই।

প্রাচীন কলকাতায় শেঠ এবং বসাকরাই প্রথম হাট স্থাপন করেন। চণ্ডী কাব্যের বর্ণনায় পাওয়া যায়, কলকাতার তখনকার হাটগুলো থেকেই হয়তো ভবিষ্যতে সুতালুটি হাটখোলা বা সুতালুটি হাটতলা দাঁড়িয়েছে। সেই সময়ের হাট মোটেও পাকাপোক্ত ছিল না। তাই অনেক খোলা জায়গা নিয়ে বসতো হাট। সেই জন্যই সম্ভবত খোলা হাট কথাটা এসেছে এবং সেই শব্দ থেকে ক্রমে ক্রমে দাঁড়িয়েছে হাটখোলায়।

দেশি চরকায় ও কাটনায় কাটা মিহি ও মোটা সূতা এই হাটে বিক্রী হতো। বিক্রি হতো হাটে সূতার লুটি। কেউ কেউ মনে করেন সেই জন্যই এই হাটের নাম দাঁড়ায় সুতালুটির হাট।

এছাড়া অনেকের ধারণা সাবর্ণদের শ্যামরায় ঠাকুর সেই পুরাকালের জঙ্গল বেষ্টিত প্রাচীন কলকাতার মধ্যে খুব নামজাদা বিগ্রহ। সাবর্ণ মহাশয়দের দানধ্যান করার ব্যাপারে যথেষ্ট নাম ছিলো। এক চন্দ্রাতপের (ছত্র বা ছায়াপ্রদানকারী আবরণ) নিচে তাঁদের ঠাকুরের ভোগ বিতরণ করা হতো। প্রসাদ গ্রহণ করার জন্য দূর দূরান্ত থেকে মানুষজন হাজির হতো সেখানে।



ছত্র বা চন্দ্রাতপের নিচে এই লুট বা প্রসাদ বিতরণ করা হতো বলে সেই স্থানের নাম দাঁড়ায় ছত্রলুট। ক্রমে ক্রমে এই ছত্রলুট অপভ্রংশ হয়ে সুতালুটিতে দাঁড়ায়। অবশ্য ইংরেজদের সেরেস্তায় ছত্রলুট নামের উল্লেখ পাওয়া যায়না, রয়েছে সুতালুটি। এ জায়গা থেকে তখন ইংরেজরা যে সমস্ত চিঠিপত্র বিলাতে পাঠাতেন, সেই সমস্ত চিঠিতে উল্লেখ থাকতো— পাঠানো হচ্ছে সুতালুটি থেকে। জোব চার্ণকের কলকাতা প্রতিষ্ঠায় দু বছর আগে এবং পরে দু'খানা বই প্রকাশিত হয় সুতালুটি ডায়ারি [১৬৮৮] ও সুতালুটি কন্সলটেন্স [১৬৯০]। এই গ্রন্থের কোথাও কলকাতা নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। সর্বত্রই জায়গার পরিচিতি রয়েছে সুতালুটি।

সাবর্ণ মহাশয়দের শ্যামরায়জীউর উৎসব উপলক্ষে সাময়িক অনেক হাট বাজার ও মেলা অনুষ্ঠান হতো। তাঁদের শ্যামরায় বিগ্রহের দোলযাত্রা উপলক্ষে বিরাট মেলা লালদীঘিতে বসতো। সম্ভবত এই উৎসব ক্ষেত্রের জন্য পাশাপাশি জায়গাগুলোর নাম হয়েছে লালদীঘি, রাধাবাজার, লালবাজার ইত্যাদি। হাটতলা থেকে হাটখোলা বা বড়বাজার। অনুমান করা হত বুড়া বাজার বা বুড়ো শিবের বাজার এর উৎস।

হরিসাধন মুখোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থ 'কলিকাতা সেকালের ও একালের' মধ্যে উল্লেখ করেছেন ঃ সুতালুটি অঞ্চলে অর্থাৎ বর্তমান বড়বাজারের দিকে লোকসংখ্যা কিছু বেশী ছিল। দেশীয় অধিবাসীরা এই সময়ে জাহ্নবীতীরবর্তী এই সুতালুটিতে জমি জমা করিয়া লয়েন। সুতালুটির প্রান্তবর্তী ঘাটসমূহে দেশীয় নৌকাগুলি তাহাদের মালপত্র নামাইত। আজকাল বড়বাজারে যে স্থানে নঙ্গরেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত, ইহার নিকটেই দেশীয় ব্যবসায়ীদের মালপত্র নামাইবার একটি ঘাট ছিল। মহাজনেরা এই ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া সর্বপ্রথম নঙ্গরেশ্বর শিবের পূজা করিতেন। ইংরাজদের প্রথম আমলে এই বড়বাজার 'গ্রেট বাজার' [Great Bazar] বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। নবাব মুরশিদকুলি খাঁর আমলে ও রোটেসন গর্বনমেন্টের সময়ে বড়বাজারের দিকে দেশীয় অধিবাসীর সংখ্যা বড়ই বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

১৫২০ থেকে ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে সম্ভবত শেঠ বসাকরা গোবিন্দপুর আসেন। তারা এসেছিলেন বলেই বর্তমান কলকাতাকে আমরা দেখতে পাই প্রাসাদময়ী রূপে। এই সময়ের সূক্ষ্ম সূত্র শিল্প ছিলো বাঙালার গৌরব। ইউরোপের অনেক সম্রাজ্ঞী, ভারতের মোগল বাদশাহদের পাটরাণীগণ, বেগমগণ, এই ঢাকাই-মসলিন পাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতেন। ঢাকার দশ বারো ক্রোশ উত্তর পূর্বে ডুমরাও নামের স্থান ছিল সূক্ষ্ম সূত্র শিল্পের জন্য বিখ্যাত। ভাগীরথীর একদিকে সুতালুটির সূতার ব্যবসা ও অপরদিকে বেতোড়ের হাট। এই দুই হাটের বাণিজ্যের জন্যই ভবিষ্যত কলকাতার প্রাণ প্রতিষ্ঠার বিশেষ সহায়তা হয়েছিলো। জঙ্গলে ভরা গোবিন্দপুর একটি ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত হয় শেঠ ও বসাকদের আগমনে।

বসাক বা বাসুকদের আদি বাসস্থান সপ্তগ্রাম। সপ্তগ্রামে বাস করার সময় তাদের উপাধি ছিল বসক। বসক শব্দের অর্থ ধন সম্পত্তি বা কর ও রাজস্ব। কলকাতায় আসার পর পরিবর্তন হয়ে দাঁড়ায় বসাক। এই বসাকদের মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠী বা শেঠ এক সম্প্রদায় আছে। শেঠরাও প্রায় একই সময় সপ্তগ্রাম ছেড়ে কলকাতায় গোবিন্দপুরে এসে বসবাস শুরু করেন। আকবরের রাজত্বকালে উচ্চপদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ বুসাখ উপাধি লাভ করতেন। বুসাখ পারসী শব্দ। বু অর্থ সৌরভ, সাখ অর্থ শাখা; অর্থাৎ মোঘল সাম্রাজ্যের সৌরভময় শাখা। প্রাচীন বুসাখ উপাধি মধ্যযুগে বসাখ এবং বর্তমানে বসাক নামে পরিচিত [কলিকাতার তন্তু বণিক

জাতির ইতিহাস ঃ নগেন্দ্রনাথ শেঠ ]

১৫৬৫ সাল পর্যন্ত সপ্তগ্রাম জমজমাট ছিলো। তখন বঙ্গদেশের বাণিজ্যস্থান ছিল পূর্বে চট্টগ্রাম এবং পশ্চিমে সপ্তগ্রাম। সরস্বতী নদী মজে যাওয়ার জন্য হঠাৎ করে জমজমাট সপ্তগ্রামের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে দাঁড়ায়। ব্যবসা বাণিজ্যে ভাঁটা পড়লে সেই জায়গার মাটি কামড়ে পড়ে থাকার কোন অর্থই হয়না। অতএব শেঠ ও বসাকদের নতুন জায়গার সন্ধানে ঘুরতে হয়। শেষে সপ্তগ্রাম পরিত্যাগ করে খ্রীষ্টিয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে গোবিন্দপুরে বাস করতে আসেন।

যতদিন যেতে থাকে ততই গোবিন্দপুর গ্রাম জাঁকজমকপূর্ণ হয়ে ওঠে। অনেক পদস্থ ঐশ্বর্যবান বাঙালি এখানে বসবাস করতে শুরু করেছেন। গোবিন্দপুরের আশেপাশের জঙ্গল পরিষ্কার করে সেখানে বসবাস শুরু হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ জায়গাকে বসবাস করার জন্য রাখা যায় না। কেননা ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইভের প্রস্তাবানুসারে কলকাতায় নতুন কেল্লা নির্মাণের সূচনা হয়। এটাই বর্তমান গড়ের- মাঠের কেল্লা। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয় শেষ হতে সময় লাগে ১৫ বছর। প্রথমে ভাগীরথী তীরে এই নব সংকল্পিত কেল্লার বনিয়াদ গড়ার সংকল্প ছিল। পরে সে প্রস্তাব নাকচ হলে গঙ্গাগর্ভের একটু দূরে গোবিন্দপুর গ্রামের অধিকৃত স্থানে কেল্লা তৈরি করা হয় । ফলে গোবিন্দপুরে বসবাসকারী প্রায় সবাইকে উঠে চলে যেতে হয় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে। নতুন করে জাকজমকপূর্ণ হয়ে ওঠে তালতলা, কুমারটুলি, শোভাবাজার এবং সুতালুটি।

এরপর থেকে শেঠ বসাকদের নতুন ঠিকানা হয় সুতালুটি। সেই সময় বেতাকীর খালের দুর্দশা দেখা দেয়। অতএব বেতোড়ের হাটের গুরুত্ব আর থাকে না। প্রাণ প্রতিষ্ঠা পায় কলকাতার হাট। জন্ম নেয় সুতালুটি হাটখোলা — আজকের বড়বাজার।

The foreign Market attracted native traders and merchants to the spot and in particular from families of Bysacks and one of Setts, leaving the then rapidly declining city of Satgong came and founded the settlement of Govindpur and Established Suttnutai market on the north side of Calcutta.

— *Wilson Early Annals. Voi -1*

জনপ্রবাদ আছে শেঠদের প্রতিষ্ঠিত কুলদেবতা গোবিন্দজীর নাম থেকে গোবিন্দপুর গ্রামের নামকরণ। এই মূর্তি স্থাপনায় প্রধান উদ্যোগী ছিলেন মুকুন্দরাম বসাক। মুকুন্দরামের উপাধি শেঠ। গোত্র মৌদ্গল্য। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের আমলে কোম্পানি বাহাদুর গোবিন্দপুর থেকে লোকের বসবাস উঠিয়ে দিলে একই বংশের বৈষ্ণবচরণ সে জায়গা থেকে গোবিন্দজীকে উঠিয়ে এনে বড়বাজারে নিজের বাড়ির উত্তরে স্থাপন করেন। সেই সময় থেকে গোবিন্দজী আজো একই স্থানে বর্তমান। টাঁকশালের দক্ষিণ পূর্বে বড়বাজারে যাওয়ার পূব দিকে তাঁর মন্দির আজও রয়েছে।

মুকুন্দরামের বংশধর বৈষ্ণবচরণ শেঠ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি ব্যবসা করে প্রচুর ধন সঞ্চয় করেন। ধর্মে ভক্তি ছিলো যথেষ্ট। বৈষ্ণবচরণের ধর্মভীরুতা সম্পর্কে একটি গল্প প্রচলিত আছে। লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন — এই প্রবাদ বাক্যের গৌরী সেন ব্যবসা সূত্রে



বৈষ্ণবচরণের অংশীদার ছিলেন। বৈষ্ণব শেঠ এক সময় কিছু দস্তা কেনেন। কিন্তু পরীক্ষায় জানা যায় দস্তার মধ্যে রূপার অংশ কিছু বেশী। কর্তব্যপরায়ণ বৈষ্ণবচরণ ঠিক করলেন বিক্রয়ের সমস্ত টাকা গৌরী সেনকে দিয়ে দেবেন। এই টাকা পেয়ে গৌরী সেন ভীষণ ধনী হয়ে ওঠেন। তাঁর এই বিপুল সম্পত্তি দানখয়রাতে ব্যয় করতেন। সবারই জন্য গৌরী সেনের দুয়ার খোলা ছিলো। সেই থেকেই লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন — এই প্রবাদ বাক্যের উৎপত্তি।

## বিদেশী বণিক

প্রাচীন ইতিহাসে সূত্র পাওয়া যায় একজন গ্রীক খ্রীঃ পূঃ ৫৫০ অব্দে সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে আসেন। তাঁর নাম সিলাক্স [Scylax] । সেই সময় পারস্যর অধিপতি ছিলেন সম্রাট দরায়ুস। তিনি সিন্ধুনদীর তীরভূমিতে অবস্থিত জনপদগুলো সম্পর্কে জানবার জন্য সিলাক্সকে ভারতবর্ষে পাঠান। সিলাক্সের লেখা সেই তথ্য ও বৃত্তান্ত পড়ে অনেক গ্রীসীয়দের ভারত ভ্রমণের আকাঙ্খা জাগে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হেরোডটাসের গ্রন্থ। তিনি ভারতবর্ষ সম্পর্কে বহু তথ্য পরিবেশন করেছেন। কিন্তু তিনি নিজে কখনো ভারতবর্ষে আসেন নি। খ্রীঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে সুপ্রসিদ্ধ সেকেন্দার সাহ [আলেকজান্দার ] তার রাজ্য বিস্তারের জন্য ভারতবর্ষে এসে পৌছান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কয়েকজন প্রথিতযশা লেখক । তাদের লেখায় প্রকাশ পেয়েছে ভারতের ঐশ্বর্য এবং সম্পদের কথা।

মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে সেই সময়ের ইউরোপবাসী ভারতবর্ষ সম্পর্কে আরো বেশি জানতে পারেন। মেগাস্থিনিস মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্রে খ্রীঃ পূঃ ৩০৪ থেকে খ্রীঃ পূঃ ২৯৯ পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন। প্রথম পর্যায়ে তিনি ছিলেন সেলুকাসের দূত। তাঁর লেখা বিবরণ থেকে জানতে পারা যায় সেই সময় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব কেমন ছিল। পরিবেশ মানুষজন এবং তাদের অবস্থা। দেশে পুলিশি ব্যবস্থার প্রশংসা করে বলেছেন, খুবই প্রশংসনীয় ছিল তখনকার দেশের অবস্থা।

ভারতবর্ষে বাণিজ্য করার জন্য প্রথম প্রবেশ করে পর্তুগীজ। ভারতের পশ্চিম উপকূলে তাদের উপনিবেশ স্থাপিত হয় ১৪৯৮ খ্রীঃ ২২মে। ভাস্কো ডি গামা নামে একজন পর্তুগীজ নাবিক উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে নানারকম বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে কালিকটে এসে উপস্থিত হন। সেই সময় কালিকটে জামোরিণ নামে এক ক্ষমতা সম্পন্ন রাজা ছিলেন। পর্তুগীজরা তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে নিজেদের আশ্রয় স্থান করে নিতে পেরেছিলেন। এবং পরে পরে ব্যবসায় নিজেদের যুক্ত করে প্রচুর ধন সম্পদের অধিকারী হন।

সমস্ত ইউরোপ ভারত থেকে ফিরে যাওয়া পর্তুগীজ নাবিকদের দেখে বিস্মিত এবং অভিভূত। ভারতের ঐশ্বর্য এবং সম্পদ ইউরোপবাসীদের মুগ্ধ করে দিলো। এত সহজে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য করে ধনশালী হওয়া যায়— এটা ভেবে তারা অবাক হলো যেমনি, তেমনি উদগ্র বাসনা তাদের লোলুপ করে তুললো। যেমনি করেই হোক তাদের এই ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে সামিল হতে হবে। পর্তুগীজদের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষে যাতায়াত শুরু করলো ফরাসী, দিনেমার, আর্মেনিয়ান, ওলন্দাজ এবং ইংরেজরা।

১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পর্তুগীজরা ভারতের বিভিন্ন বন্দর থেকে মাল সংগ্রহ করে ইউরোপে চালান দিতেন। পর্তুগালের লিসবন শহর ভারতীয় জিনিসপত্রাদি বিক্রীর সেই সময় প্রধান কেন্দ্র ছিলো। এরপর পিড্রো এলভারেজ ক্যাব্রাল একজন পর্তুগীজ ব্যবসায়ী ভারতবর্ষের কালিকটে প্রথম কারখানা বা বাণিজ্য নিবাস রক্ষার জন্য একটি ক্ষুদ্র দুর্গ নির্মাণ করেন। ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের এটাই প্রথম দুর্গ। ১৬৮৮ পর্যন্ত ভারতের পশ্চিম উপকূলের প্রধান প্রধান বন্দরে পর্তুগীজদের আধিপত্য ছিল সবচেয়ে বেশি। তারপর থেকে আবার পর্তুগীজদের শক্তি আস্তে আস্তে কমে যেতে থাকে।

১৫৮০ খ্রীঃ স্পেন ও পর্তুগালে একজন রাজা হন। দিনেমাররা সেই সময় এক স্বাধীন জাতি। তাই তারাও তখন নিজস্ব বাণিজ্য ক্ষেত্র তৈরি করার জন্য ভারতের দিকে পা বাড়ায়। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ায় পর্তুগীজ। সমস্ত বাধা অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত ১৫৯৮ খ্রীঃ ভারতের উপকূলে বাণিজ্য শুরু করতে পারে। এই সময় মোগল সম্রাটদের কঠোর শাসনে পর্তুগীজরা নাজেহাল হয়ে পড়ছিলো। তাই সুযোগ বুঝে দিনেমাররা ভারতের পশ্চিম উপকূল ত্যাগ করে পূর্ব উপকূলের দিকে এগিয়ে আসে এবং বাণিজ্যের বিস্তার বাড়ায়।

সপ্তদশ শতাব্দী। সম্রাট শাহজাহানের কাল। প্রসিদ্ধ ফরাসী ভ্রমণকারী ফ্র্যাঙ্কস বার্ণিয়ার সেই সময় এদেশে এসেছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন ছিলেন এদেশে। তার বর্ণনা থেকে জানতে পারা যায়, দিনেমারদের বঙ্গদেশ, পাটনা, সুরাট প্রভৃতি স্থানে ছোট ছোট বাণিজ্যকুঠি ছিলো। আগ্রা শহরে তৈরি করেছিলো একটি ফ্যাক্টরি। পর্তুগীজদের পর দিনেমাররা একরকম ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

এ দেশে বাণিজ্য করার জন্য পর্তুগীজ ও দিনেমারদের পর ইংরেজ ও ফরাসীরা আসেন। ইংরেজরা এদেশে আসার আগে এক বণিক সমিতি সংগঠন করেন। সেই সমিতির নাম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। যার সম্পূর্ণ নাম The Company of Merchants of London Trading in to the East Indies. সমিতি প্রথম সনদ লাভ করে, ১৬০০ খ্রীঃ ৩১ ডিসেম্বর। তখন ইংল্যাণ্ডের রাণী প্রথম এলিজাবেথ। এই কোম্পানির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় এলডারম্যান গর্ডাড নামে এক ইংরেজের বাড়িতে। বহুদিন পর্যন্ত লন্ডন শহরের এই বাড়িটি Founders Hall নামে পরিচিত ছিলো।

ইংল্যান্ডেশ্বরীর কোম্পানির সঙ্গে সনদের অন্যান্য শর্তগুলোর মধ্যে প্রধান ছিলো কোম্পানি ইচ্ছে করলে প্রাচ্যদেশে ভূমিক্রয় বা অন্য কোন কায়েমি বন্দোবস্ত জমি দখল করে বাণিজ্য ব্যবসায় কুঠি স্থাপন করতে পারবেন। বাণিজ্যাধিকার এই কোম্পানিকে দেওয়া হয় পনেরো বছরের জন্য।

সংস্থা এবং কিছু কিছু সূত্রের সিদ্ধান্ত নিয়ে কোম্পানি তার কাজ চালিয়ে যেতে শুরু করলো। শুধু মাত্র ভারতে আসার জন্য পথ আবিষ্কার করতে তাদের অর্ধ শতাব্দী অতিক্রম হয়ে যায়। বেশিরভাগ চেষ্টাই চলতে থাকে জলপথে কিন্তু তার মধ্যেও ব্যতিক্রম দেখা যায়। তখন ভারতবর্ষে আকবরের রাজত্বকাল। একজন ইংরেজ সওদাগর নাম জন মেইডনহল ১৫৯৯ খ্রীঃ আকবরের সভায় এসে উপস্থিত হন। তিনি স্থলপথে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। সম্রাটের কাছ থেকে বাণিজ্য করার ফরমান পেয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা জন মেইডনহল দেশে ফিরে যেয়ে পুনরায় ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ



করেন ভারতবর্ষের মাটিতে — আগ্রায়।

মোটামুটি ভাবে বলা যায় বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আমল থেকে ইংরাজদের ভারতবর্ষে ব্যবসা বাণিজ্য করার সুযোগ সুবিধা প্রতিষ্ঠা পায়। সুযোগ সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও পর্তুগীজরা প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। প্রতি পদক্ষেপে ইংরেজদের প্রতিযোগিতার সম্মুখিন হতে হয়। এরই মধ্যে ১৬১১ খ্রীঃ সুরাটে তারা বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেন। ভারতবর্ষের মাটিতে এটি ইংরেজদের প্রথম বাণিজ্যকুঠি।

বাণিজ্য কার্য ঠিক সে ভাবে পশ্চিম উপকূলে সুবিধা করতে না পারায় ইংরেজরা পূর্ব উপকূলে জায়গার সন্ধান করে কিনে নিলেন। এই ভূমিখণ্ড চন্দ্রগিরির রাজার অধীন। জমির মাপ ছ' মাইল দীর্ঘ এক মাইল প্রশস্থ। ১৬৩৯ খ্রীঃ মূল্য লেগেছিলো বাৎসরিক ছ'শো পাউণ্ড বা ন' হাজার টাকা। এই বছরটি ইংরেজদের কাছে খুবই স্মরণীয়। ভারতবর্ষের মাটিতে প্রথম দুর্গ নির্মিত হয়। জমি ইজারা দেওয়ার সময় চন্দ্রগিরির রাজা শ্রীরঙ্গ স্বত্ব রেখেছিলেন। এখানে যে বন্দর হবে তাঁর নাম অনুসারে হবে শ্রীরঙ্গরাজ পত্তনম। পরে এ জায়গা চিঙ্গলপুরের নায়ক রাজার অধীনে আসে। তাঁর আদেশে বন্দরের নামকরণ হয় চিনাপত্তন। এই চিনাপত্তনই বর্তমান তামিলনাড়ু নগরী।

ভারতের পশ্চিম উপকূল থেকে পূর্ব উপকূল পর্যন্ত ক্রমে ক্রমে কোম্পানির ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি হতে থাকলো। যদিও সব সময়েই পর্তুগীজদের প্রতিদ্বন্দ্বীতা ছিলো। তবু পর্তুগীজরা শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেনি।

ইংরেজরা বঙ্গদেশে প্রবেশ করার আগে গঙ্গানদীর উপকূলবর্তী স্থানে বাণিজ্য করা যায় কি না দেখার জন্য ভাবনা চিন্তা চালিয়ে যেতে লাগলেন। সিদ্ধান্ত নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তালিম শুরু।

ওঁরা এসে পৌঁছলেন উড়িষ্যার হরিহরপুরে। ছোট্ট শহর। কিন্তু জাঁকালো। অনেক মানুষজন এখানে বসবাস করে। ব্যবসায়ী রয়েছে প্রচুর। বাজারে বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র পাওয়া যায়। শহরে প্রায় হাজার তিনেক তাঁতি বাস করে। তাই বস্ত্রের সম্ভারের কোন ঘাটতি ছিলনা। তবুও শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের উড়িষ্যায় বাণিজ্য করার অবস্থা রইলো না।

কারণগুলোর মধ্যে প্রধান হলো, শরীর অসুস্থ হয়ে যাওয়া। হরিহরপুর, যে নদীর তীরে অবস্থিত সে জায়গায় ক্রমশ চড় পড়তে শুরু করে। এ ছাড়াও পর্তুগীজ ও দিনেমারদের লুঠতরাজ অন্যতম প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

নানারকম অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষেরা স্থির করলেন করমণ্ডল উপকূল ও উড়িষ্যার বাণিজ্যের ওপর নির্ভর না করে বঙ্গদেশে বাণিজ্য করার ব্যাপারে আগ্রহী হওয়া ভাল। সেই সময় বঙ্গদেশের প্রধান লাভজনক বাণিজ্য দ্রব্য সোরা, চিনি ও রেশম। এই ব্যবসায় দিনেমাররা প্রভূত লাভবান হচ্ছে — এ খবর ইংরেজদের কাছে পৌঁছনো মাত্র বঙ্গদেশে বাণিজ্য করার সিদ্ধান্ত আরো প্রবল হয়ে দাঁড়ায়। বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের অনুমতি গ্রহণের ব্যবস্থা হয়। The most important of these was nishan or sealed permit granted in 1651 by prince Shuja, The Governor of Bengal, by which the English were permitted to have freedom of trade in Bengal without any custom duties and

without any restriction in return for an annual payment of Rs. 3,000 only

*— East India Company and Economy of Bengal*
*By S. Bhattacharya*

নতুনভাবে বাণিজ্যের কথা ভেবে ইংরেজরা কুঠি স্থাপন করেন বালেশ্বর, হুগলী, কাশিমবাজার এবং পাটনায়। পরে এই কাশিমবাজারে কুঠির চতুর্থ সহকারীরূপে নিযুক্ত হন কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা — জোব চার্ণক। সেই সময় কাশিমবাজার ছিল এক ছোট শহর। কিন্তু বাণিজ্যের ব্যাপারে ছিল এক অন্যতম স্থান। বিশেষ করে রেশম। কাশিমবাজারের রেশম ছিল হরিদ্রাবর্ণের, প্যালেস্টাইনের শ্রেষ্ঠ রেশমের কাছাকাছি।

১৬৭৫ খ্রীঃ পর থেকে ইংরেজদের বাণিজ্যের মোড় ঘুরে যায়। তখন বাঙলা থেকে রপ্তানি হতো রেশম, বাফ্‌তা, সোরা, সাদা চিনি, সূতা, হলুদ, মোম ইত্যাদি জিনিস পত্রাদি। এই সময় কোম্পানি জিনিস বেচে ভীষণ ভাবে লাভবান হয়। ১৬৮০ খ্রীঃ কাগজ পত্রে হিসাব দেখে জানা যায় কিছু দিনের মধ্যে এখানকার ইংরেজ বণিকদের হাতে মূলধন দাঁড়ায় দেড় লক্ষ টাকা।

সেই সময় ইংরেজদের বাণিজ্য জাহাজগুলো বালেশ্বর পর্যন্ত আসতো। ভাগীরথী দিয়ে হুগলী প্রভৃতি স্থানে প্রবেশ করতো না কিংবা বলা যায় ভয়ে তারা ওপথ দিয়ে আসতেন না। কিন্তু সে ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে ১৬৭৯ খ্রীঃ ইংরেজদের প্রথম বাণিজ্য জাহাজ ফ্যাকন হুগলীতে ত্রসে উপস্থিত হয়। স্ট্যাফোর্ড ছিলেন জাহাজের প্রধান অধ্যক্ষ। সে সময় গার্ডেনরীচ বা মেটিয়াবুরুজে জাহাজ নোঙর করার বিশেষ সুবিধা ছিলো।

কোম্পানি এদেশের নানা জায়গায় বাণিজ্যাগার স্থাপন করে পুরোদমে তাদের ব্যবসা চালিয়ে যেতে থাকেন। এদেশের মাল কিনে বিদেশের বন্দরে চালান এবং ও দেশ থেকে মালামাল রপ্তানি করে এখানে বিক্রী করার ব্যবস্থা করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এই ব্যবসা দিনে দিনে তাদের উত্তরণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে।

প্রথম প্রথম দেশীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ভাষা একটি সমস্যা ছিলো। কিছু দালালের মধ্যস্থতায় তারা কাজ চালাতেন। দেশীয় দালালরা মাত্র গোটাকতক শব্দ জানতো। তা দিয়েই তারা কোনরকমে কাজ চালিয়ে নিতো। দালালরা গ্রামে গঞ্জে ঘুরে নিয়ে আসতো মালপত্রের সন্ধান। দালালদের নির্দিষ্ট কোন মাসহারা ছিল না। ক্রয় এবং বিক্রয়ের ওপর তাদের কমিশন ধার্য ছিলো শতকরা তিন টাকা।

ইংরেজ বণিকদের বাণিজ্য করার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলতে হতো। কর্মচারীদের সংযত রাখবার জন্য বিভিন্ন ধরনের কঠোর বিধান প্রচলিত ছিলো। ফ্যাক্টারির ভেতরের কোন কর্মচারী কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি ছাড়া রাতে বাইরে থাকার অনুমতি পেতোনা। অফিসের সময় সকালে নির্ধারিত ছিলো ন'টা থেকে বারোটা এবং বিকেলে চারটা পর্যন্ত। ফ্যাক্টারির বড় কর্তা এবং তাঁর সহকারি শুধুমাত্র পালকি ব্যবহার করতে পারতেন। পাদরী সাহেবদের কেবলমাত্র ছাতা ব্যবহারের ক্ষমতা ছিলো। তাদের মাথায় ছাতা যারা ধরতো তাদের বলা হতো ছাতা বরদার। বঙ্গদেশে প্রথম পাদরী আসেন ১৬৭৮ খ্রীঃ। ইনি কোম্পানির নিয়োজিত ছিলেন। নাম জন ঈভান্স। কোম্পানির আইন না মানলে তার শাস্তি



ছিলো কঠোর।

If any by these penalties will not be reclaimed their vices or any shall be found guilty of adultery, fronication, uncleanliness or any such crimes, or shall disturb the peace of the factory by quarrelling or fighting and will not be reclaimed, then they shall be sent to fort St. George, there to receive condign punishment.

*— Wilson's Early Annals*

নানা উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে ইংরেজ বণিকদের বাণিজ্য এগিয়ে চলতে থাকে। বাংলায় ১৬৮০ খ্রীঃ সম্রাট ঔরঙ্গজেব ইংরেজ বণিকদের জন্য জিজিয়া শুল্ক, নতুন ফরমান জারি করেন। ফলে ইংরেজদের বাণিজ্যে কিছু সুবিধা বাড়ে। মাত্র কিছু সময়ের জন্য। কেননা শায়েস্তা খাঁ যেদিন থেকে মোগল সম্রাটের প্রতিনিধি হয়ে বাঙলা শাসনের ভার গ্রহণ করেন, সেই সময় থেকে প্রায় ইংরেজদের সঙ্গে মনোমালিন্য চলতে থাকে।

অবশেষে নবাব এবং ইংরেজ বণিকদের সম্পর্ক চিড় ধরে যায়। চার্ণক তখন কাশিমবাজার কুঠির অধ্যক্ষ। ব্যবসায় কিছু টাকা দেনদার হওয়ার জন্য মহাজনরা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে দেয়। তার সঙ্গে রয়েছে সরকারি মদত।

কিছুদিন এভাবে থাকার পর ১৬৮৬ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে চার্ণক একরকম পালিয়ে হুগলীতে চলে আসেন। এখানে এসেও খুব সুবিধা করতে পারলেন না। ক্রমান্বয়ে এই ঝামেলা চার্ণককে প্রায় চার বছরের মত ভোগ করতে হয়। মোগল সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক কিছুতেই যেন ভাল করে তুলতে পারেন না তিনি। শেষে সুযোগ বুঝে আক্রমণ করতেও পেছপা হননা। দখল করে বসেন মোগল জাহাজ।

হুগলীর শাসনকর্তা ইংরেজদের জয়লাভে ভয় পেয়ে গেলেন। যদিও তা অত্যন্ত সাময়িক ছিলো। কেননা কিছুদিনের মধ্যেই আবার ইংরেজদের কোনঠাসা হয়ে পড়তে হয়। চার্ণক পালিয়ে এসে সুতালুটিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ জায়গায় তখন ছিল গভীর জঙ্গল। তা ছাড়াও নদীর বাঁকের এ জায়গায় সহজেই জাহাজ নোঙর করার সুবিধা ছিলো। গঙ্গার মোহনা বেশি দূরে নয় এবং জলের গভীরতা বেশি থাকার জন্য বড় বড় জাহাজের এখানে আসায় কোনো অসুবিধা ছিলো না।

সেই সময় সুতালুটিতে শেঠ ও বসাকরা হাট পত্তন করে ফেলেছেন। এই হাটে দেশী চরকায় ও কাটনায় কাটা মিহি ও মোটা সূতা বিক্রী হত তখন। তাই ভবিষ্যতের কথা ভেবে চার্ণক সুতালুটিতে কুঠি স্থাপনের কথা মনস্থ করেন। তাঁর তৃতীয়বার সুতালুটিতে আসার এই দিনটি ছিল ২৪ আগষ্ট ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দ। বার ছিল রবিবার। শুধুমাত্র বাংলাদেশই নয় সমগ্র ভারতবর্ষের পক্ষে এই দিনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

সব বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে ইংরেজ বণিকগণ নির্ভয়ে বাণিজ্য করার অনুমতি পান ঔরঙ্গজেবের কাছ থেকে। অবশ্য অনুমতির সঙ্গে কিছু শর্ত আরোপ করেছিলেন। তখন বাঙলার শাসন কর্তা ছিলেন নবাব ইব্রাহিম খাঁ। তিনি চার্ণককে অভয় দিয়েছিলেনই শুধু নয় তাঁর শাসনকালের প্রথম বছরকে স্মরণীয় করার জন্য ইংরেজ বন্দীদের মুক্তিদান করেছিলেন।

সম্রাট ঔরঙ্গজেব ফরমান জারি করেন ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারি। সেই ফরমানের

এক অংশের অনুলিপি ঃ You must understand that it has been the Good fortune of the English to repent them of their irregular past proceedings and by not being their former greatness, have by their attorneys petitioned for their lives and a pardon of their faults, which out of my extraordinary favour towards them have accordingly granted. Therefore upon receipt hereof my order, you must not create them any further trouble but let them trade in your Government as formerly and this order I expect you to see strictly observed.

— *Stewart's History of Bengal*

জোব চার্ণক সুতালুটিতে কুঠি স্থাপন করার পর পর্তুগীজ ও আর্মানীরা সুতালুটিতে আসে এবং ব্যবসা শুরু করেন। পর্তুগীজদের বাণিজ্যাগার ছিলো আলুগুদামে। আলুগুদাম, অলগোডাম [Algodam] শব্দের অপভ্রংশ। পর্তুগীজ ভাষায় এই শব্দের অর্থ তুলা। সেই সময় সুতালুটির বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে তুলা ব্যবসার পসার। সম্ভবত সে কারণেই এ জায়গায় তাদের অধিকৃত স্থানকে পর্তুগীজরা অলগোডাম নাম দিয়েছিলো। ক্রমে ক্রমে সেই জায়গার নাম দাঁড়ায় আলুগুদামে।

আর্মানীদের এ দেশে ব্যবসা শুরু হয় বহুদিন আগে। ইংরেজ কিংবা ইউরোপীয়রা বঙ্গদেশে আসার আগেই এসে হাজির হয়েছিলো তারা। অন্যান্য বিদেশীদের মত আর্মানীরা জলপথে এ দেশে আসেননি। তারা কান্দাহার ও কাবুলের পথে এসে দিল্লী, বেনারস, পাটনা এবং শেষে বঙ্গদেশে প্রবেশ করে। কেননা অনেক আগে থেকেই তারা পারস্য উপসাগরের উপকূল থেকে খোরাসানে বাণিজ্য করতে আসতো।

কাশিমবাজারে সৈদাবাদে আর্মানীদের কুঠি স্থাপিত হয় আজ থেকে প্রায় তিনশো পঁচিশ বছর আগে। কলকাতায় আর্মানীদের আনানোর প্রধান উদ্যোক্তা জোব চার্ণক। তার অনুরোধে অনেক আর্মানী চুঁচুড়া ছেড়ে কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করেন। আর্মানীরা এদেশে বহুদিন থেকে বসবাস করার জন্য এ দেশের ভাষা তাদের আয়ত্তে চলে এসেছিলো। উর্দু ও পার্শী ভাষা তারা ভালভাবেই জানতেন। ইংরেজরা তাই আর্মানীদের অনেক ক্ষেত্রেই দোভাষীর কাজে ব্যবহার করতে পারতেন। ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আর্মানীদের বিভিন্ন ব্যাপারে সুযোগ সুবিধা দেওয়ায় সচেষ্ট ছিলেন।

এখনো কলকাতায় ব্যাঙ্কশাল বা বাঁকশাল নামের রাস্তা রয়েছে। এই জায়গায় ডাচ বণিকদের কুঠি ছিলো। অনেকের অনুমান বাঁকশাল ঘাট ছিলো তাদের বাণিজ্যকুঠির প্রকৃত স্থান। ব্যাঙ্কশাল শব্দ ওলন্দাজী 'বঙ্কশাল' শব্দের অপভ্রংশ। বঙ্ক শব্দের অর্থ নদীর তীরবর্তী কুঠি। শল অর্থ কর। অর্থাৎ নদী তীরে যে জায়গার মাশুল আদায় করা হয়। ওলন্দাজরা মোগল সরকারের সঙ্গে কথা বলে ভাগীরথীর কিছু অংশ কেটে চওড়া করে নিয়েছিল চলাচলের সুবিধার জন্য। যে সমস্ত জলযান এই কাটিগঙ্গার ওপর দিয়ে যেতো তাদের জন্য মাশুল ধার্য করা হয়েছিল। মাশুল গ্রহণ করতেন হলন্ডার্স বা ওলন্দাজগণ। সম্ভবত তারই পরিবর্তে গঙ্গা কাটানোর ভার দেন তাঁরা।

পর্তুগীজরা হুগলীতে এসেছিলেন পিপলি বন্দর থেকে উচ্ছেদ হওয়ার পর। এরপর আবার



সম্রাটের অনুগ্রহভাজন হয়েছিলেন। তাই ব্যাণ্ডেল ও তার কাছাকাছি জায়গায় তাদের বসবাসের জন্য জমি দেওয়া হয়। ব্যাণ্ডেল গির্জার এক প্রস্তর ফলকে লেখা রয়েছে ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দ। হুগলীর প্রাচীন নাম গোলিন বা উগোলিন। হুগলী শব্দের উৎস এখান থেকেই। গোলীন পর্তুগীজ শব্দ। অর্থ গোলাবাড়ি।

## সুতালুটি

শেঠ বসাক, দিনেমার, আর্মানী, পর্তুগীজ, ডাচ ও ইংরেজদের সঙ্গে আরো অনেকেই এখানে বসবাস করতে শুরু করেন। জঙ্গল এবং বন বাদাড় কেটে সুতালুটি এবং গোবিন্দপুরকে বাসযোগ্য করে তোলা হয়। ক্রমে ক্রমে অধিবাসীর সংখ্যা বাড়তেই থাকে। বাসের জন্য পাকা বাড়ি তৈরি হওয়া শুরু হয়। ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি নানা বাক বিতণ্ডার পর নিজেরাই এক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। বিদেশে ব্যবসা করতে এসে নিজেদের সংযত রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন।

১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে তাই পুরানো এবং নতুন কোম্পানির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ পায়। তৈরি হয় বণিক সঙ্ঘের নতুন নামকরণ ঃ United Company of Merchants of England Trading to the East Indies. এই সময় সুতালুটিকে ঘিরে বসবাসকারীর সংখ্যা ছিলো দশ থেকে বারো হাজার। তার জন্য কোম্পানির আয়ও বৃদ্ধি পায়। এই ক্রমোন্নতি হঠাৎ করেই যেন বাধা পায়। ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাঝড়ে সবকিছু তছনছ হয়ে যায়। সম্ভবত বঙ্গদেশে এ ধরনের ঝড় আর কখনো হয়নি।

সেই ভয়ানক ঝড় নতুন তৈরি হওয়া নগরকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছিলো।

It is computed that 20000 ships, barks, sloops, boats, canoes etc. have been washed away. A prodigious quantity of cattle of all sorts, a great many tigers and Rhinoceroses were drowned and innumerable quantity of birds were sent down into the river by the storm.....

The water rose 40 feet higher than usual in the Ganges....

— *Gentlemen's Magazine 1738, Historical and Ecclesiastical sketches of Bengal*

যেভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এ জায়গার সবকিছু ভেঙে চুরে ফেলে দিয়েছিলো, তাতে যথেষ্টই কারণ ছিলো এখানে আবার নতুন ভাবে সবকিছু গড়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে কি ? কেননা কোন কিছু তৈরি হওয়ার মুখে বাদ সাধলে স্বাভাবিক ভাবে সে জায়গা থেকে সরে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঘটনা একটু অন্যরকম ঘটে যায়। " অদ্ভুত প্রতিভাবলে, ভবিষ্যৎ দৃষ্টি পরিচালিত হইয়া জোব চার্ণক ভবিষ্যৎবংশীয় ইংরাজদের ভাগ্যলক্ষ্মীকে এই সুতালুটিতেই প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান আসমুদ্রব্যাপী বৃটিশাধিকৃত ভারতবর্ষ তাঁহার এই দূরদর্শিতার ফল।"

— *কলিকাতা সেকালের ও একালের। হরিসাধন মুখোপাধ্যায়*

প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে দোষ গুণ দুই ই বর্তমান। জোব চার্ণকও ত্রুটিমুক্ত ছিলেন না। তবু একথা নিশ্চিন্তে বলা যায় সুতালুটিতে তিনি পাকাপাকিভাবে যদি উপনিবেশ স্থাপন না করতেন তাহলে এই কলকাতা — স্বপ্ন এবং কল্পনার সঙ্গে মেশামেশি হয়ে এতদূর পর্যন্ত

আসতে পারতো কিনা বলা মুশকিল।

ঝড় শেষ হওয়ার পর সুতালুটিতে নতুন করে আবার সবকিছু তৈরি করতে হয়। বাসস্থান, মালগুদাম, রান্নাঘর সবকিছু। সেই সময়টা খুবই কষ্টের মধ্যেই কাটাতে হয়েছিলো জোব চার্ণক এবং তার কোম্পানির লোকজনদের। স্থায়িভাবে কোন কিছু না করা পর্যন্ত তাঁদের দিন এ ভাবেই কাটতে থাকে।

সেই সময় কলকাতা প্রভৃতি গ্রামের জমিদার ছিলেন লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার। ইনি ছিলেন কৃষ্ণনগর রাজবংশের আদিপুরুষ ভবানন্দের গুরুপুত্র। গুরুপুত্রর দখলে ছিল সাগুয়া, খাসপুর, কলিকাতা, পাইকান, আনোয়ারপুর, হাভেলিসহর, হাতিয়াগড় প্রভৃতি গ্রাম। যেহেতু তিনি ছিলেন কালিকাদেবীর সেবায়েত তাই তিনি কলিকাতা পরগনা খাসে রেখেছিলেন। এই লক্ষ্মীকান্তই বেহালা - বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরী জমিদারদের আদি পুরুষ।

বর্তমান লালদীঘি ও তার কাছাকাছি অঞ্চলে মজুমদারদের কাছারি বাড়ি ছিল। সমস্ত অঞ্চলের মধ্যে কাছারি বাড়িটিই একমাত্র ইটের গাঁথুনি দিয়ে তৈরি। জোব চার্ণক মজুমদারদের সঙ্গে কথা বলে পাকা বাড়িতে কোম্পানির প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি এবং বহুমূল্য দ্রব্য রাখার ব্যবস্থা করেন। পরে জোব চার্ণক মজুমদারদের এই পাকা কাছারি বাড়ি কোম্পানির সেরেস্তা রাখার জন্য ভাড়া নিয়েছিলেন। এই কাছারি বাড়িই কলকাতায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম অফিস গৃহ। কলকাতার পুরনো ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ তৈরি হয় ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে। সেই সময় ভেঙ্গে ফেলা হয় কাছারি বাড়ি।

যত দিন যেতে থাকে ততই পরিবর্তন হতে থাকে পথ ঘাট। বাড়ি ঘর। বাড়তে থাকে মানুষজনের ব্যস্ততা। ক্রমে ক্রমে জঙ্গলে ঘেরা সুতালুটি পরিষ্কার হয়ে জমে উঠতে থাকে। দু' দশ ঘর করে ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাস শুরু হয়। বসাক ও শেঠরা প্রাচীন কলকাতায় এক এক করে ছড়িয়ে পড়তে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য বিস্তৃত হতে থাকে। বৈষ্ণবচরণ শেঠ সেকালের শেঠ বসাকদের মধ্যে প্রধান যশস্বী হয়ে প্রাচীন কলকাতার শ্রীবৃদ্ধি করেছিলেন। এছাড়া খিদিরপুর ভূকৈলাস রাজবংশের আদি পুরুষ, দেওয়ান গোকুল চন্দ্র ঘোষাল পুরনো বাসিন্দা। বর্তমান ভূকৈলাস রাজবংশ তাঁর জ্ঞাতি জয়নারায়ণের বংশধর। কেননা গোকুল ঘোষালের কোন বংশধর নেই। পুরনো কলকাতায় যতগুলো সুতোর হাট ছিল তার মধ্যে শোভারাম বসাকের সুতার হাটই ছিল সবার সেরা।

সেই সময়ে সাধারণ মানুষের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায় ছিল ব্যবসা ও কৃষিকার্য। চাকরির ওপর তেমন কোন লোভ ছিল না। ততদিনে ইংরেজরা তাদের প্রভাব এবং প্রতিপত্তি যথেষ্ট ভাবে প্রমাণ করতে পেরেছেন। তাই সাধারণ মানুষের আস্থা ক্রমশই বাড়তে থাকে তাঁদের ওপর। বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষজন উঠে এসে কলকাতায় বসবাস শুরু করে দেয়। ব্যবসা করে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করতে থাকে।

কিছুদিনের মধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি হয়। তাদের সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ব্যবসার ব্যাপারে তাঁরা ভীষণভাবে একনিষ্ঠ ছিলেন। ইংরেজদের প্রধান গুণ ছিল তাঁরা নিজেরা যেমন ঠকতেন না তেমনি অপরকেও ঠকাতেন না। এর পর পরই প্রায় ইংরেজরা একসঙ্গে জমিদারী স্বত্ব পান তিনখানি গ্রামের। সুতালুটি, গোবিন্দপুর এবং কোলকাতার। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা প্রজাবিলিও করে দেন। স্থির হয় প্রত্যেক প্রজাকে প্রতি



বিঘার জন্য তিন টাকা করে খাজনা দিতে হবে।

এই তিনটি গ্রামের ভাল মন্দ সবকিছু ইংরেজদের ওপর ন্যস্ত হলো। প্রজাদের উন্নতি সাধন, অভ্যন্তরীণ শাসন, কর নির্ধারণ— সেই সময় থেকে তাঁরাই কর্তা। তার জন্য অবশ্য কোম্পানিকে খাজনা দিতে হত। সেই খাজনা [প্রতি বছর বারশত টাকা] জমা পড়তো বাদশাহী খাজানখানায়।

ইংরেজদের এই ছোট জমিদারির রীতিমত একটি সেরেস্তা ছিল। সেরেস্তার যিনি প্রধান তাকে বলা হতো কালেক্টার। কলকাতার প্রথম কালেক্টার রালফ শেলডন, নিযুক্ত হন ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে। কালেক্টারের অধীনে ছিল কিছু কেরানী ও গোমস্তা।

অল্প কিছুদিনের মধ্যে প্রমাণিত হয় কোম্পানির জমিদারির আয় বৃদ্ধি হয়েছে। তাই প্রতি বছরেই কলকাতায় জন সমাগমও বাড়তে থাকে। এবং লোকবসতি যত বাড়তে থাকে কোম্পানির আয়েরও বৃদ্ধি। এক হিসাব থেকে জানা যায় ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দ এই পাঁচ বছরে কলকাতায় বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা দাঁড়ায় দ্বিগুণ। এবং পরের ৪০ বছরে সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছিলো তিনগুণ।

কোম্পানির দখলে সেই সময় জমির পরিমাপ ছিল ৫২৪৩ বিঘা। শাসনকার্যের ও রাজস্ব - বন্দোবস্তের সুবিধার জন্য কোম্পানি কলকাতাকে চার ভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন। গোবিন্দপুর, টাউন কলকাতা, সুতালুটি এবং বাজার বা বড়বাজার। এই চার ভাগের মধ্যে বড় বাজারের মাপ সবচেয়ে ছোট হলেও, লোকসংখ্যা এখানেই ছিল বেশি।

সুতালুটির ১৬৯২ বিঘা জমির মধ্যে মাত্র ১৩৪ বিঘা জমিতে বসবাসের ব্যবস্থা ছিল। বাকি জমিতে ছিল ধান চাষ এবং বাগান বাগিচা। বড়বাজারের ৪৮৮ বিঘা জমির মধ্যে ৪০০ বিঘা জমিতে বসবাসের জন্য বাড়ি ঘর তৈরি হয়েছিল। অর্থাৎ ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দেই বড়বাজার একরকম জমজমাট।

কোম্পানির সেরেস্তার খাতায় বড়বাজারে জমির পরিমাপের অনুলিপি [১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ]।

| জায়গা | কোম্পানির সেরেস্তার বানান অনুযায়ী | জমির পরিমান | |
|---|---|---|---|
| | | বিঘা | কাঠা |
| বাড়িঘর | Houses | ৪০১ | ১১ |
| কূপ ইত্যাদি | Wells | ১৫ | ৩ |
| কলা বাগান | Platains | ৭ | ৪ |
| শূন জমি বা শূন্য পড়া | Sunaporra | ৯ | ৩ |
| খাত | Ditches | ৩ | ১২ |
| বাগান | Gardens | ১৯ | ৩ |
| ফুল বাগান | Flowers | ০ | ৬ |
| কার্পাস ক্ষেত | Cotton | ০ | ৩ |
| তামাকের চাষ | Tobaco | ০ | ১১ |
| সবজী বাগান | Green Trade | ০ | ২০ |
| সরষে জমি | Sursha (Sarshya) | ০ | ১৭ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ব্রহ্মোত্তর | Bormottor | ২৬ | ৮ |
| কূপাদি | Wells | ০ | ১৩ |
| শূন্য ভূমি | Waste | ১ | ০ |
| খাত | Ditches | ১ | ৭ |
| বাগান জমি | Gardens | ০ | ১৭ |

কোম্পানি এই গ্রামগুলোর মালিকানি স্বত্ব পাননি। তাঁরা শুধুমাত্রই জমিদার হয়েছিলেন। অর্থাৎ খাজনা আদায় করা, সুশাসন এবং নগরের উন্নতি সাধনের ভার ইত্যাদি। কিন্তু বিঘা প্রতি তিন টাকা খাজনা যা ধার্য হয়েছিলো তা বাড়ানোর ক্ষমতা তাঁদের ছিল না।

বসবাসকারীর সংখ্যা যত বাড়তে থাকে সমস্যাও এসে হাজির হয় তত। মানুষজন যত্র তত্র পরিকল্পনা ছাড়া বাস করতে শুরু করে। দেখা দেয় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। তাই ১৭০৪ খ্রীস্টাব্দের কাউন্সিলের এক আদেশ প্রচারিত হয়, 'দেশীয় অধিবাসীদের অপরাধের দণ্ড স্বরূপ যে সমস্ত জরিমানা আদায় হইবে, সেই আয় হইতে শহরের মধ্যের ও আশে পাশের নর্দমা, খানা ও ডোবাসমূহ ভরাট করা যাইবে। এটাই কলকাতার প্রথম পৌর ব্যবস্থা।

নগরের পুলিসি বন্দোবস্ত শুরু হয় ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে। এই সময় চুরি ডাকাতির সংখ্যা খুবই বেড়ে যায়। ফলে কোম্পানিকে নতুন ভাবে আরও ৩১ জন পাইক বাড়িয়ে অবস্থার মোকাবিলা করতে হয়। প্রাচীন কলকাতায় পুলিসি ব্যবস্থার সূত্রপাত এভাবে ঘটে।

ক্রমে ক্রমে পরিবেশ পরিস্থিতি পাল্টাতে থাকে। মানুষের প্রয়োজনের পরিধি বাড়ে। তাই সেই পরিধি পূরণের সামাজিক দায়িত্ব বর্তে যায় আপনা আপনি। এবং তা হয়ও। বাজারে কেনা বেচা বাড়ে। পসার বিভিন্ন জায়গার বণিকদের টেনে নিয়ে আসে। চক্রাবর্তের মত পদ্ধতি বলা যায়। কেননা একটা চলে এলে অপরটা এসে হাজির হয় তার পেছন পেছন।

১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে সুতালুটির আয় ব্যয় তার হিসাব। সেই সময়ের পরিষ্কার এক চিত্রকল্প।

| আয় | | ব্যয় | |
|---|---|---|---|
| জমি ও বাটির খাজনা আদায় | ১৩৪৯. | কর্মচারীর বেতন | |
| বাঁটা | ১৩। ১৫ | শিকদার | ৩. |
| বাজারের আয় | ৬০ ।. | পাটওয়ারি | ২. |
| কয়ালের ডিউটি | ৫. | পেয়াদা (৫জন) | ১০. |
| ঐ বাঁটা | ।। | কাগজ কালি | ২/. |
| কুঠি - মাগন্ | ১৪ ।।১০ | | |
| ঐ বাঁটা | ১ ।. | | |
| ফল প্রভৃতির উপর শুল্ক | ৫।।/১৫ | | |
| জরিমানা ঋণ আদায় | ১৯. | | |
| সেলামি প্রভৃতি | ৩৬. | | |
| আসারি (আস্ওয়ারি) | * | | |
| জেলেদের নিকট হইতে আদায় | ৬।/. | | |
| বাট্টা | ।। | | |



## বাঙলার ব্যবসা বাণিজ্য

কৃষি এবং বাণিজ্য বাঙলার ধন সম্বল সংগ্রহের প্রধান উৎস। এর পরের স্থান শিল্পের। এই কৃষি ও শিল্পজাত জিনিসপত্র নিয়ে দেশে - বিদেশে ব্যবসা, ফলে দেশে ধন সম্বলের বৃদ্ধি। তথ্যের নজির মেলে বাঙলার সর্বপ্রাচীন লেখমালায়। সম্ভবত লেখমালাটি খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকের। পাওয়া যায় বগুড়া জেলার মহাস্থানে। এছাড়াও পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত বাঙলাদেশ সম্পর্কিত বহু লিপির খবর পাওয়া যায়।

শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে কার্পাস বস্ত্র রেশম বস্ত্র বাঙলার প্রধান শিল্প ছিল। সুদূর মিশর ও রোমদেশ পর্যন্ত রপ্তানি হতো। এবং যথেষ্ট পরিমাণে সমাদৃত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র অথবা চর্যগীত গ্রন্থে তার প্রমাণ মেলে।

বঙ্গে ও পুণ্ড্রে প্রাচীনকালে চার ধরনের বস্ত্র শিল্প ছিল। সেগুলো হলো দুকুল, পত্রোর্ণ, ক্ষৌম ও কার্পাসিক। প্রাচীন বাঙলার এই সম্পদের কথা গ্রীক ঐতিহাসিকরা বারবার উল্লেখ করেছেন। এই শিল্পদ্রব্যের রপ্তানির উল্লেখ পাওয়া যায় পেরিপ্লাস [Periplus] গ্রন্থে।

গঙ্গা বন্দর থেকে রপ্তানি হতো তেজপাতা, পিপ্পলি। বিশেষ করে পিপ্পলির ব্যবসায় দেশে প্রচুর অর্থাগমের উল্লেখ পাওয়া যায়। এর পরের স্থান ছিল মুক্তা। এই গাঙ্গেয় মুক্তা খুব উন্নত মানের না হলেও পশ্চিম এশিয়ায়, ইজিপ্টে, গ্রীস, রোমে রপ্তানি হতো। সবচেয়ে মূল্যবান রপ্তানি দ্রব্য ছিল গাঙ্গেয় সূক্ষ্মতম বস্ত্রসম্ভার [Gangetic muslin]।

'কৌটিল্য যে অধ্যায়ে মণিরত্নের খবর বলিতেছেন, সেই অধ্যায়ে হীরামণির উল্লেখ আছে। টীকাকার এই হীরামণির খনি কোথায় কোথায় ছিল তাহার একটি নীতিদীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন; এই তালিকার দুইটি জনপদ নিঃসন্দেহে বাঙলাদেশে; তাহাদের নাম টীকাকারের ভাষায় - পৌণ্ড্রক এবং ত্রিপুর (= ত্রিপুরা)। জৈন আচারাঙ্গ সূত্রের মতে রাঢ়দেশের দুইটি বিভাগ ছিল, বজ্রভূমি ও সুরভভূমি (= সুহ্মভূমি)। বজ্রভূমিতে খুব সম্ভব হীরার খনি ছিল; তাহা হইতেই হয়তো বজ্রভূমি নামের উৎপত্তি। আইনই আকবরী গ্রন্থে কিন্তু মদারণ বা গড়মন্দারণে এক হীরার খনির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভূমি হয়তো পশ্চিম দিকে বিহার সীমায় অবস্থিত কোখরা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জাহাঙ্গীরের আমলে কোখরায় একাধিক হীরাখনির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আর একটি আকরজ দ্রব্যের উল্লেখও অর্থশাস্ত্রে দেখা যায়। গৌড়িক নাম এক প্রকার খনিজ - রৌপ্যের নাম কৌটিল্য করিয়াছেন এবং তাহা যে গৌড়দেশোৎপন্ন, তাহাও তিনি বলিয়াছেন। টীকাকার বলিতেছেন, এই রৌপ্যের রঙ অগুরু ফুলের মতন।

.....রাঢ়দেশের জাঙ্গলখণ্ডে লৌহখনির উল্লেখ আমরা পাইতেছি।

..... লোহা গলানোর পদ্ধতিও প্রাগৈতিহাসিক।... সুবর্ণরেখার তীর ধরিয়া জামসেদপুর এবং তারপর পশ্চিমে চক্রধরপুর ছাড়াইয়া সামনেই তাম্রসমাবেশ এবং তাম্রখনিনিচয়।....'

*— বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব [ প্রথম খণ্ড ]। ডঃ নীহার রঞ্জন রায়*

বস্ত্রশিল্পের পরে উল্লেখযোগ্য ছিল চিনি, নুন, এবং মাছ। চিনি রপ্তানি করে দেশে প্রচুর অর্থাগম হতো। ত্রয়োদশ শতকে বাংলাদেশ থেকে প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ছিল চিনি ঃ উল্লেখ করেছেন মার্কো পোলো। ষোড়শ শতকের গোড়ায়ও ভারতের বিভিন্ন দেশে, সিংহলে, আরব

ও পারস্য প্রভৃতি দেশে চিনি রপ্তানি নিয়ে দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, এ সাক্ষ্য দিয়েছেন পর্তুগীজ পর্যটক বারবোসা। নুনের ব্যবসা যথেষ্ট লাভজনক ছিল, অষ্টাদশ শতকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কড়াকড়ির ব্যবস্থা দেখে সহজেই অনুমান করা যায়। ভবদেব ভট্ট নানা ধরনের মাছের কথা উল্লেখ করেছেন। এমন কি শুকনো মাছও রপ্তানি হতো - সে কথাও নথিভুক্ত রয়েছে।

বংশীদাসের মনসা মঙ্গলে ও কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায়, দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রোপকূল বয়ে বাঙালী বণিকরা গুজরাট পর্যন্ত যে বাণিজ্য সম্ভার নিয়ে যেতেন, তার মধ্যে গুয়া বা গুবাক, পান ও নারকেল উল্লেখ্য। গুয়ার [সুপারি] বদলে নিয়ে আসতেন মাণিক্য, পানের বদলে মরকত এবং নারকেলের বদলে শঙ্খ।

খ্রীষ্টপূর্ব সময় থেকে আরম্ভ করে আনুমানিক খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক পর্যন্ত ছিল বাঙলার সামুদ্রিক বাণিজ্যের স্বর্ণযুগ। পরে এ সময় আর কখনো ফিরে আসে নি। সেই সময় বাণিজ্যে মুদ্রার চল যেমন ছিল, তেমনি বিনিময় বাণিজ্যের [Trade by Barter] প্রথারও উল্লেখ পাওয়া যায়।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের শুরুতেই আরবী মুসলমানেরা সিন্ধুদেশে তাদের অধিকার বর্তায়। কিছুদিনের মধ্যে সেই অধিকার বিস্তৃতি পৌঁছায় একদিকে স্পেন এবং অন্যদিকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত এবং চীনদেশে বিস্তার করে বাণিজ্যের প্রভুত্ব। ভূমধ্যসাগর থেকে শুরু করে ভারত মহাসাগরের দক্ষিণে অবস্থিত দ্বীপগুলো পর্যন্ত এক সময় রোম ও মিশর দেশীয় বণিকদের বাণিজ্যিক প্রচ্ছায়ায় ছিল সেই অধিকার বর্তে যায় আরব বণিকদের হাতে। এর জন্য অবশ্যই সময় লেগেছিল। সপ্তম শতকের মাঝামাঝি থেকে এই বিবর্তনের সূত্রপাত এবং দ্বাদশ - ত্রয়োদশ শতকে চরম পরিণতিতে পৌঁছায়।

মুঘল আমলে প্রায় সমস্ত ভারতীয় সামুদ্রিক বাণিজ্য আরব ও পারস্য দেশীয় বণিকদের হাতে ছিল। সেই বাণিজ্যে পর পর ভাগ বসাতে আসে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী এবং শেষে আসে ইংরেজ। শুরু হয় একের পর এক সমস্যা। ধন সম্পত্তি নিয়ে যত কাড়াকাড়ি এবং মারামারি।

অষ্টম শতকের পর থেকে ভারতীয় সামুদ্রিক বহির্বাণিজ্যে বাঙলাদেশের আর কোন বিশেষ স্থান ছিল না, এবং অন্তর্বাণিজ্যে কিছু কিছু আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও বণিককূল ও ব্যবসায়ীদের সমাজে ও রাষ্ট্রে সে প্রভাব ও প্রতিপত্তি আর থাকে নি। ফলে বঙ্গীয় সমাজ ক্রমশ কৃষি নির্ভর হয়ে পড়তে বাধ্য হয়।

পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত বাঙলাদেশে আর কোথাও সামুদ্রিক বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে ওঠেনি। চর্তুদশ শতকে সরস্বতী তীরবর্তী সপ্তগ্রাম তাম্রলিপ্তের স্থান অধিকার করে নেয়। পরে অবশ্য সপ্তগ্রাম থেকেও ব্যবসা বাণিজ্য গুটিয়ে নিতে হয়। সরস্বতী নদী মজে গেলে সপ্তগ্রামের বাণিজ্য কেন্দ্রের অবলুপ্তি ঘটে। এরপর বেতর হয়ে বাণিজ্য কেন্দ্র সুতালুটিতে স্থান করে নেয়। অর্থাৎ বড়বাজারে গড়ে ওঠে বাণিজ্য কেন্দ্র।

... বাণিজ্য সম্বন্ধের উপর নির্ভর করিয়াই ক্রমে ক্রমে বাঙলা দেশের ও ভারতের অন্যান্য দেশের ধর্মসাধনা ও সংস্কৃতি ক্রমশ এই সব অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অন্যদেশে সংস্কৃতি বিস্তার এই ভাবেই হইয়া থাকে, প্রাচীন কালেও হইয়াছিল, বর্তমান কালেও হইয়াছে ও হইতেছে।



বণিকের সঙ্গে বণিকের প্রয়োজনেই ধর্ম ও পুরোহিত, তারপরেই ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে আসিয়া পড়ে সামরিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব। ....

*— বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্ব [ প্রথম খণ্ড ] ডঃ নীহাররঞ্জন রায়*

## বাজার কলিকাতা

বর্তমান বড়বাজার বলতে বোঝায় হাওড়া ব্রীজের মুখ থেকে চিৎপুর রোড পর্যন্ত সমস্ত রাস্তা এবং আশে পাশের লেন ও বাইলেন। বড়বাজার শুরু হওয়ার সময় যে পরিধি ছিল আজকের সঙ্গে তার অনেক তফাৎ। হলওয়েলের সময় একেই বলা হতো বাজার কলিকাতা।

আজকে বড়বাজারের যেমন প্রাধান্য, কোম্পানির আমলের প্রাচীন কলকাতার গৌরবের বিষয় ছিল বড়বাজার। ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দের হিসাব পত্র থেকে জানতে পারা যায় বড়বাজারের আয় যথেষ্ট বেড়েছিলো, সেই জন্য কর্মচারীর সংখ্যও বাড়াতে হয়। কোম্পানির প্রধান আয় ছিল শুল্ক। এমনকি অগ্রদানী ব্রাহ্মনদেরও তাদের ব্যবসা চালানোর জন্য শুল্ক দিতে হতো।

এ ছাড়াও জেলেদের পুকুর জমা নেওয়ার জন্য বাড়িঘর বিক্রী, বিবাহের খাতে, ক্রীতদাস ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপারে, তা ছাড়া জরিমানা বাবদ অনেক টাকা আদায় হতো। বাজার সপ্তাহে তখন দু'দিন বসতো। বৃহস্পতিবার ও রবিবার। বাজার যার নামে জমা থাকতো তিনি ব্যবসায়ী ও ব্যবসায় দ্রব্যগুলোর ওপর শুল্ক বা তোলা আদায় করতেন।

প্রধান প্রধান সেই দ্রব্যগুলোর নাম এবং ব্যবসায়ী ঃ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | কড়িবিক্রেতা | ১৯। | ধনে |
| ২। | সূতা | ২০। | চুনের দোকান |
| ৩। | ঔষধের দোকান | ২১। | তামাকের দোকান |
| ৪। | সর্ষপাদি তৈলের দোকান | ২২। | জ্বালানি কাঠের দোকান |
| ৫। | লোহা লক্কড়ের জিনিস | ২৩। | খড়- বিচালি |
| ৬। | টায়ার | ২৪। | মাদুর |
| ৭। | দুগ্ধ | ২৫। | বাঁশ |
| ৮। | তালের গুড় | ২৬। | কাংসদ্রব্য |
| ৯। | মিঠাই | ২৭। | সুপারি |
| ১০। | কামার | ২৮। | শাক সবজী |
| ১১। | স্যাকরা (রূপার জিনিস) | ২৯। | ইক্ষু |
| ১২। | পান | ৩০। | কলা |
| ১৩। | ফল মূলাদি | ৩১। | তেঁতুল |
| ১৪। | গাছ বিক্রেতা | ৩২। | মৎস - বিক্রেতা জেলে |
| ১৫। | তাঁতি | ৩৩। | সিদ্ধ চাউল |
| ১৬। | লবন | ৩৪। | কুম্ভকার |
| ১৭। | চাউল | ৩৫। | কাপড় বিক্রেত |
| ১৮। | মৃগয়ালব্ধ পশুমাংস | ৩৬। | বিনামা বিক্রেতা |

ওপরের জিনিস গুলোর শুল্ক সংগ্রহের বিষয়ে কোন নির্ধারিত নিয়ম ছিল না। দৈনিক হিসাবে ১ গণ্ডা থেকে শুরু করে ছ'পণ কড়ি পর্যন্ত এই সমস্ত দ্রব্যের ওপর শুল্ক গ্রহণ করা হতো। কোম্পানি বিভিন্ন ভাবে মাথা খাটিয়ে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে শুল্ক গ্রহণের উপায় স্থির করেছিলেন। এর একমাত্রই অর্থ কোম্পানির আয় বাড়ানো। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রজাদের সুবিধার জন্য নিয়ম বর্তেছিলেন। যেমন বৈষ্ণব ভিক্ষুকদের ভিক্ষার পরিমাণ নির্ধারণ। শ্রাদ্ধ ও ধর্মকর্মের জন্য বৃষের যোগান নির্দিষ্ট মূল্যে ইত্যাদি। বাদী- প্রতিবাদীর ওপর সমন বার করা, কোন অধমর্ণকে আটকে রাখার প্রার্থনা কিংবা কাউকে কারারুদ্ধ করে রাখার জন্য দরখাস্ত করে কোর্ট ফি দিতে হতো, এত্‌লাক বলা হতো তাকে। এত্‌লাকের জন্য কোন নির্দিষ্ট হার ছিল না।

প্রাচীন কলকাতার কাগজপত্রে কিছু ব্যবসার নাম পাওয়া যায়। এই ব্যবসাগুলোর সূত্রপাত হয় ১৭৩৮ সালে। পরপর সাল উল্লেখ করে ব্যবসার নামের তালিকা দেওয়া হলো। সেই সময়ের বাজার এবং বেচা কেনা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

| দোকান ও কারখানার নাম | | প্রতিষ্ঠার বৎসর খ্রীষ্টাব্দ |
|---|---|---|
| গ্লাস তৈয়ারির কারখানা | ঃ | ১৭৩৮ |
| সিন্দুক প্রস্তুতের কারখানা | ঃ | ১৭৩৮ |
| নারিকেল দড়ির কারখানা | ঃ | ১৭৩৮ |
| তামাকুর দোকান | ঃ | ১৭৪০ |
| ভাঙ্গের দোকান | ঃ | ১৭৩৮ |
| সিন্দুকের দোকান | ঃ | ১৭৪৮ |
| মেটে সিন্দুর, তুঁতে প্রভৃতির দোকান | ঃ | ১৭৪৮ |
| ফট্‌কিরি ও হীরাকস প্রভৃতির দোকান | ঃ | ১৭৪৬ |
| আতসবাজী নির্মাণকারকের দোকান | ঃ | ১৭৩৮ |
| চুনের দোকান | ঃ | ১৭৫২ |
| শাল ও সেগুন কাষ্ঠের দোকান | ঃ | ১৭৫২ |
| পুরাতন লোহা ও পেরেক প্রভৃতির দোকান | ঃ | ১৭৫১ |

কোম্পানি বাহাদুরের আর একটি আয়ের পথ ছিল ফারমিং লাইসেন্স [Firming License]। পলাশী যুদ্ধের দশ বছর পর অর্থাৎ ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দের একটি ফারমিং লাইসেন্স পাওয়া যায়। ততদিনে বড়বাজার ছাড়া শহরের আশে পাশে আরো বাজার প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এই বাজারের দোকান থেকে আমদানি রপ্তানি মালামাল প্রভৃতির শুল্ক বা ডিউটি আদায় করার জন্য এই বাজারগুলো সাধারণকে দেওয়া হয়। এইভাবে জমা দেওয়াকে বলা হতো তৌবাজারী। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বড়বাজারের জমা গৃহীতার নাম নবকিশোর রায়। তাঁকে বাজার জমা দেওয়ার জন্য কোম্পানিকে বাৎসরিক হারে দিতে হতো ৮০০ সিক্কা টাকা। প্রত্যেক দোকান থেকে তোলার হার ছিল ১৩ কড়া।

এখন যেখানে বড়বাজারের পান পোস্তা, রাজার চক্ এ সমস্তই তখন ছিল জলের নিচে।



হিন্দু ব্যবসায়ীরা নৌকায় মাল এনে বড়বাজারের নঙ্গরেশ্বর ঘাটে উঠতো। ঘাট থেকে মাল বাজারে এসে হাজির হত। বর্তমান কয়লাঘাট ও চাঁদপাল ঘাটের মাঝখানে একটা খাল ছিল। বড় বড় নৌকা সহজেই যেতে পারতো খাল দিয়ে। এর বিস্তৃতি ছিল ওয়েলিংটন স্কোয়ার পর্যন্ত। তারপর এই খাল বেলিয়াঘাটার মধ্য দিয়ে গিয়ে যুক্ত ছিল লবণ হ্রদের সঙ্গে।

সেই সময় ইংরেজদের বসবাস করার জায়গা ছিল লালদীঘির আশপাশ। প্রাচীন দুর্গের কাছাকাছি ইংরেজ পল্লী স্থাপিত হওয়ায় এ জায়গা ছিল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। রাস্তাঘাট তৈরি হতে শুরু হয়েছিল চলাচলের জন্য। কোন পথই পাকা ছিল না এবং প্রশস্তও নয়। যানবাহনের মধ্যে তখন শুধু ছিল পালকি।

এখন যে রাস্তাকে ক্লাইভ ষ্ট্রিট বলা হয় পৌনে তিনশ বছর আগে প্রাচীন কলকাতার সাহেবী কোয়ার্টর ছিল এ জায়গায়। এই ক্লাইভ স্ট্রীটই তখন সরাসরি গিয়েছিল বড়বাজার পর্যন্ত এবং সেই সময়ের একমাত্র প্রধান পথ বলতে এটাকেই বোঝায়। ইংরেজরা এ পথকে উল্লেখ করেছেন Road to Great Bazar বলে।

এরপর বড়বাজারের ভাগ্যে নতুন আর এক বিপত্তি এসে হাজির হয়। নবাবের আক্রমণের ফলে একরকম প্রায় তছনছ হয়ে যায় কলকাতা। ইতিহাস প্রসিদ্ধ 'অন্ধকূপ হত্যা' ঘটনা ঘটে। বিশেষ করে বড়বাজার ও লালবাজার অঞ্চলের বাড়ি ঘর দোর নবাবের সৈন্যের আক্রমণে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। তাই অনেকেই সেই সময় অঞ্চল ছেড়ে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করে। ইংরেজরা পালিয়ে যায় ফলতা অঞ্চলে। নবাব সিরাজউদ্দৌলা সেই সময় কলকাতার নাম পাল্টে দিয়েছিলেন। নাম রেখেছিলেন 'আলিনগর'।

এই নামের স্থায়ীত্ব দীর্ঘ দিনের হতে পারে নি। কলকাতা আক্রমণের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ক্লাইভ ও ওয়াটসন সদলবলে মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় এসে হাজির হন। ঘটনা পরম্পরায় পলাশী যুদ্ধের সূচনা ঘটে। ইংরেজদের বুদ্ধি এবং ক্ষমতা বলে কলিকাতা পুনঃ প্রতিষ্ঠা পায়।

"নবাব সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক কলিকাতা লুণ্ঠনের সময়ে চার্ণক প্রতিষ্ঠিত, ধীরে ধীরে নির্মিত, প্রাচীন কলিকাতার প্রায় একরূপ ধ্বংস সাধন হইয়াছিল। নবাব মীরজাফরের প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের টাকা পাইবার পর অনেকে নতুন করিয়া ঘর বাড়ি করিতে আরম্ভ করে। ক্লাইভ ও ওয়াটসন কলিকাতায় ইংরেজাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলে কলিকাতার পলায়িত অধিবাসীরা পুনরায় এই শহরে ফিরিয়া আসে। ১৭৫৭ সাল হইতে আবার নতুনভাবে কলিকাতা শহর নির্মিত হইতে আরম্ভ হয়। ধরিতে গেলে এই সময় হইতে বর্তমান কলিকাতার দ্বিতীয়বার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে"।

*— কলিকাতা সেকালের ও একালের ঃ হরিসাধন মুখোপাধ্যায়*

সতের শতক থেকে বাংলা দেশে রাজকীয় বাণিজ্যের জোয়ার আসে। সম্ভবত ভারতবর্ষের মধ্যে তখন-এ জায়গাই প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। ইউরোপীয় নৌ- শক্তির তখন প্রবল দাপট। ঐ শক্তির স্রোতে স্থানীয় অধিবাসীরা নিজেদের ভাসিয়ে দিতে পেরে যেন কৃতার্থ বোধ করতে পেরেছিলেন। অথচ সেই একই সময়ে 'গুজরাটে স্বাধীন বণিক শক্তি দাঁড়াচ্ছে, কোর মণ্ডলে যখন সরকারি সাহায্য - পুষ্ট বণিক গোষ্ঠী সমুদ্রে স্বাধীনতার লড়াই চালাচ্ছে, হুগলিতে সে সময় বাঙালি বণিক ক্রমান্বয়ে পর নির্ভর হয়ে উঠছে।... মোঘল রাজপুরুষরা সমুদ্র -

বাণিজ্য থেকে সরে দাঁড়ালেন তখন বাংলাদেশের জাহাজ বলতে প্রায় কিছুই রইল না। অল্প কয়েকটি ছোট জাহাজ মালদ্বীপে কড়ির ব্যবসায় যাতায়াত করতো কিন্তু সেই কানাকড়ির বাণিজ্য কাব্যের উপাদান নয়।'

*—বঙ্গোপসাগর। অশীন দাশগুপ্ত*

গুজরাটি বণিকদের সে সময় রমরমা অবস্থা। ইংরেজরা এখানে তখন ব্যক্তিগত ব্যবসার দিকে ঝুঁকছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় সেই সময় বাঙালি এবং বাংলাদেশের কিছু অবাঙালি ব্যবসায়ী নিজেরা তেমনভাবে ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত না হয়ে পর - নির্ভরতা বেছে নিল। অর্থাৎ ইংরেজদের ব্যবসার মধ্যস্থতা অবলম্বন। এক কথায় একে দালালি ব্যবসা বলা চলে। আঠারো শতক থেকে এই দালালি ব্যবসার প্রচলন শুরু হয় বাংলায়।

ভাবতে অবাক লাগে ষোল শতকের প্রথম প্রথম বিভিন্ন বিদেশি বন্দরে বাঙালি সওদাগররা যে ভাবে যাতায়াত করতেন ক্রমে ক্রমে সে সংখ্যা কমে এমন অবস্থায় দাঁড়ালো কি ভাবে? অথচ পর্তুগীজ টোমে পিরেজের রচনা থেকে জানতে পারি ঃ ষোল শতকের প্রথমে মালাক্কা বন্দরে বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর বেশ কয়েকটি জাহাজ আসতো। এই জাহাজ শুধুমাত্র বাঙালি সওদাগরদের ছিল তা নয়। আরব, পারস্য, গুজরাটের বণিকরাও গঙ্গার মোহনা থেকে ইরাবতী ও মালাক্কায় ব্যবসা করতেন। এবং বাঙালি বণিকরা যথেষ্ট ধনাঢ্যও ছিলেন। শুধুমাত্র বাঙালি বণিকই কেন, ভারতবর্ষের বাণিজ্যের পট পরিবর্তন হয়ে যায়। এখানকার বণিকরা তাদের পুরনো ঐতিহ্যকে সে ভাবে আর বজায় রাখতে পারেন না। এ তথ্যের বিষয়ে গবেষণা করতে যেয়ে ঐতিহাসিক জোশেফ ব্রেনিগ জানিয়েছেন, গোলকুণ্ডার সুলতান সতের শতকের ৬০ ও ৭০ দশকে ডাচ কোম্পানিকে এত বেশি বাণিজ্য সুবিধে দিয়েছিলেন তার ফলশ্রুতি হিসেবে —ভারতীয় বাণিজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে।

' বঙ্গোপসাগরের বাণিজ্যে স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণ করে নিজস্ব ব্যবসা তৈরি করার ক্ষমতা অধিকাংশ স্থানীয় বণিকের ছিল না। রাজপুরুষেরা সরে দাঁড়ালে এবং আঠার শতকের দ্বিতীয় দশকে গুজরাটিরা হটে গেলে ইংরেজ বেসরকারি ব্যবসার আকর্ষণ বাড়ালো। ..... আঠার শতকের শেষে ইংরেজ বেসরকারি বাণিজ্য যখন বঙ্গোপসাগর ও চীন সমুদ্রকে এক করল তখন বেশ কিছু ভারতীয় মানুষ মুনাফা পেলেন। জাহাজ গুনে যদি হিসাব করেন বাংলাদেশের বাণিজ্য বেড়েছিল, কমেনি। শুধু একটি পুরনো, পরিচিত চরিত্রের দেখা বিশেষ পাবেন না ঃ ভারতবর্ষের সমুদ্র বণিক।'

*— বঙ্গোপসাগর ঃ অশীন দাশগুপ্ত*

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য আর সব কিছুর মত ব্যবসা বাণিজ্যের ধরন পাল্টে যায়। মানুষের চাহিদা, তাগিদ এবং প্রয়োজন এই সব কিছু মিলিয়েই বাজার। আবার কিছু কিছু সময় প্রয়োজনের জন্য তৈরি করে নেওয়া হয়। ক্রম বিবর্তনের সঙ্গে চাওয়ার ধরন পাল্টায়। প্রয়োজনের আঙ্গিকে সংযোজন ঘটে। অবশ্য সবই প্রয়োজনের তালিকায় প্রথম পাতার সূচী নয়। আবার দৈনন্দিন জীবনের সূচীর তালিকায় হের ফেরের সম্ভাবনা কম থাকে।

বেঁচে থাকতে গেলে নিত্য নৈমিত্তিক যে জিনিসগুলোর প্রয়োজন — তার জন্য নির্দিষ্ট



একটি জায়গা স্বাভাবিক ভাবেই জন্ম নেয়। ঠিক ঠিক ভাবে কোন বাজারের জন্ম লগ্ন তিথি ক্ষণ মিলিয়ে বলা সম্ভব নয়। সময় এবং কালের আধারে ক্রমে ক্রমে তার অবস্থানের প্রকাশ হতে থাকে।

## বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য সমাজ

জেমস লঙ ছিলেন একজন সমাজ বিজ্ঞানী। মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পেরে আনন্দ পেতেন। ইংল্যান্ডের চার্চ মিশনারি সোসাইটি তাঁকে প্রচারকের পদ দিয়েছিলো। জেমস লঙ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ঘুরেছেন। ভারতবর্ষে আসেন ১৮৪০ সালে। এখানে এসে তিনি মির্জাপুরের ইংরেজি স্কুলের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

তারপর থেকে শুরু করে জেমস লঙের এদেশে সমাজ উন্নয়নমূলক নানা ধরনের ক্রিয়া কর্ম। তাঁর কাছে মানুষের ধর্ম বর্ণ সব কিছুই এক ছিল। পক্ষপাতিত্ব কিংবা কোন রকম লোভ তাঁকে বশ করতে পারেনি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি সব সময় সোচ্চার ছিলেন। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করার জন্য তাঁকে কারাগারে পর্যন্ত যেতে হয়েছিলো।

জেমস লঙ গঠন করেছিলেন মদ্যপান নিবারণী সমিতি, বেথুন সোসাইটি এবং বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য সমাজ। বড়বাজারের সাহিত্য সমাজ স্থাপিত হয় ১৮৫৭ সালে। জেমস লঙ ১৮৫৯ থেকে ১৮৬৭ পর্যন্ত 'ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাবে'র সভাপতি ছিলেন।'

এই ক্লাবের সদস্য হওয়ার জন্য বিশেষ কোন আইন ছিল না। জাতিধর্ম নির্বিশেষে যে কেউ এর সদস্য হতে পারতেন। সপ্তাহের প্রতি শুক্রবার সভা বসতো। প্রথম প্রথম এই সভায় বক্তব্য কিংবা প্রবন্ধ পাঠ ইংরেজিতে হতো। পরে এই রীতি পরিবর্তন করে দেন জেমস লঙ। তিনি ইংরেজির পরিবর্তে বাংলা প্রচলনের শুরু করেন। তাঁর মত ঃ ইংরেজিতে যতই জ্ঞান থাকুক না কেন মাতৃভাষার দক্ষতার ওপর সমাজে নিজেদের উপযোগিতা নির্ভর করে।

বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য সমাজের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হয় ১৮৬০ সালে। এই সভায় সভাপতি হিসাবে জেমস লঙ এক দীর্ঘ ভাষণ দেন। আমদের সমাজের প্রতি সেই ভাষণের গুরুত্ব যথেষ্ট। শাসকগোষ্ঠি শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করার জনাই ব্যস্ত। ভারতবর্ষের মানুষদের প্রতি তারা কোন কর্তব্যই সাধন করছে না। শিক্ষিত দেশবাসীর কাছে তাই লঙ আবেদন করেছেন তারা যেন এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

স্কুল ও কলেজ থেকে শিক্ষিত ছাত্রের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে, তুলনায় চাকরি নেই। গ্রামের শতকরা ৯৮ ভাগ মানুষ অশিক্ষিত থেকে যাচ্ছে। তাদের কাছ থেকে সুযোগ নিচ্ছে নীলকুঠির সাহেব, মহাজন ও জমিদাররা। গ্রামের দুর্দশাগ্রস্ত মানুষজন কোনভাবেই এই সমস্যা থেকে মুক্ত হতে পারছেন না।

' অশিক্ষিত ব্যক্তিদের উন্নতির সর্বাধিক প্রতিবন্ধক হল কেরাণিত্ব ও মুখস্থবিদ্যা। কারণ কৃষি বিভাগ, সংস্কৃত, সমাজবিজ্ঞান ও স্বদেশী ভাষার প্রতি অবহেলার জনাই কেরাণিদের প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই তাদের পরিবর্তে পূর্ত্ত ও শিল্প শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিদানের জন্য তিনি আবেদন করেন। কারণ কেরানিদের জন্য বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন নেই। কোন এক সময় ঐ কাজ যন্ত্রের সাহায্যে করা যাবে বলে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন। অপরদিকে অঙ্কন,

কাঠের কাজ, ছাঁচও মূর্ত্তি তৈরির দক্ষতার জরুরি প্রয়োজন আছে। বাড়ি তৈরির জন্য কলকাতায় কোন শিল্পী না থাকায় ইয়োরোপীয়দের কাছে যেতে হয় এবং তাঁরাও সুযোগ বুঝে অতিরিক্ত মজুরি দাবি করেন।

মানুষ ও প্রকৃতির বদলে শুধুমাত্র বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় শিক্ষিত জনগণ ও কেরানিদের সঙ্গে জনসাধারণের দূরত্ব ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষাই হল তাঁর মতে সব থেকে বড় শিক্ষা। অ্যারিস্টটল, কালিদাস, মহম্মদ ও অন্যান্য মহাপুরুষদের মধ্যে তার অভাব ছিল না। সরকার প্রবর্তিত শিক্ষানীতির জন্য মুখস্থ ভিত্তিক শিক্ষার বৃদ্ধি ঘটছে।'

*— সমাজ বিজ্ঞানী জেমস লঙ ঃ বিনয়ভূষণ রায়*
*এষণা শারদীয় সংখ্যা ১৩৯৭*

জেমস লঙ তাঁর ভাষণে সবাইকে জানান, সমাজ সম্পর্কে নিজেদের জ্ঞাত রাখার জন্য প্রত্যেকেরই উচিত সমাজ বিজ্ঞানের প্রতি নজর দেওয়া। তা হলেই নিজেদের অনেক সমস্যা নিজেরাই সমাধান করে উঠতে পারবেন। নিজেদের সংস্কৃতি, পুরনো সাহিত্য— এ সবের প্রতি আগ্রহবোধ অত্যন্ত জরুরি। শুধুমাত্র বিদেশী ভাষার প্রতি আগ্রহ দেখালে চলবে না। অপরদিকে নিজেদের সংস্কৃত টোলগুলোর সংখ্যা দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। যদি সংস্কৃত ভাষা তেমন মূল্যবান না হবে তাহলে ইউরোপ বা আমেরিকায় এই ভাষার প্রতি আগ্রহ বেড়ে চলেছে কেন?

ভারতবর্ষ এক বিশাল দেশ। দেশের লোক সংখ্যা পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ। বিশাল দেশের মানুষজনের জীবনধারনের পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। তাদের গার্হস্থ্য জীবন, আকাঙ্খা, আমোদ প্রমোদ ইত্যাদি সম্পর্কে খোঁজ খবর করা প্রয়োজন। বর্তমান দেশের অধিবাসী মানেই সমাজের ভিত। বিশেষ করে বিদেশীদের কাছে তাদের জীবনধারন পদ্ধতি প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

ফলে, তারা ভারতের সামাজিক উন্নতির জন্য কিছু করতে পারেনি। নিজের দেশ, নিজের সমাজ এবং এর প্রকৃত অবস্থা নির্ধারণ করে সাধারণ মানুষকে অবগত করানো প্রয়োজন। এবং এভাবে মানুষদের যত সচেতন করা যাবে দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল।

অবশ্য এ বিষয়ে কিছু বাঙালি লেখক তাদের লেখার সচেতনতা প্রকাশ করতে পেরেছেন দেখে জেমস লঙ সন্তোষ প্রকাশ করেন। সাধারণ মানুষকে সমাজ সম্পর্কে সজাগ করে তোলার এটা এক বিশেষ পদ্ধতি। যদিও এর জন্য সাক্ষর হওয়া জরুরি। সেই সময়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ নববাবু বিলাস; কাক ভুশুণ্ডির কথা, হুতোম প্যাঁচার নকশা, আপনার মুখ আপনি দেখ ইত্যাদি। প্রত্যেকটি গ্রন্থে কোন না কোন ভাবে সমাজের সাধারণ জীবন চিত্রিত।

'ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন দেশীয়দের মধ্যে বিরোধের কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, ব্রাহ্মন ও শূদ্র , জমিদার ও রায়ত, সাদা ও কালা আদমী, বাঙালি ও অবাঙালি কেউই পরস্পরকে জানে না, তাই বিরোধের উৎপত্তি। এ জন্য পরস্পরকে জানা একান্ত আবশ্যক। এ কার্যে 'গার্হস্থ্য সাহিত্য - সমাজ' প্রকৃতই সাহায্য করতে পারে। ইংরেজদের কাছে হিন্দু জীবনের তথ্য একান্তই অপরিচিত। তাঁরা নিজেরা না জানালে জানবার কোন



উপায় নেই। সমাজ বিজ্ঞান চর্চায় ও সামাজিক উন্নতির জন্য এই সকল তথ্য একান্ত আবশ্যক। লঙ - এর উপরিউক্ত বক্তৃতা শ্রোতাদের গভীরভাবে প্রভাবিত করে।'

*—সমাজ বিজ্ঞানী জেমস লঙ ঃ বিনয়ভূষণ রায়*
*এষণা শারদীয় সংখ্যা ১৩৯৭*

## বড়বাজারের সূচনায় জলপথই ছিল ভরসা

৪৮৮ বিঘা জমি নিয়ে বড়বাজারের সূচনা হয়। বলতে গেলে প্রায় শুরু থেকেই মানুষজনের নজর পড়ে এ জায়গার ওপর। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষজন উঠে এসে এখানে বসবাস করতে আরম্ভ করে। মোটামুটি একটু খতিয়ে দেখলে বোঝা যায় প্রাচীন কলকাতায় বসবাসকারীর সংখ্যা এ অঞ্চলেই সবচেয়ে বেশি ছিল এবং এখনো সেই হিসেবের অনুপাত একই ভাবে ক্রমবর্ধমান। বড়বাজার শুধুমাত্র বড়ই নয়, বৈশিষ্ট্য, প্রকরণ এবং কর্মকাণ্ডের প্রাচুর্য নিয়ে এক বিশাল বাজার।

মানুষের জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় শাক সব্জি, চাল, ডা ল, তেল থেকে শুরু করে ওষুধপত্র আসবাব, পোষাক পরিচ্ছদ, ইমারতি জিনিষপত্র, অলঙ্কার এমন কোন প্রয়োজনীয় জিনিষ নেই যা এখানে পাওয়া যায় না। যতদিন যেতে থাকে এই বাজারের একটি নির্দিষ্ট চরিত্র তৈরি হতে থাকে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে শুধু ভারতবর্ষে কেন পৃথিবীর কোথাও এরকম ব্যাপক এবং বিস্তৃত বাজার খুব কমই আছে।

প্রথম প্রথম বাজারিদের সেভাবে নির্দিষ্ট কোন জায়গা ছিল না। ক্রমে ক্রমে এর পরিবর্তন হয়। বিশেষ বিশেষ জিনিসের জন্য নির্ধারিত হতে থাকে নির্দিষ্ট জায়গা। ফলে ক্রেতা সাধারণের সুবিধা যেমন বাড়ে তেমনি বিক্রেতারাও তাদের লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারেন সহজেই। এমন কি তুলা পট্টি, সোনা পট্টি ইত্যাদি।

এর পর বাজারের [আঞ্চলিক] গড়নে পরিবর্তন আসে। জন্ম হয় 'কাটারা'র। উদ্দেশ্য, জায়গার অপ্রাচুর্যতা, এবং এক জায়গায় একই ধরনের জিনিষ পাওয়া। 'কাটরা ' হিন্দুস্থানী শব্দ। অর্থ বাজার বা মাণ্ডি। একটা প্রকাণ্ড বাড়ি যার মধ্যে রয়েছে ছোট ছোট ঘর। ব্যাপারিরা এই ঘরে বসে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য চালাতে পারেন।

সম্ভবত বড়বাজার অঞ্চলের প্রথম কাটরার নাম মনোহর দাস কাটরা। স্থাপিত হয় ১৭৫২ সালে। এখনো বড়বাজারে মনোহর দাস কাটরা বর্তমান। মনোহর দাস স্ট্রীটের পাশে এই কাটরা অবস্থিত । মনোহর দাস সাহ — এই নাম অনুসারে রাস্তা এবং কাটরার নামকরণ হয়।

'.... পিতার নাম গোপাল দাস সাহ। এই মনোহর দাস কাশীর লোক ছিলেন। তিনি গড়ের মাঠে লিণ্ডসে স্ট্রীটের সামনে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে একটি বড় পুকুর গরুদের জল খাবার জন্য কাটিয়ে দেন ও চার কোণে শিব, বিষ্ণু, দুর্গা ও গনেশ এই চার দেবতার মন্দির তৈরি করিয়ে দেন। এই পুকুরের চারপাশে একশ বিঘে জমি কিনে এক বড় গোচারণের মাঠও করে দেন। শূন্য মন্দিরগুলো এখনও দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু কোনোটাতেই দরজা জানালা বা দেবতা নেই। মনোহর দাসের বংশধর কাশীর বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত লালা ভগবান দাস.....'

*গঙ্গার ঘাট ঃ রাধারমণ মিত্র*

দেখতে দেখতে বড়বাজার অঞ্চল জুড়ে তৈরি হতে থাকে প্রাসাদতুল্য ত্রিতল চতুস্তল ও পঞ্চতল বাটি। কোলকাতার কোন অঞ্চলেই সেই সময় এত বড় প্রাসাদ ছিল না। সেদিনের চৌরঙ্গী কিংবা তার আশপাশ অঞ্চল বড়বাজারের কাছে সত্যি ম্রিয়মান ছিল।

যাতায়াতের সুবিধার জন্য ক্রমে ক্রমে পথের বিন্যাস হতে শুরু হয়। ওপাশ থেকে ক্লাইভ স্ট্রীট [বর্তমান নেতাজী সুভাষ রোড ]এসে বড়বাজার ছুঁয়ে যায়। হাওড়া পুল থেকে শুরু হয়ে শিয়ালদহ পর্যন্ত পৌছায় হ্যারিসন রোড [বর্তমান মহাত্মা গান্ধী রোড]। কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান, স্যার হেনরি হ্যারিসনের নামে এই পথের নামকরণ হয়েছিল। তৈরি হতে সময় লেগেছে চার বছর, ১৮৮৯ থেকে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ।

তখন মূলত মালপত্র আনা নেওয়া এবং যাবতীয় যাতায়াত করার পথ মানেই জলপথ। বড়বাজারের কাছাকাছি গঙ্গায় নৌকা এবং জাহাজ এসে থামতো বণিকের মাল উঠতো নামতো। প্রথম প্রথম হয়তো সে ভাবে কোন নির্দিষ্ট চিহ্নিত জায়গা ছিল না। পরে পরে স্থান চিহ্নিত হয়। নামকরণ হয় ঘাটের।

গঙ্গার ধারের এই সব ঘাট একই উদ্দেশ্যে তৈরি হয়নি। এর মধ্যে কিছু শুধু স্নানের জন্য তৈরি করা হয়। কিছু পুরনো ঘাট ভেঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সময় মত রক্ষণাবেক্ষণ না করতে পারার জন্য এ অবস্থার পরিণতি। আবার কিছু কিছু জায়গায় পুরনো ঘাট ভেঙ্গে নতুন ঘাটের প্রবর্তন হয়েছে। 'আবার কতকগুলি ঘাট বড় বড় কারবারীরা তৈরী করিয়েছেন নিজেদের মালপত্র নৌকায় বা জাহাজে চাপানো ও তা থেকে খালাস করবার জন্য, যেমন মদন মোহন দত্তের ঘাট, শোভারাম বসাকের ঘাট, বৈষ্ণব চরণ শেঠের ঘাট, কাশীনাথ বাবুর ঘাট ও হুজুরী মালের ঘাট। শুধু এ দেশী লোকেরাই নয়, সাহেব ব্যবসাদারেরাও পয়সা খরচ করে নিজেদের ব্যবসার খাতিরে ঘাট তৈরী করেছেন, যেমন, রসবিবির ঘাট, জ্যাকসন ঘাট, ব্লাইথ ঘাট ও স্মিথ ঘাট।'

*— গঙ্গার ঘাট ও রাধারমণ মিত্র*

কলকাতার দিকে গঙ্গার জল গভীর ছিল না আগে। তখন তাই জাহাজ এসে ভিড়ত গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে অর্থাৎ হাওড়া শিবপুরের দিকে। পশ্চিম পাড়ে চড়া পড়ে জলের গভীরতা কমে গেলে কলকাতার দিকে জল হয় গভীর। ব্যবসা বাণিজ্যের জাহাজ এসে ভিড়তে থাকে এপাড়ে। জমজমাট হয় বড়বাজার।

পুরনো দিনে শেঠ এবং বসাকরা যে ঘাট থেকে মাল আমদানি ও রপ্তানি করতেন তার নাম কদমতলা ঘাট। ঘাটের ওপরেই ছিল বৈষ্ণব চরণ শেঠের বাড়ি। এই ঘাটের প্রবর্তন তিনিই করেছিলেন। বিরাট এক কদম গাছ ছিল ঠিক ঘাটের পাশে। এই জন্যই এই ঘাটের নামকরণ হয়েছিল কদমতলা ঘাট।

বড়বাজারের নোঙ্গরেশ্বর মহাদেবের যে মন্দিরে ঘাট থেকে উঠে এসে বণিকরা পূজো সারতেন ব্যবসা বাণিজ্যের মঙ্গলের জন্য সে মন্দিরটি তৈরি করেছিলেন দেওয়ান কাশীনাথ ট্যান্ডন [১৭২১ - এপ্রিল ১৭৯২]। ইনি পাঞ্জাবী হিন্দু।আদি বাস লাহোর। সে জায়গা ছেড়ে এরা কলকাতায় আসেন। কাশীনাথ ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টিংসের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র ছিলেন এবং ক্রমে ক্রমে বিশাল ভূসম্পত্তি তাঁর করতল গত হয়।



নিজের মাতৃভাষা ছাড়া ও কাশীনাথ সংস্কৃত, ফার্সি ও বাংলা ভাষা খুব ভাল জানতেন এবং ইংরাজী ভাষায়ও তাঁর জ্ঞান ছিল। জুম্মা শা'র দরগা ক্লাইভ স্ট্রিটে দেওয়ান কাশীনাথের বাড়ির সামনে। এখনো সে দরগা বর্তমান। হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গায় এ দরগা আক্রান্ত হয়নি।

কাশীনাথ ট্যাগুন নিজের বাড়ির কাছে যে নোঙ্গরেশ্বর শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, সেই নোঙ্গরেশ্বর সম্পর্কে দুটি মতবাদ প্রচলিত। প্রথম মতে ঃ এই শিব ছিলেন সুতানুটি হাটের কাছে এক চালাঘরে। সুতানুটির ঘাটে যে সব হাটুরে ব্যবসাদার নৌকা লাগাতো বা নোঙ্গর করতো তারা এই শিবের পূজা দিত। তারা এই শিবের নাম দেয় নোঙ্গরেশ্বর। দেওয়ান কাশীনাথ এই শিবকে নিজের বাড়ির কাছে নিয়ে এসে পাকা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যমত : বর্তমান মন্দির যে জায়গায়, তার কাছাকাছি মাল খালাস করার জন্য আগে একটা ঘাট ছিল। একটা নোঙরের তলায় শিবঠাকুর মূর্তি ছিল। নোঙর তোলা হলে সে জায়গা থেকে শিব ঠাকুর বেরিয়ে পড়েন। কাশীনাথবাবু মূর্তি তুলে এনে তীরে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

শোভারাম বসাক একজন অত্যন্ত ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। আদি বাসস্থান ছিল মুর্শিদাবাদে। জন্ম হয় ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে। সে সময় মুর্শিদাবাদের নাম ছিল মক্সুদাবাদ। এরা জাতিতে ছিলেন তন্তুবায়। মুর্শিদাবাদ ছেড়ে প্রথমে আসেন সপ্তগ্রামের হলদিপুরে, সেখান থেকে এসে গোবিন্দপুরে শেঠেদের কাছে বাস করতে থাকেন। এদের আসল ব্যবসা সূতো ও কাপড়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে ব্যবসা করে ক্রোড়পতি হন।

গোবিন্দপুরে বসবাস করার সময় জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এ জায়গায় দুর্গ তৈরি করার সময় জগন্নাথ দেব এবং পরিবারে সবাইকে নিয়ে শোভারাম বসাক এসে বড়বাজারে বাস করতে হয়। বড়বাজারে তাঁর বসত বাড়ির সামনের রাস্তার নাম শোভারাম বসাক স্ট্রীট। এবং নিজের বাড়ির পশ্চিমে গঙ্গাতীরে মন্দির তৈরি করে জগন্নাথ দেবকে সেখানে প্রতিষ্ঠা করেন। অরে তার পাশেই তৈরি করে দেন জনসাধারণের জন্য ঘাট। এটিই জগন্নাথ ঘাট নামে পরিচিত। বাঙলাদেশে সে সময় যত ধনী ছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন হুজুরী মল। বলা যায় জগৎশেঠ ও উমিচাঁদের পরই ছিল তাঁর স্থান। হুজুরী মল ছিলেন পাঞ্জাবী শিখ। বাস করতেন বড়বাজারে। তাঁর গদিতে কাজের জন্য বহুলোক নিযুক্ত ছিল। এ ছাড়াও ছিল ষোল দল গায়ক ও বাদক যারা সংশ্রী আকালের বন্দনায় ব্যস্ত থাকতো। ১৬৬৭ সালে উমিচাঁদের মৃত্যুর পর হুজুরী মল তাঁর সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন।

তিনি কোম্পানিকে নানা দিক থেকে উপকার করেন। বিশেষ করে ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধের সময়। তাঁর এই উপকারে সন্তুষ্ট হয়ে গভর্নর ভেরেলেষ্ট তাঁকে পুরস্কৃত করতে চান। হুজুরী মল অন্য কোন কিছু না নিয়ে কালীঘাটের মধ্যে বারো বিঘা জমি চান। বাসনা মন্দির প্রতিষ্ঠা। দানের জমিতে মন্দির প্রতিষ্ঠার কিছু ত্রুটি থেকে যায়। কারো কারো মতে এ কাজ অশাস্ত্রীয় তাই তিনি নিজের খরচে তৈরি করে দেন গঙ্গার ঘাট, চাঁদনী ও শিব মন্দির। এ ছাড়াও হুজুরী মল নিজে খরচ করে বৌবাজার বৈঠকখানা অঞ্চলে পঞ্চান্ন বিঘা জমির ওপর একটা প্রকাণ্ড পুকুর কাটিয়ে দিয়েছিলেন জন হিতার্থে।

## ইয়াংকি ব্যবসায়ী এবং কলকাতার বণিক সম্প্রদায়

ভারতবর্ষের প্রতি আমেরিকার আগ্রহ প্রকৃতভাবে দানা বাঁধে ১৭৮০ সালের মাঝামাঝি,

কেননা সেই সময় প্রথম আমেরিকার জাহাজ ভারতবর্ষের জল ছুঁয়ে প্রবেশ করে কলকাতার পাশে এই গঙ্গায়। তখন ভারতবর্ষে মোঘল সাম্রাজ্যের শক্তি ক্রমশ কমে আসছে।

আমেরিকার সঙ্গে প্রথম বাণিজ্যের যোগসূত্রের যে ছবি স্পষ্ট হয় তা হচ্ছে শেষ মধ্যযুগীয়, চারিত্রিকে এবং ধরনে। সে সময় ভারতবর্ষের রপ্তানি দ্রব্য প্রধানত ছিল সুতো। কলকাতার পাশে গঙ্গায় তখন লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো আমেরিকান জাহাজ। বাণিজ্য বহরের পরিষ্কার এক চিত্রকল্প। ক্রমে ক্রমে বাণিজ্যের চেহারা পরিবর্তিত হয়ে যায় উপনিবেশীয় বাণিজ্য প্রথায়। ভারতবর্ষ থেকে রপ্তানি হতে থাকে চামড়া, তৈলবীজ, পাট। বদলে আমদানি হত রূপা।

আঠারো শতকের শেষভাগে আমেরিকা বৃটিশ শাসন থেকে নিজেদের মুক্ত করে, সঙ্গে সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যে যে একাধিপত্য ছিল পূর্বের সঙ্গে, ভাঙন ধরে সেখানে। ইয়াংকি বণিকদের জাহাজ স্বাধীন বাণিজ্যের জন্য ভাসে। গন্তব্যস্থান ভারতবর্ষ তথা কলকাতা। বাণিজ্যের পসার দিনের পর দিন বেড়ে চলে এবং অবশ্যই সম্পর্ক। এই বাণিজ্যকে ভিত্তি করেই আমেরিকা এবং ভারতবর্ষ একে অন্যের ঘনিষ্ঠ হয়।

ভারতবর্ষ ও আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্যের সূচনার পথিকৃৎ রামদুলাল দে [১৭৫২ - ১৮২৫]। দমদমা রেকজানি গ্রামে তার আদি নিবাস। পিতা সংসার চালাতেন গুরু গিরি করে। দেশে বর্গীর হাঙ্গামার সময় গ্রাম ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে হয়। সেই সময় পথে পুত্র রামদুলালের জন্ম হয়। তাই রামদুলাল জন্ম থেকেই সম্বলহীন। তিনি জীবন গুরু করেন দারিদ্রের মধ্যে। ভাগ্যের পরিবর্তন আসে হঠাৎ করেই। আমেরিকান বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত করে নিজেকে ব্যস্ত করে তোলেন মাল কেনা বেচায়। ফলে একজন সফল ব্যবসায়ী। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের পূর্ণ অবয়বের ছবি রামদুলাল দে উপহার হিসেবে পান। পঁয়ত্রিশজন ব্যবসায়ী এর উদ্যোক্তা। রামদুলাল দে ছিলেন একজন বিচক্ষণ এবং সৎ ব্যবসায়ী। ঐ পঁয়ত্রিশ জন ব্যবসায়ীই তাদের ব্যবসায় সুফল পান রামদুলাল দের জন্য। তিনি এখানে বসে প্রত্যেকের মালপত্র সময় মত পাঠানো কিংবা কোন জিনিষ এদেশে এনে ঠিক ঠাক বন্দোবস্ত করে বাজারজাত করার কোন রকম ত্রুটি রাখতেন না। মৃত্যুর সময় তিনি এক কোটির ওপর টাকা রেখে যান। দান ধ্যান না করলে ঐ টাকার পরিমাপ আরো বেশি হত।

আমেরিকায় যিনি প্রথম ক্রোড়পতি হন তাঁর নাম ইলিয়াস এইচ ডারবি। ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্য শুরু করার পর ডারবির ভাগ্য ফিরে যায়। যদিও তিনি নিজে কখনো সমুদ্র যাত্রা করেননি কিন্তু তাঁর পুত্র এবং জাহাজের কলকাতা আসা যাওয়া ছিল অবিরাম। এ ছাড়া ও সালেম এবং বোস্টনের বহু ব্যবসায়ী যারা তাদের ব্যবসায় ভীষণভাবে কৃতকার্য হয়েছেন ভারতবর্ষের পণ্য নিয়ে প্রত্যেকেই কোন না কোন ভাবে একদিন ডারবির যোগ্য কর্মচারী ছিলেন।

ভারতবর্ষর সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্য শুরু হওয়ার প্রথম দিকে, বাণিজ্যে আধিপত্য ছিল শুধু দুটি পরিবারের — ক্রাউনশিল্ড এবং ডারবি। যদিও দুই পরিবারের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মত পার্থক্যের সূত্রপাত ঘটতো প্রায়ই। জেকব এবং বেঞ্জামিন ক্রাউনশিল্ড দু' পরিবারের দু সদস্য — এরা অসংখ্যবার কলকাতায় এসেছেন। এই সময় মূলত তাদের কলকাতা থেকে নিয়ে যাওয়ার পণ্য ছিল ঃ সুতিবস্ত্র, চিনি, সিল্ক, নীল, আদা এবং বিভিন্ন ধরনের ভেষজ ও



মশলাপাতি। আমদানি করতো রৌপ্য মুদ্রা এবং বিলিতি মদ, কলকাতায় বসবাসকারী বিদেশীদের জন্য।

ভারতবর্ষ থেকে আমেরিকায় প্রথম হাতি নিয়ে যাওয়ার কৃতিত্ব জেকবের। ১৭৯৭ সালে তিনি এই বিশালকায় প্রাণীটির সঙ্গে আমেরিকাবাসীর পরিচয় ঘটিয়ে দিয়ে বিস্মিত করে দেন তাঁর দেশের মানুষদের।

প্রচার পত্র বিলি করে সবাইকে জানানো হয়। হাতি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সাধারণের জ্ঞাতার্থে ছাপা হয় প্রচারপত্রে। এবং সঙ্গে থাকে হাতির অবয়ব এবং সেই হাতি সম্পর্কে বর্ণনা।

— বয়স মাত্র চার এখন হাতিটির। ওজন ৩০০০ পাউণ্ড। ৩০/৪০ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত ওর পূর্ণ বিকাশ হবে না। শুরু থেকে লেজ পর্যন্ত ওর দৈর্ঘ্য ১৫ ফুট ৮ ইঞ্চি, দেহের পরিধি ১০ ফুট ৬ ইঞ্চি। প্রতিদিন খাওয়ার জন্য খাদ্যের পরিমাণ লাগে ১৩০ পাউন্ড। সম্ভ্রান্ত দর্শকদের জন্য ফিলাডেলফিয়ার নিউ থিয়েটার মঞ্চে হাতির আগমন হচ্ছে। রোববার বাদে সপ্তাহের প্রতিদিন ওকে সূর্য উদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দেখা যাবে—

বিঃ দ্রঃ প্রত্যেক দর্শককে অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যেন কোন রকমের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে ওর সামনে না আসেন। কেননা এ পর্যন্ত ও অনেক কাগজ নষ্ট করে ফেলেছে। প্রবেশের জন্য মাথা পিছু লাগবে ডলারের এক চতুর্থাংশ। ছোটদের জন্য নয় পেন্স।
বোস্টন, ১৮ অগাষ্ট, ১৭৯৭

ফ্রেডরিক টিউডর তাঁর সমসাময়িকদের অবাক করে এক নতুন ধরনের ব্যবসা প্রবর্তন করেন। ১৮৩৩ সালে টিউডরের জাহাজ বোস্টন থেকেসোজা এসে কলকাতায় থামে। চতুর্দিকে হৈ চৈ পড়ে যায় জাহাজ গঙ্গায় এসে নোঙর করার পর। এক জাহাজ ভর্তি বরফ এসেছে। কোলকাতার মানুষ জনের সেই প্রথম বরফ দেখা। ফ্রেডরিক টি উডরের কৃতিত্ব, সেই দিনে তিনি জাহাজকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছাদিত করে নেন বরফ যেন গলে না যায়। অবশ্য টিউডর এই ব্যবসা শুধু শীতকালেই করতে পেরেছিলেন। কেননা সেই সময় বোস্টন এবং তার আশে পাশের জলাশয়গুলো জমে সাদা বরফে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। তিনি সেই বরফ কেটে জাহাজে করে নিয়ে এসেছিলেন এ দেশে।

সে সময় ভারতবর্ষের ব্যবসা মানেই — কলকাতা। সালেমের একজন অন্যতম বণিক সেই দিনের কলকাতা সম্পর্কে তাঁর ধারণার কথা সাময়িকিতে [১৮০৩] লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন ঃ "Calcutta is the greatest place of trade in British India, A very extensive business is carried on here with Europe, America and the other parts of India. Here are fine Docks for repairing vessels, and shipyards for building. If exports to Europe and the United States, piece Goods, Cotton, Sugar, Indigo, Ginger, Etc."

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কলকাতার ব্যবসায়ী মহলের প্রধান কর্ণধার ছিলেন, রাজিন্দর ও কালিদাস দত্ত, এবং রাধাকিষেন ও রাজকিষেন মিটার। রামদুলাল দে'র জামাতা ছিলেন রাজকিষেন মিটার। রাজিন্দর দত্ত এবং তাঁর কাকা কালিদাস দত্ত যেমনি সফল ব্যবসায়ী

ছিলেন তেমনি তাদের ব্যবহার এবং আতিথেয়তায় অত্যন্ত খুশি ছিলেন আমেরিকান বণিক সম্প্রদায়।

রাজিন্দর শুধু ব্যবসায়ী ছিলেন না একজন সক্রিয় সমাজসেবীও ছিলেন। তাঁর ভাবনা এবং চিন্তার কিছু কিছু অংশ আমেরিকাবাসী বন্ধুকে জানিয়েছিলেন, তিনি মেয়েদের জন্য শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করতে চান, বিধবারাও যদি আবার বিয়ে করার সুযোগ পায় তাহলে খুব ভাল হয়। বিশেষ করে যাদের বয়স অল্প। এবং তাঁর আর একটি ইচ্ছে, That Government would frame a Code of Laws applicable to all nations without respect of Color or Creed.' এ ছাড়াও রাজিন্দর চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন, কেননা কলকাতায় তিনিই ছিলেন হোমিয়প্যাথির জনক।

সালেমের পি বডি যাদুঘর

ইস্ট ইন্ডিয়া মেরিন সোসাইটি ১৭৯৯ সালে সালেমে এই যাদুঘরটি প্রতিষ্ঠা করেন। মূলতঃ যাদুঘরের প্রদর্শিত বস্তু কলকাতা তথা ভারতের সঙ্গে আমেরিকার ব্যবসা সংক্রান্ত যাবতীয় দলিল দস্তাবেজ। নিজস্ব চিঠিপত্র ছাড়াও প্রদর্শিত হয়েছে সেই সময়ের বাজার দর; বিশিষ্ট বণিকদের ছবি কিংবা মডেল ইত্যাদি খুঁটিনাটি বহু জিনিষ।

প্রদর্শনী দেখে পুরনো দিনের ব্যবসা সম্পর্কে সুস্পষ্ট একটা ধারণা পাওয়া যায়। ভারত তথা কলকাতার সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্যের যোগসূত্রের সূচনা এবং দীর্ঘদিনের পর্যায়ক্রমের ইতিহাসের যাদুঘর।

## প্রফেসর গিডেসের বড়বাজার নিয়ে নতুন পরিকল্পনা

ক্রমেই বড়বাজার একটা অসহনীয় অবস্থার দিকে এগুতে থাকে। মানুষজন বসতি দোকান পাট সবকিছু নিয়ে এক হ য ব র ল অবস্থা। যতদিন যেতে থাকে এ জায়গার সবকিছু কি রকম যেন এলোমেলো হয়ে যায়। অর্থাৎ কোন কিছু একটা নিয়মের মধ্যে থাকতে থাকতে অনিয়মের মধ্যে পড়ে গেলে যেমন হয় আর কি। বিশেষ করে মানুষজনের আধিক্যে সম্পূর্ণ অঞ্চল কলুষিত হয়ে পড়ে। এ ছাড়াও চলাফেরা কাজকর্ম করা — 'এ সব'ত আছেই।

তাই সেই দিনের শাসক মহল যথেষ্ট চিন্তিত হয়ে পড়েছিল বড়বাজার নিয়ে। কেননা এভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে এলাকার মানুষজন শুধু যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকবে তাই নয়, ব্যবসা বাণিজ্য যার পর নাই ব্যাহত হতে থাকবে।

অতএব সম্পূর্ণ ভাবে ঢেলে সাজানো দরকার বড়বাজারকে। রাস্তাঘাট চওড়া হওয়া প্রয়োজন। সুবিন্যস্ত পয়ঃ প্রণালী অত্যন্ত জরুরি। কয়েকটি খোলা মাঠের প্রয়োজন। যেখানে এসে এলাকার মানুষজন কয়েকদণ্ড নিশ্চিন্তে বসে খোলা আকাশের নিচে নির্মল বাতাসে নিশ্বাস নিতে পারবে। সেই সময় কলকাতার উঁচুতলা যতগুলো বাড়ি ছিল প্রায় সবই ছিল এ অঞ্চলে। শুধুমাত্র মানুষজনই নয় উচ্চ অট্টালিকার প্রাধান্যে বড়বাজার ক্রমেই অন্য এক রূপ পরিগ্রহ করতে চলেছিল।

এই উঁচু বাড়িগুলির জন্য প্রত্যেকেই আতঙ্কগ্রস্ত, সমাধানের জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে আর্জি রাখা হয়। এবং প্রত্যেকেই সচেষ্ট হন এ কাজের সুসম্পাদনের জন্য। কিছু দিনের মধ্যে সঠিক ব্যক্তি নিযুক্ত হন প্রফেসর প্যাট্রিক গিডেস্ [Prof Patrick Geddes] । তিনি তাঁর



পরিকল্পনা পেশ করেন। প্রকাশিত হয় কলকাতা কর্পোরেশন থেকে Barra Bazar improvement - A Report. The Corporation of Calcutta, Prof Patrick Geddes, Director of Cities and Town planning Exhibition, Printed at the Corporation Press, 1919.

প্রফেসর গিডেস্ তাঁর রিপোর্টের সঙ্গে সম্পূর্ণ বড়বাজারের নক্সা এঁকে বুঝিয়ে দিয়েছেন কি ভাবে এলাকার পুণর্বিন্যাস করা প্রয়োজন। কোন রাস্তা এখন কত চওড়া আছে এবং কি হওয়া দরকার। কোথায় পার্ক হবে। জলের বন্দোবস্ত কি ভাবে হবে। গরু অথবা মোষ রাখার জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। নতুন কোন গলি এবং লেনের প্রয়োজন থাকলে তাও। তবে মন্দির অথবা কোন দেবালয় থাকলে তার কোন পরিবর্তন হবে না। প্রফেসর গিডেস্ কোন সময়ই দেবালয় পরিবর্তনের রিপোর্ট তাঁর পরিকল্পনায় রাখেন নি।

পর্যায় ভাগ করে করে প্রফেসার তাঁর পরিকল্পনা পেশ করেছেন। কেননা দৈনন্দিন মানুষের কাজকর্ম যতদূর সম্ভব ঠিক করে তার এই পরিকল্পনার ব্যবস্থা নেওয়া। আমূল পরিবর্তন করতে যেয়ে বাজারের রোজকার যে নিয়ম মাফিক কাজ তা যেন অনেকাংশেই ব্যাহত না হয় সেদিকে গিডেসের নজর ছিল যথেষ্ট।

' The minor widening of old thoroughfares may be undertaken by the Corporation as circumstances permit, in any order which may be practicable, and the sooner the better. But on some of the proposed new thoroughfares are indications of order of expediency of Construction,'

প্রফেসর গিডেস্ তাঁর সহকারীদের নিয়ে শুধুমাত্র বড়বাজার অঞ্চলই নয় তার উত্তর দক্ষিণে পূব এবং পশ্চিমে কতটুকু বিস্তৃত করা যায়, সে বিষয় নিয়েও ভাবনা চিন্তা করেছিলেন।

সম্পূর্ণ জায়গা ঘুরে, তার খুটিনাটি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এবং কতদূর পর্যন্ত কার্যকর হতে পারে সে বিষয় মাথায় রেখে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক তাঁর পরিকল্পনায় পেশ করেন। যদিও তাঁর এই রিপোর্ট পেশ করতে বেশ সময় লেগেছিল। তার কারণও অবশ্য যথেষ্টই ছিল। কেননা গিডেস্ শুধুমাত্র জায়গায় এবং তার পরিবেশ নিয়েই ক্ষান্ত থাকেন নি। ঠিক এই সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত শহরের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রধান প্রধান বাজারের চরিত্র স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়েছেন তার পরিকল্পনায়। অতএব ভবিষ্যত বড়বাজারের আক্ষরিক অর্থে উন্নতির জন্য গিডেসের এই রিপোর্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

**Preliminary Survey :**

The first task, for myself and assistants alike, and both separately and together, has been to acquaint ourselves 'as intimately as time has allowed with the whole area; and thus in detail v12. of :

a] Streets and Lanes; noting their condition, congestion etc.

b] Temples (not to be interfered with)

c] Buildings and their uses; i.e. business habitation. (or mixed of these); with state of repair and sanitation

d] Bustees

e] Stables, Cow house, Workshops and other temporary buildings

f] Open spaces

পরিকল্পনা পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রফেসর গিডেস্ বাণিজ্য স্থান সম্পর্কে কিছু কিছু নির্দেশ করেছেন। সেই সময়ের সামাজিক অর্থনৈতিক পরিকাঠামো ভিত্তিক আমাদের বাজার পৃথিবীর কয়েকটি দেশ থেকে অনেক পিছিয়ে পড়েছে। তার কারণ বর্তমান পৃথিবীর অগ্রগতির সঙ্গে আমরা কোনভাবেই যেন তাল মিলিয়ে চলতে পারছি না। কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। অথচ একটা সময় ছিল যখন অন্যান্য দেশের কাছে ভারতবর্ষ ছিল উপমা। দূর দূরান্তের দেশ থেকে ব্যবসায়ীরা এখানে এসে ব্যবসা করতে পারলে খুশি হতেন, গর্ব বোধ করতেন।

যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সুযোগ সুবিধা তফাৎ হয়ে যায়। অন্যান্য আর সব কিছুর মত ব্যবসা বাণিজ্যেও তার প্রতিফলন পড়ে। তখন পুরনো দিনের ধ্যান ধারণা নিয়ে বসে থাকলে বর্তমান থেকে অনেক দূরে সরে যেতে হয়। তাই মনে হয় কোন কিছু সম্পর্কে কোন কিছু সংজ্ঞার স্থায়ীত্ব নির্ভর করে — সময় এবং তার অনুসঙ্গ পরিবেশের ওপর।

বাজারের আঞ্চলিকতা — একটা সময় ছিল যখন শুধু ভারতবর্ষই নয় পৃথিবীর অন্যান্য পুরানো শহরের ঐতিহ্য ছিল। ক্রমে ক্রমে সেই ধ্যান ধারণায় পরিবর্তন এসেছে। বর্তমান বিশ্বে বাজারের চরিত্রের পরিবর্তন হয়েছে আমূল। এসেছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সবকিছু ছাপিয়ে নিজের অস্তিত্ব রাখা। অবশ্যই গুণগত মান, সহজলভ্য এবং তার ওপরে থেকে যায় দাম কমের প্রশ্ন। সবার ওপরে থাকে বাজারজাত করার ক্ষমতা। তবু বোধহয় পরিষ্কার করে এর প্রকৃত সংজ্ঞায় পৌঁছানো সম্ভব নয়। প্রতিনিয়ত চলছে পরীক্ষা নিরীক্ষা।

'The Localisation and grouping of buisness interests in to different quarters gives its familiar character to Indian and other old cities; but this is often supossed an old world survival, in a modern world of ' go - as- you please'. Yet this view is not really the modern one; it is itself a survival of that confusion introduced by the mechanical revolution, and the Railway age, with their upsetting of the old order of Industry; and by the inability of world be economists, in a world of intensified individual struggle and competition, to discern, much less plan, any adequate organisation to replace that which it superseded.'

শিল্প বিপ্লবের জাগরণ চলছে জার্মানীতে। সেই ঢেউয়ের ছোঁয়া পৌঁছে ছে আমেরিকার উপকূলে। তাই বর্তমানে অপ্রতিরোধ্য হবেই তার এগিয়ে চলা। অথচ সেই একই সময়ে ভারতবর্ষ তথা কলকাতার ব্যবসা ক্রমশ অসংগতিপূর্ণ হয়ে উঠছে। অতএব কি করে পাল্লা দেবে এখানকার বাজার।

একটু ভাল করে তাকালে দেখা যাবে অন্যান্য দেশের বাজারগুলো অত্যন্ত পরিকল্পনা মাফিক। তাদের বাণিজ্যের সঙ্গে সময়ের অনুকূলতা এবং সুসংগঠিত হতে পারার অর্থ একে অন্যের পরিপূরক হওয়া। কোন কিছু তৈরি করার আগে — তার পরিবেশ, প্রযুক্তিগত দিক, যোগাযোগের সুবিধা ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা এবং তারপর পরিকল্পনা



মাফিক তার ব্যবস্থা নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। পরিবেশের নান্দনিক দিক সবাইকে এক ঘেয়েমির হাত থেকে রক্ষা করে।

' A specious and well lit hall, or even floor, in the exchange in which all connected with the business can meet. Even a Roof Garden is provided for moments of repose, so helpful to the working day, and with quiet seats in every corner for business conversation.

It is the re- Localisation of business — which after all is but the old world Indian quarter replanned and concentrated, with every modern appliance —that is now needed here, to bring Calcutta business more fully abreast of the times. No other area of the entire city is so suitable for it, as this long strip parallel to the river, which may grow up and down as far as may be needed by the future.'

বাজারে আঞ্চলিকতার প্রভাব আমেরিকার প্রায় প্রতিটি শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। এখন প্রত্যেক ধরনের কাজের জন্য একই ধ্যান ধারণা। এ ধরনের বাজারের সূত্রপাত হয় সুতো, লোহা, শস্য ও বিশেষ বিশেষ দ্রব্য নিয়ে। পরে পরে সবকিছুই এসে হাজির হয়েছে। এমন কি বই প্রকাশনা এবং বিক্রী, তারও স্থান নির্দিষ্ট। ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ছড়ানো ছেটানো নয়। এই সমস্ত কিছুর পেছনে শুধু একটাই কারণ - সু পরিকল্পনা।

ক্রেতা যদি একই জায়গায় তার ক্রয়ের সমস্ত কিছু খুঁজে পেয়ে যান, পছন্দ করার সুযোগ পান তার প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের, তাহলে তিনি ভীষণ খুশি। অহেতুক ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ঘুরতে হল না। সময় সাশ্রয়। ব্যবসার কাজ কর্ম অনেক তরান্বিত হয়।

'..... Above all, to be undersold through the many economies of this new type of Localisied and Concentrated business, in which not only material organisation is more effective, but all concerned are more alive.'

কিন্তু বড়বাজারের প্রশ্নে এলে, পৃথিবীর অন্যান্য শহরের বাণিজ্যাঞ্চলের সঙ্গে তুলনা করলে আমাদের কেমন যেন মিইয়ে পড়তে হয়। যদিও আঞ্চলিকতার সুযোগ বর্তমান তবু এই পেছিয়ে থাকার একমাত্র কারণ পরিকল্পনার অভাব। কেননা বাজার মানেই ভীড়। অর্থাৎ মালপত্র মানুষজনে ঠাসাঠাসি। ক্রেতা হন কিংবা বিক্রেতা তিনি তার বাণিজ্য করতে আসার জন্য সুযোগ সুবিধা যত বেশি পাবেন খুশি হবেন তত বেশি। এবং যত যত বেশি খুশি হবেন তিনি সেই জায়গা সম্পর্কে তত বেশি ভাবনা চিন্তা করবেন। সেই সব নতুন নতুন পরিকল্পনা অন্য এক ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

প্রফেসর প্যাট্রিক গিডেস্ বড়বাজার সম্পর্কে তাঁর পরিকল্পনার শেষ পর্যায়ে এসে উপসংহার টানেন। পরিষ্কার জানিয়ে দেন এই মুহূর্তে এ জায়গা নিয়ে ভাবনা চিন্তা অত্যন্ত জরুরি। পরিকল্পনা মাফিক কাজ না হলে ক্রমশ জটিলতার দিকে এগিয়ে যেতে থাকবে।

**Proposed New Business Area**

Hence for this great city of which the growing importance is far short of adequate recognition or practical provision in any department of its activities - a Modern

Business quarter should be established. This matter is evidently to the future of Barra Bazar and this decisive for its various possibilities of improvement.

..... এবং

To this scheme is however one serious objection that the population per acre would thus become too great, if from strorey blocks without warehouse below, are employed, and other business premises.

## ঈশ্বরচন্দ্রের ছোটবেলা কাটে বড়বাজারে

ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় খুব ছোট বেলায় কলকাতায় চলে আসেন অন্ন সংস্থানের খোঁজে। কলকাতায় এসে তিনি প্রথম আশ্রয় পান জগমোহন ন্যায়লঙ্কারের কাছে। এখানে শুধু আশ্রয়ই জুটেছিল। মন পড়ে থাকে বাড়ির জন্য, মা ভাইবোনদের জন্য — কি ভাবে তিনি টাকা পাঠাবেন। রোজগার না হলে তাঁর পক্ষে কোন কিছু পাঠানো সম্ভব নয়।

প্রতি নিয়ত এই চিন্তা ঠাকুরদাসকে ব্যস্ত করে তুলেছিল। কিছুদিনের মধ্যে তাঁর মাথায় এক পরিকল্পনা এসে হাজির হয়। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন পুঁজি ছাড়া তাঁকে যদি অর্থ সংগ্রহ করতে হয়, একমাত্র পথ ইংরাজি শিক্ষা। কলকাতা শহরে এই ভাষা জানা মানুষের কদর আছে। তিনি তাই ইংরাজি শিখতে শুরু করেন। কিন্তু তিনি দীর্ঘদিন এই ন্যায়লঙ্কারের কাছে, যে জায়গায় এসে প্রথম উঠেছিলেন থাকতে পারেন না। অর্থাৎ থাকা সম্ভব হয় না। পরে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয় ভগবত চরণ সিংহের বাড়ি বড়বাজারে।

এখানে আসার পর ঠাকুরদাসকে কাজ জোটে। মাসিক বেতন ৮ টাকা। থাকা এবং দু'বেলা খাওয়া জোটে ভগবত চরণের বাড়ি। ঠাকুরদাসের বয়স তখন ২৩/২৪ ।এই বাড়ির কাছাকাছি শিবচরণ মল্লিকের বাড়ি। তাঁর চেষ্টায় কাজের হদিস মেলে। বড়বাজারের চকে রামসুন্দরের লোহা পিতলের দোকান। এই দোকান থেকে ধারে জিনিস ক্রয়ের ব্যবস্থা ছিল। ঠাকুরদাসের কাজ ছিল সেই ধারের টাকা আদায় করে নিয়ে আসা বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে।

এই বাড়ির কাছে ছিল এক পাঠশালা। গুরুমহাশয়ের নাম স্বরূপচন্দ্র দাস। ছোটবেলায় মাত্র তিন মাস এই পাঠশালায় ঈশ্বর পড়াশোনা করেন। ১৮২৯ সালের ১ জুন ঈশ্বর ভর্তি হন সংস্কৃত কলেজে। ৯ বছর বয়স তখন ঈশ্বরের। প্রত্যেকদিন ৯টায় সময় বড়বাজারের বাসা থেকে বেরিয়ে পটলডাঙ্গার কলেজে যেতে হত। সেই সময় সঙ্গে থাকতেন বাবা। সকালে বাড়ি থেকে বেরুনোর আগে স্নান সারতেন ঈশ্বর বড়বাজারের টাকশালের ঘাটে।

বড়বাজারে ঈশ্বরদের যে ঘরে থাকতে হতো, অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল সে ঘরটি। একতলা ঘর। ড্যাম্প এবং ঠাণ্ডা। আলো হাওয়া খেলার সুযোগ কম। বেশ কিছুদিন একইভাবে এই ঘরে বাস করার পর ঈশ্বর অসুস্থ হয়ে পড়েন। কঠিন অসুখ হয়।

অতএব বড়বাজারের ঐ ঘর ছাড়া অত্যন্ত জরুরি হয়ে ওঠে। পিতা ঠাকুরদাস অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন বাড়ি ছাড়ার। এবং উঠেও চলে আসেন। বড়বাজারের বাসা ছেড়ে ঠাকুরদাস বাসা নিলেন বৌবাজারের পঞ্চাননতলায় আনন্দ চন্দ্র সেনের বাড়িতে। বিয়ের সময় ঈশ্বরের বয়স ছিল ষোল বছর।

" ..... যে বাড়িতে ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ভাগবত সিংহের কাছে ২ টাকা মাইনেতে



চাকুরি করতেন, সেই বাড়ি দয়েহাটা স্ট্রিটের ১৩ নম্বর বাড়ি। দয়েহাটা স্ট্রীটের নাম এখন দিগম্বর জৈন টেম্পল রোড হয়েছে। আর বাড়িটির নম্বর হয়েছে ১৩ এ, ১৩ বি ও ১৩ সি।"

*কলিকাতা দর্পণ। রাধারমণ মিত্র।*

## বড়বাজারের চৌহিদ্দ

বর্তমান বড়বাজারের আয়তন একদম ঠিক ঠাক যাই হোক না, মানচিত্র অনুযায়ী সঠিক চৌহিদ্দ নির্ধারণ সহজেই করা যায়। উত্তরে কালিকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রীট, দক্ষিণে বিপ্লবী রাসবিহারী বোস রোড, পূর্বে রবীন্দ্র সরণি এবং পশ্চিমে স্ট্রান্ড রোড কিছু অংশে স্ট্রান্ড ব্যাঙ্ক রোড।

সম্পূর্ণ জায়গা দেখা শোনা করা এবং নিরাপত্তার জন্য পুলিশী ব্যবস্থা ও থানা রয়েছে। মহাত্মা গান্ধী রোডের কাছাকাছি মল্লিক স্ট্রীটের ওপর। এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য রয়েছে ডাকঘর। পিন কোড ৭০০০০৭। এখানে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের শাখা যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে বাণিজ্য সংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন কার্যালয়। দূর দুরান্ত থেকে এসে মানুষজনের ধর্মশালায় ওঠার ব্যবস্থা রয়েছে। ছোটখাটো হোটেল রেষ্টুরেন্ট- এর সংখ্যা প্রচুর।

বড় বাজার থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে মাল পৌঁছে যায় মূলত সড়ক যান বাহনের মাধ্যমে। এ ছাড়া কিছু কিছু ক্ষেত্রে জলপথে নৌকায় করে মাল পৌঁছে যায় নির্ধারিত জায়গায়। এবং অন্যান্য ছোটখাটো ব্যাপারি যারা প্রায় নিয়মিত যাতায়াত করেন, একা অথবা কোন সাহায্যকারী মানুষকে সঙ্গে করে তারা প্রয়োজনীয় মালপত্র গন্ত করে ফিরে আসেন। হাওড়া অথবা শিয়ালদহ রেল স্টেশন দুই এর মাঝামাঝি জায়গায় বড়বাজার। তাই সমস্ত দিন ধরে দেখা যায় দুটি মিছিল। একটা মিছিলের মুখ হাওড়ার দিকে অন্যটি শিয়ালদহ।

ব্যবসা করতে এসে কেউ কেউ এ অঞ্চলেই তাদের বাসস্থান তৈরি করে নিয়েছেন। দোকান পাট এবং অফিস গুদাম ছাড়াও বড়বাজারে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা একদম কম নয়। বংশ পরম্পরায় তারা বাস করে চলেছেন। কিছু কিছু অঞ্চল বাসের প্রায় অযোগ্য তবু তারই মধ্যে মাথা গুজে দিন কাটাচ্ছেন। আর এরই মধ্যে বংশ বৃদ্ধির ফলে যাদের স্থান একদমই অসংকুলান তারা অনেকেই অনাত্র বাধ্য হয়েছেন চলে যেতে।

অঞ্চল জুড়ে কিছু মেস বাড়ি রয়েছে। সপ্তাহান্তে অথবা কাজের ফাঁকে ফাঁকে তারা দেশবাড়িতে ফিরে যান। অর্থাৎ ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে দিনাতিপাত করা শুধু। পুরনো যে সমস্ত প্রাসাদের মত বাড়িগুলো তৈরি হয়েছিল একসময়, কোনরকম প্রলেপ দিতে দিতে রক্ষা করা চলছে। নামাঙ্কিত তথাকথিত কাটরাগুলোর মধ্যে যাতায়াত করা রীতিমত দুঃসাধ্য। দুই দোকানের মাঝখানে সরু পথ। মালপত্র কিনে ব্যাপারিকে ঐ পথ দিয়েই কোনও ভাবে চলতে হয়। তার মধ্যে আবার দুজন মুখোমুখি হলে একজনকে প্রায় ধনুকের মত বাঁকা হয়ে দাঁড়াতে হয়। এবং যতদিন যাচ্ছে অবস্থা ক্রমশ অবনতির দিকে এগোচ্ছে।

এ অঞ্চলের খোলা কিংবা ফাঁকা জায়গা বলতে একটি জায়গা ছিল। সেটি হচ্ছে সত্যনারায়ণ পার্ক। উৎকলমণি গোপবন্ধু সরণী এবং কালাকার স্ট্রীটের সংযোগস্থলে অবস্থিত। আয়তন ২ বিঘা ২ কাঠা আট ছটাক এবং ৪০ বর্গ ফুট। মাড়োয়াড়ী সংস্থার সম্পাদকের আবেদনের ভিত্তিতে ক্যালকাটা ইম প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট পার্ক করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯৩৯ সালের ১

আগষ্ট সম্পাদক আবেদনপত্র পাঠান এবং সেই সালের ১২ তারিখের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পার্ক তৈরির নিকটবর্তি সত্যনারায়ণ মন্দিরের নামানুসারে পার্কের নাম রাখা হয় সত্যনারায়ণ পার্ক।

সকাল সন্ধ্যায় বয়স্করা এখানে বেড়াতে আসতেন। কয়েক দণ্ড বসে সমবয়সিদের সঙ্গে আলোচনা হত। এ ছাড়াও সকাল সন্ধ্যায় ধর্মীয় পাঠের আসর বসতো। ঝাঁক ঝাঁক পায়রা ছিল এখানে। শস্যদানা ছড়িয়ে দিলে পার্ক জুড়ে দেখা যেত শুধু পায়রা আর পায়রা।

বর্তমানে সে দৃশ্য আর দেখতে পাওয়া যাবে না। কেননা সম্পূর্ণ জায়গা জুড়ে তৈরি হয়েছে ভূগর্ভস্থ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বাজার। নামমাত্র পার্ক রয়েছে একটুখানি, সেখানে সকাল [৬টা থেকে ৯ টা ] ও বিকেলে [৩টা থেকে ৬ টা] জনসাধারণ আসতে পারে। সমস্ত দিনে প্রবেশে বাধা আছে।

বাজার এবং পার্ক নিয়ন্ত্রণ করার ভার পেয়েছে কলকাতার হ্যাপি হোম অ্যাণ্ড হোটেলস্ প্রাইভেট লিমিটেড। মূলত রেডিমেড পোশাক এবং শাড়ির দোকানই বেশি। এছাড়া রয়েছে কিছু কসমেটিক্সের দোকান। সর্বসাধারণের জন্য ভূগর্ভস্থ এই বাজারটি খুলে দেওয়া হয় '৮৯ সালের এপ্রিল মাসে। শুভ উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু।

বড়বাজার অঞ্চলে বাস করে ভিন্ন ভাষাভাষির মানুষ। তার মধ্যে বাঙ্গালী, বিহারী, উড়িয়া, মুসলমান এবং মাড়োয়ারীই প্রধান । বর্তমানে মূলকেন্দ্র মাড়োয়ারী অধ্যুষিত। In fact by 1918 major Marwari families had become banias of virtually. End of first world war they were busy with transaction of hard cash or against HUNDIS and slowly they become substantial financiers of all manners of trading activity.

Broadly speaking, the ascendancy of the Marwaries can be classified as follows :

1922 - 1935: Buying up shares of European Controlled Companies and setting up of new units in traditional industries such as Jute and Coal.

1936 -1945 : with above trends ' setting up new industries i,e, paper and suger mills.

1946 " 1965 : Wholesale bying out of several European Companies and venturing into industries such as Engineering .

1965 - 1980: Involvement in almost all lines of Industries from Jute on the one hand to petrochemicals on the other, plus buying out of Sterling Companies.

*— Statesman : 300 years of Calcutta*

এই ঐতিহ্যপূর্ণ বাজারের ভবিষ্যৎ ভাবলে খুবই শঙ্কা হয়। যেন কোনভাবে মুমূর্ষু রোগীর মুখে বার বার জল ঢেলে তাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা। পরিকল্পনা নেই। সমস্যা আছে সমাধান নেই। প্রত্যেকেরই একই ইচ্ছে, যা হোক করে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। কিন্তু এখানেই বোঝার ভুল। কেননা এভাবে কখনো একা একা বেঁচে থাকা যায়না। নিজের ছোট্ট এলাকা কিংবা পাড়া সবটুকু নয়। এর জন্য চাই সামগ্রিক রূপরেখা। প্রকৃত পরিকল্পনা। এবং তার রূপায়ণ।

কিছুদিন আগে জাপান থেকে কিছু বিশেষজ্ঞ এসেছিলেন। উদ্দেশ্য, কোলকাতাকে আধুনিকীকরণ করে আমাদের শহরের জীবনের যোগাযোগ [পরিবহন এবং পথ ] ব্যবস্থাকে যদি কিছু



সুরাহা করা যায়। সবকিছু দেখে শুনে ঐ বিশেষজ্ঞরা অভিমত প্রকাশ করে গেছেন ঃ কি করে কলকাতা শহর চলছে, সেটা দেখে আমরা হতবাক।

বড়বাজার কলকাতা শহরের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আগেও ছিল এবং এখনো আছে। এর সংস্কারের প্রয়োজন অত্যন্ত ভাবে। ১৯১৯ সালেই প্রফেসর গিডেস্ তাঁর পরিকল্পনা পেশ করে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছিলেন সে কথা। সেই মুহূর্তে হয়তো কিছু কিছু সংস্কার হয়েছিল কিন্তু সম্পূর্ণ হয় নি। সেই অসম্পূর্ণতার সীমা ক্রমশ বেড়েই চলেছে । এখন শুধু একটা ভয়াবহ অবস্থার জন্য অপেক্ষা।

## ব্যবসায়ীদের ভিন্ন ভিন্ন সংস্থা

বাজার, ব্যবসা সবকিছু ঠিক ঠিক ভাবে চালানোর জন্য কিছু প্রক্রিয়ার মধ্যে নিজেদের বেঁধে রাখতে হয়। যেন সুষ্ঠভাবে ক্রেতা তার জিনিষপত্র কিনতে পারে। ব্যবসায়ীরা তাদের মাল বিক্রি করে খদ্দেরের কাছে নাজেহাল না হন। অথবা বিক্রেতাদের দৈনন্দিন কোন সমস্যা — এ সমস্ত কিছু দেখ ভাল করার দায়িত্ব অ্যাসোসিয়েশনের ওপর ন্যস্ত থাকে।

সম্ভবত একটা সময় ছিল যখন সম্পূর্ণ বড়বাজারের জন্য ছিল একটি সংস্থা। ক্রমে ক্রমে এর রদ বদল হতে থাকে। যতদিন যেতে থাকে বাজারের পরিবর্তন হতে থাকে। আয়তনে বাজার বড় হয়। ব্যবসায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বিক্রির সামগ্রীর তালিকায় যুক্ত হতে থাকে বিভিন্ন ধরনের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস।

কলেবর বৃদ্ধি পাওয়া বাজারের ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা সহজে সমাধান হওয়ার জন্য অ্যাসোসিয়েশন ছোট ছোট সীমানা নিয়ে রচনা করে সেই অংশটুকুর জন্য নতুন ছোট সংস্থা। এই সংস্থাগুলো মূলত এলাকা ভিত্তিক। এ ছাড়া সামগ্রী ভিত্তিকও কিছু কিছু সংস্থা রয়েছে। কোন কোন সংস্থা রয়েছে সম্পূর্ণ বাড়ি নিয়ে অর্থাৎ এখানে যার নাম কাটরা।

সম্ভবত টেক্সটাইল মার্চেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন বড়বাজারের অন্যতম প্রাচীন সংস্থা। এই সংস্থার নির্দিষ্ট সভাকক্ষ, সুপরিচালিত কার্যালয় রয়েছে। নিয়মিত সদস্যরা তাদের সমস্যা অথবা বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে এসে হাজির হন। সভাধিপতি বি এল মোরে অশীতিপর, অভিজ্ঞ। দীর্ঘদিন ধরে এই বাজারের সঙ্গে যুক্ত। অনেক ওঠা পড়ার ছবি তাঁর চোখের সামনে ভাসে এখনো।

বর্তমান বড়বাজারের ব্যবসায়ীদের গঠিত সক্রিয় সংস্থাগুলোর নাম।

[ক] টেক্সটাইল মার্চেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন
[খ] সোনা পট্টি ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন
[গ] লোহা পট্টি ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন
[ঘ] মনোহর দাস কাটরা অ্যাসোসিয়েশন
[ঙ] সদাসুখ কাটরা অ্যাসোসিয়েশন
[চ] পোস্তা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন
[ছ] আলু পোস্তা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন
[জ] বড়বাজার হোলসেল ক্লথ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন

[ঝ] পারথ কুঠি ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন

প্রত্যেক সংস্থার সদস্যদের জন্য ধার্য করা আছে মাসিক চাঁদা। সুষ্ঠভাবে সংস্থা পরিচালনা, কাগজপত্র এবং অন্যান্য রাহা খরচে ব্যবহৃত হয় চাঁদের অঙ্ক। এ ছাড়াও আইন বিধি নানা কার্যকলাপের খরচ রয়েছে।

## বড়বাজারের প্রধান পথ পরিচয়

যে কোন স্থান সে বাসযোগ্যই হোক কিংবা ব্যবসাযোগ্য স্থান হোক্ সে জায়গায় যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম পথ। যেমন যেমন ভাবে বাজার বৃদ্ধি পেয়েছে, পথের অনুপাত এবং পরিসর বিস্তৃত হয়েছে তত। প্রাথমিক ভাবে যেটুকু পথ নিয়ে বড়বাজার গড়ে উঠেছিল তার তুলনায় আজকে হয়তো অনেক বেশি পথ। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমান সময়ে এই বাজারের তুলনায় পথটুকু শুধু প্রয়োজন মাফিকই নয়। অপ্রশস্ত। পরিকল্পনাবিহীন। তাই বড়বাজার বিশ্বের এক অন্যতম বৃহত্তম বাজার হয়েও ততটা গুণসম্পন্ন হয়ে না উঠতে পারার এটি একটি প্রধান কারণ। প্রথম প্রথম কলকাতার অন্যান্য রাস্তার মত এখানকার রাস্তা কাঁচা ছিল। সরকারি আদেশ অনুসারে রাস্তা পাকা করার জন্য পাথর আনা হয় বীরভূম থেকে। প্রথম আসে ১৭৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। ক্রমে ক্রমে এরপর থেকে কলকাতার রাস্তা সংস্কার হতে থাকে।

### আমড়াতলা স্ট্রীট

১৭৮৪ সালে উডের আঁকা মানচিত্রে এই রাস্তার নাম দেখানো আছে। সম্ভবত আমড়াতলা এই নাম এসেছে আমড়া থেকে। এক ধরনের গোল বলের মত টক ফল। প্রাচীন কলকাতায় এ জায়গায় যথেষ্ট জন বসতি ছিল। বাস করতো গ্রীক এবং আর্মেনিয়ানরা। রুজিরোজগারের উপায় ছিল ব্যবসা। মূল ব্যবসা ছিল এখান থেকে জিনিষপত্র কিনে নিজের দেশে পাঠানো। এই রাস্তা দিয়ে হাঁটতে থাকলে এখনো সেই পুরনো দিনের স্মৃতির কথা মনে করিয়ে দেয়।

বর্তমান বিপ্লবী রাসবিহারী বোস রোড থেকে শুরু হয়ে সোজা চলে গেছে উত্তর দিকে আর্মেনিয়ান স্ট্রীট পর্যন্ত। আমড়াতলা স্ট্রীট থেকে আমড়াতলা লেন বেরিয়ে মিশেছে রবীন্দ্র সরণিতে। রাস্তায় ঢোকার মুখে বাগরি মার্কেট। ফুটপাতে কিছুটা দূর পর্যন্ত শুধু প্লাস্টিকের জিনিসপত্রের ছড়াছড়ি। ব্যাগ, হাঙ্গার, ছোট বড় নানা ধরনের কৌটা। এরপর থেকে শুধু গুদাম আর গুদাম। সেখানে রয়েছে হলুদ জিরে ধনে ইত্যাদি নানা ধরনের মশলাপাতি এবং চা।

### আর্মেনিয়ান স্ট্রীট

রবীন্দ্রসরণি থেকে শুরু হয়ে ত্রৈলক্য মহারাজ সরণিতে এসে মিশেছে চণ্ডীদাস সেতুর মুখে। এই রাস্তার নাম পাল্টানোর কথা হয়েছিল পুরসভায় ৬ এপ্রিল, ১৯৫৪। পরিবর্তিত নাম ঠিক করা হয়েছিল অক্ষয় কুমার মল্লিক স্ট্রীট। সেই পরিকল্পনা পরিকল্পনাই রয়ে গেছে। আজ পর্যন্ত রাস্তার নাম পাল্টানো হয়নি।

এই অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসী ছিল আর্মেনিয়ানরা। তাদের বাসস্থান সুরম্য অট্টালিকা



সেই সময় কলকাতার আধুনিকতার পরিচায়ক ছিল। আর্মেনিয়ানরা ছিল অনেকটা ইহুদীদের মত। এদের অদম্য উৎসাহ প্রত্যেকের কাছেই ছিল প্রশংসনীয়। পুরনো দিনে এরা বেশির ভাগই ইংরেজদের কাছ থেকে কাজ পেয়েছিলেন গোমস্তা হিসেবে।

'.....They are to be commended for their always having retained the oriental dress — they have never had much social intercourses with the English. They had a church here as early as 1724,. The East India Compamy made regulation that, in whatever part of India the Armenians should amount to forty, the East India Co. would build a church for them and pay the minister's salary for seven years'.

*— Calcutta in the olden times — its localities : James Long. Calcutta review Vol 18.*

রাসায়নিক জিনিসপত্র পাওয়ার প্রধান জায়গা এটি। সমস্ত বড় বড় Chemical shop এই রাস্তার ওপর। এছাড়াও রয়েছে ছাতা এবং কাপড়ের দোকান। গুদাম আছে মশলাপাতি রাখার জন্য। তবে তার পরিমাণ অল্প।

### উৎকলমণি গোপবন্ধু সরণি

কলকাতা পুরসভা ১৯৮০ সালে ২২ মে'র সভায় কটন স্ট্রীটের নাম পাল্টে উৎকলমনি গোপবন্ধু সরণি রাখেন। পুরসভার পথের নাম পাল্টানো কমিটি এই রাস্তার নাম পরিবর্তন করার স্বপক্ষে যুক্তি দেখান, কোন ভাবেই সুতাপট্টির আজ আর অস্তিত্ব নেই কটন স্ট্রীটে [ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট জুন ২১, ১৯৮০] । মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ রোড থেকে শুরু হয়ে রাস্তাটি এসে মিশেছে রবীন্দ্র সরণিতে।

'কটন স্ট্রীট তুলাপট্টির রাস্তা বলিয়া সর্বজন পরিচিত। নামটি 'কটন' হইলেও ইহা কোন ব্যক্তি বিশেষের নামে প্রতিষ্ঠিত নহে। যদিও প্রাচীন কলিকাতার একজন সেনাপতির নাম কটন ছিল, বড়লাট পাদরির নামও কটন ছিল, গভর্নমেন্টের একজন প্রধান সেক্রেটারির নামও কটন ছিল, তাহা হইলেও তাহাদের কাহারও নামে এই পথটির নামকরণ হয় নাই। বহু পূর্বকালে জোব চার্ণক কর্তৃক কলিকাতা স্থাপনের অনেক পূর্বে, এই স্থানে তুলা ও সুতার দোকানপাট ছিল এবং নিত্য হাট হইত। এই জন্য ইহা সেই পুরাকালে 'রুয়েহাটা' (রুই - হিন্দুস্থানী শব্দ, অর্থ তুলা) বলিয়া বিখ্যাতছিল। তাহার ইংরাজী নাম কটন স্ট্রীট ও বাঙলা নাম তুলাপট্টি।

*— কলিকাতা সেকালের ও একালের : হরিসাধন মুখোপাধ্যায়*

পণ্ডিত গোপবন্ধু দাস ১৮৭৭ সালের ৯ অক্টোবর পুরী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক পড়াশোনা সারেন নিজের জায়গা থেকে। তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পাশ করেন। ছোটবেলা থেকেই গোপবন্ধু অন্য ধরনের ছিলেন। পরাধীনতার গ্লানি তাঁকে কুরে কুরে খেতো। কলকাতায় আসার পর তাই বিপ্লবী দলের সঙ্গে নাম লেখাতে দ্বিধা করেন না। জেলেও যেতে হয়েছে। ১৯২৪ সালে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় পণ্ডিত গোপবন্ধু দাসের নাম রাখেন ' উৎকলমণি' ।

সাপ্তাহিক 'সমাজ' পত্রিকা তিনি স্থাপন করেন। পরে ১৯৩০ সালের ৬ এপ্রিল ঐ কাগজ দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। উৎকলমণি শুধুমাত্র একজন সাংবাদিকই ছিলেন না। কবি ও সাহিত্যিক হিসেবে যথেষ্ট তাঁর খ্যাতি ছিল। উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত বই ঃ বন্দীর আত্মকথা, অবকাশ চিন্তা, ধর্মপদ, গো মাহাত্ম, কড়া কবিতা, ইত্যাদি।

এখানে রয়েছে খুচরো এবং পাইকারি মশলাপাতির দোকান। সদাসুখ কাটরার যথেষ্ট নাম। শাড়ি ও ধুতির আড়ৎ। এছাড়াও রয়েছে সরাফ মার্কেট। নিমানি মার্কেট। গরোদিয়া মার্কেট। সিল্ক বেনারসি থেকে শুরু করে সব ধরনের শাড়ি পাওয়া যায়। এই রাস্তার ওপর সত্যনারায়ণ পার্কের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত মার্কেটের উল্টো দিকে রয়েছে পর পর কয়েকটি খাওয়ার দোকান। ভেলপুরি, চাটপুরি, ছোলা এবং মুখরোচক ফুচকা পাওয়া যায়। ভীড় লেগে থাকে সর্বক্ষণ। মেয়ে এবং বউরাই প্রধানত ভীড় জমায় এখানে।

### কানাইলাল শেঠ স্ট্রীট

বড়তলা স্ট্রীট থেকে এই রাস্তার সূচনা। স্থানীয় মানুষদের কাছে পরিচিত নতুন বড়তলা রোড নামে। পুরসভা ১৯২৭ সালের ১৯ অক্টোবর প্রস্তাব রাখে রাস্তার নাম পাল্টে রাখা হোক কানাইলাল শেঠ স্ট্রীট [কলকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট, ২৯ অক্টোবর ১৯২৭]। এই নতুন নাম পুরসভা থেকে স্বীকৃতি পায় এবং সেই মর্মে পুরসভা আদেশ জারি করেন ১৩ ফেব্রুয়ারি, [১৯২৮ কলকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট ১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮]।

### কালাকর স্ট্রীট

বড়বাজারের মাঝখান দিয়ে এই রাস্তা দক্ষিণ থেকে উত্তরে চলে গেছে। সূত্রপাত উৎকলমণি গোপবন্ধু সরণি থেকে শেষ হয়েছে কালিকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রীটে। এ অঞ্চলে জনসাধারণের পরিবহন চলাচলের একমাত্র পথ। বাস এবং মিনিবাস চলে।

১৮৭৬ সালের কর্পোরেশনের স্ট্রীট ডাইরেকট্রিতে কালাকর স্ট্রীটের নাম উল্লেখ রয়েছে। মার্ক উড বা আপজন তাঁদের মানচিত্রে দেখাননি এই রাস্তার নাম। প রিবর্তে উল্লেখ করেছেন শুধু বড়বাজার।

এই পথে পরিবহনের গতি অত্যন্ত শ্লথ থাকে। মানুষের ভীড়। গাড়ির পেছনে গাড়ি। রাস্তার দু'পাশে সারি সারি দোকান পাট। বেশির ভাগই পোষাক পরিচ্ছদের। রয়েছে কলাকার মার্কেট। ব্যাঙ্ক রয়েছে দু'টি, ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক ও বিজয়া ব্যাঙ্ক। একদম উত্তর প্রান্তে আছে কালাকর স্ট্রীট ডাকঘর।

### কালিকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রীট

পুরসভা চিৎপুর রোড অধুনা রবীন্দ্র সরণি থেকে স্ট্রান্ড রোড পর্যন্ত যুক্ত হওয়া পথের নাম সুপারিশ করেন কালিকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রীট [কলকাতা কর্পোরেশন গেজেট ডিসেম্বর ১৯, ১৯৩৬]। এই পথের পূর্ব নাম ছিল জগন্নাথ ঘাট রোড[ সংযোজিত অংশ]। ১৯৩৭ সালের ১০ মে অনুমতিক্রমে স্থির হয় কালিকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রীট।

বাবু কালিকৃষ্ণ ঠাকুর ছিলেন বাংলার একজন নামকরা জমিদার এবং অবশ্যই ঠাকুর



পরিবারের এক অন্যতম বংশধর। তাঁর দান ধ্যানের কথা বিশেষভাবে সুবিদিত। সেই সময়ে তার পরিমাপ হিসেব করলে দাঁড়াবে প্রায় দশ লক্ষ টাকা। শুধুমাত্র কলকাতা শহরে তাঁর এই দান ধ্যান সীমাবদ্ধ ছিলো না, বিস্তৃত ছিল মফস্বল পর্যন্ত। এই দানবীর মানুষটির মৃত্যু হয় ১৯০৫ সালে। সেই সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। কালিকৃষ্ণ ঠাকুরের একমাত্র নাতি রাজা প্রফুল্ল নাথ ঠাকুর তাঁর বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারি হন। শহরের বাইরে অন্যত্র আরো দুটি রাস্তা কালিকৃষ্ণ ঠাকুরের নামে উৎসর্গিকৃত।

বর্তমানে এই পথের দুধারে রয়েছে বিভিন্ন ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে মাল নিয়ে যায় এবং নিয়ে আসে এই সংস্থাগুলো। এ ছাড়া রয়েছে বেশ কিছু টায়ারের দোকান। ব্যাঙ্ক রয়েছে তিনটি দি বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ, দেনা ব্যাঙ্ক ও হংকং ব্যাঙ্ক। দাগা হাউস আছে পথের উত্তর দিকে। গনেশ সিনেমা একমাত্র চলচ্চিত্র দেখার জায়গা। মন্দির আছে তিনটি। জোড়াসাঁকো কালীমাতার মন্দির, বৈকুণ্ঠনাথ মন্দির (শ্বেত পাথরের) এবং শ্রী পুঁটে কালীতলা (স্থাপিত ৯৬৪ বঙ্গাব্দ)। এই মন্দিরের উল্টো দিকে ছেলে মেয়েদের খেলার জন্য রয়েছে একটি পার্ক।

### কারবালা মহম্মদ স্ট্রীট

আগা কারবালুল ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। পরোপকারী হিসেবে তাঁর যথেষ্ট নাম ছিল। সাধারণ মানুষের দুঃখ এবং দুর্দশার কথা শুনলে তার পাশে এসে দাঁড়ানো তাঁর কাছে ছিল কর্তব্য। ১০ নং পর্তুগীজ চার্চ স্ট্রীটে তিনি জনসাধারণের জন্য এক ইমামবাড়া তৈরি করেন। এখানে ধর্মীয় শিক্ষার আসর বসে এবং প্রতি বছর শিয়া সম্প্রদায়ের এক বিরাট মিছিল বেরোয় ইমামবাড়া থেকে। কারবালুলের মৃত্যুর শতবর্ষ পূর্তি হয় গত ২২ জুলাই ১৯৫৬ এবং সেই উপলক্ষে যে অনুষ্ঠান হয়েছিল তাতে উপস্থিত ছিলেন তদানিন্তন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডঃ এইচ.সি. মুখার্জ্জী (ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেট জুলাই ১৮, ১৯৫৬)। পথটি আমড়াতলা স্ট্রীটের সঙ্গে পর্তুগীজ চার্চ স্ট্রীটের সংযোগকারী রাস্তা। পাইকারি ব্যবসায়ীদের গদি এবং গুদাম দুই -ই রয়েছে এখানে।

### গোবিন্দ ধর লেন

এই রাস্তার নাম ১৮৭৬ সালের কার্পোরেশনের স্ট্রীট ডাইরেক্ট্রিতে উল্লেখ রয়েছে। ধর পরিবারের কেউ কেউ এখানে বাস করেন। আমড়াতলা লেন থেকে শুরু হয়ে গোবিন্দ ধর লেন আর্মেনিয়ান স্ট্রীটে এসে মিশেছে।

বাবু গোবিন্দ চন্দ্র ধর সমাজের এক বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। মূলত তিনি ছিলেন ইন্ডিয়ান পাবলিক অপিনিয়ন কাগজের সম্পাদক। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন গুরুত্ব পদের অধিকারী ছিলেন। যেমন ডাইরেক্টার ঃ হিন্দু পরিবার বার্ষিক বৃত্তি ভাতা, সভাপতি ঃ কলিকাতা সাহিত্য পরিষদ ইত্যাদি। গোবিন্দ চন্দ্র ধর ১৮৩০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষালাভ ঃ হেয়ার স্কুল, শীল'স্ ফ্রি কলেজ এবং জেনেরাল অ্যাসেম্বলি কলেজ। কর্মস্থলও তাঁর এক জায়গায় সীমাবদ্ধ ছিল না। সূত্রপাত হয় বোর্ড অফ রেভিনিউ থেকে পরে মিলিটারি বোর্ড এবং এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল। লেখালিখির ব্যাপারে তিনি যুক্ত ছিলেন হিন্দু প্যাট্রিয়টের সঙ্গে।

নিয়মিত রচনা প্রকাশিত হত সমসাময়িক কাগজ ইংলিশম্যান, বেঙ্গল হারকারু, ইন্ডিয়ান মিরর ইত্যাদি। এই গুণীজন ১৯০৭ সালের ১৯ জুলাই ভোর তিনটের সময় ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭।

### জগমোহন মল্লিক লেন

জগমোহন মল্লিক গৌড়চরণ মল্লিকের পুত্র। ভাই বিখ্যাত রূপলাল মল্লিক। ১৮৭৬ সালের কর্পোরেশন স্ট্রীট ডাইরেক্ট্রিতে এই রাস্তার নাম উল্লেখ রয়েছে। এবং এখনো সেই একই নাম রয়েছে। পথের সূচনা মহাত্মা গান্ধী রোড থেকে মিশেছে এসে কলাকার স্ট্রীটে। সত্যনারায়ণ পার্ক যেখানে এখন শীততাপ নিয়ন্ত্রিত মার্কেট এই পথের পাশে অবস্থিত। আর রয়েছে কাপড়ের দোকান এবং কিছু পোষাক পরিচ্ছদের। উৎকলমণি গোপবন্ধু সরণির সংযোগস্থলে রয়েছে প্রচুর ফলের দোকান।

### দিগম্বর জৈন টেম্পল রোড

কলকাতা পুরসভা ১৯৫৭ সালের ১৫ নভেম্বর, শুক্রবারের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে দই হাট্টা স্ট্রীট এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হবে দিগম্বর জৈন টেম্পল রোড [ কলকাতা মিউনিসিপাল গেজেট নং ২৩, ১৯৫৭] । বড়তলা স্ট্রীট এবং শ্রী হরিরাম গোয়েঙ্কা স্ট্রীটের সহযোগকারী রাস্তা। নতুন পরিবর্তিত নাম কাগজপত্রে চালু হয় ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৮।

দিগম্বর জৈন মন্দিরের অবস্থান শ্রী হরিরাম গোয়েঙ্কা স্ট্রীট এবং দিগম্বর জৈন টেম্পল রোডের সংযোগস্থলে ১নং বসাক লেনে। ভীড় ও ব্যস্ত বড়বাজার এলাকায় মন্দিরটি তৈরি করেন হালসিলাল আগরওয়াল ১৮২৬ সালে। হালসিলাল ছিলেন নিঃসন্তান তাই ভাইঝির বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর তাঁর সমস্ত সম্পত্তি মন্দিরের জন্য দান করে দেন। এমন কি তিনি যেখানে বাস করতেন, ৩৫ ব্রজদুলাল স্ট্রীট, সেটিও শেষে মন্দির হিসাবে পরিগণিত হয়। নামকরণ হয় বড় দিগম্বর জৈন মন্দির।

### নবাব লেন

নবাব মীরজাফর খান এই নামটি ইতিহাসের পাতায় বিশ্বাসঘাতক বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন প্রবর্তনের মূল নায়ক ছিলেন তিনি। তিনি বাঙলার নবাব হয়ে শাসন চালিয়েছিলেন প্রথমে ১৭৫৭ থেকে ১৭৬০ সাল এবং পরে ১৭৬৩ থেকে ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত। মীরজাফরের মৃত্যু হয় ১৭৬৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি মুর্শিদাবাদে। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪। তিনি কলকাতায় এসে বাস করেছিলেন কিছুদিন [সেপ্টেম্বর ৩ থেকে ডিসেম্বর ৯, ১৭৬৪] । অর্থাৎ মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে। কোলকাতায় বাস করার সময় তাঁর ঠিকানা ছিল, ৪৭ স্ট্রান্ড রোড, পুরনো টাকশালের কাছে। নবাব লেন সেই পুরনো স্মৃতিকে বহন করে চলেছে। মুর্শিদাবাদের নবাব এই রাস্তাটি তৈরি করার জন্য জমি দান করেন ১৮৮৫ সালে [কলকাতা মিউনিসিপাল গেজেট ফেব্রুয়ারি ৫, ১৯২৭]

নবাব লেন স্ট্রান্ড রোড এবং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোডের সংযোগকারী রাস্তা। সম্ভবত এই অঞ্চলে এত ক্ষুদ্র পরিসরের রাস্তায় মন্দির রয়েছে সবচেয়ে বেশি। হনুমান মন্দির, শঙ্কর



মন্দির, জগন্নাথ মন্দির ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় তেরখানি দেবালয় রয়েছে এই রাস্তার ওপর। মন্দিরগুলো সবই রাস্তার একধারে অন্যধারে আদা এবং রসুনের পাহাড়। ব্যাপারিরা প্রয়োজন মত আদা রসুন নিয়ে যায় এখান থেকে।

### নলিনী শেঠ রোড

রায় নলিনী নাথ শেঠ বাহাদুর কলকাতার বিখ্যাত শেঠ বসাক পরিবারের বাবু মাধব কৃষ্ণ শেঠের চতুর্থ সন্তান। নলিনী নাথের জন্ম হয় ১৮৭৭ সালের ৭ জানুয়ারি। শিক্ষালাভ করেন প্রথমে হিন্দু স্কুলে পরে প্রেসিডেন্সী কলেজে। চাকরি জীবনের সূত্রপাত হয় ১৯০৫ সালের ৩০ মার্চ। কলকাতার উচ্চ ন্যায়ালয়ের সলিসিটার হিসেবে নিজেকেযুক্ত করতে পেরে পেশার চরম পর্যায়ে পৌছান। ১৯২০ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের কমিশনার। তিনি বেঙ্গল প্রভিনসিয়াল কংগ্রেস কমিটির অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ ছিলেন এবং কিছুদিনের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন কংগ্রেস সাংসদ। নলিনী শেঠ রায়বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হন ১৯২৩ সালে।

কলকাতা পুরসভা ১৯৩০ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি বিজ্ঞপ্তি জারি করে প্রস্তাব রাখেন ময়রাহাটা স্ট্রীটের কিছু অংশ এবং ময়দাপট্টি লেন নাম পরিবর্তন করে রাখা হবে নলিনী শেঠ রোড [কলকাতা মিউনিসিপাল গেজেট মার্চ ৮, ১৯৩০] পরে ১৯৩১ সালের ২৭ মার্চ পুরসভার সভায় পরিবর্তিত নতুন নাম অনুমোদন পায় [কলকাতা মিউনিসিপাল গেজেট এপ্রিল ৪, ১৯৩১] এবং বিজ্ঞাপিত হয় ২৪ এপ্রিল ১৯৩১। নলিনী নাথ শেঠ বাস করতেন ৩, বাঁশতলা স্ট্রীট [অধুনা হরিরাম গোয়েঙ্কা স্ট্রীট। এখানে এখন সোনা পট্টি। রাস্তার দু পাশে শুধু সার সার সোনার দোকান]।

### নেতাজী সুভাষ রোড

নগর কলকাতার মধ্যে এটি অত্যন্ত পুরনো পথ। পলাশী যুদ্ধের বিজেতা রবার্ট ক্লাইভের নামে দীর্ঘ এবং প্রশস্ত পথটির নামকরণ করা হয়। ক্লাইভ প্রথমে এই রাস্তার ওপর রয়্যাল এক্সচেঞ্জে বাস করতেন। পরে স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস বাড়ির অধিকর্তা হন। লর্ড কার্জনের হাতে এই বাড়িতে পড়ে প্রস্তর ফলক। ফ্রান্সিসের এ বাড়ি ছাড়াও আলিপুরে একটা বাগান বাড়ি ছিল। সেই সময়ের কাউন্সিলের মেম্বর থেকে গর্ভনর পর্যন্ত প্রত্যেকেরই দু'টি করে বাড়ি ছিল খোলামেলা জায়গায়। গাছপালা তাদের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। এই বাগান বাড়ির বর্ণনা দিতে ফ্রান্সিস বার্ককে লিখেছিলেনঃ আলিপুরে আমার এক আবাস বাটি আছে। সমগ্র বঙ্গদেশে সেরূপ সুন্দর বাড়ি আর নাই। আমি দেড়শত চাকর নিযুক্ত করিয়াছি। ঘোড়াগাড়ি সবই আছে। কিন্তু আমার কেমন একটা স্বভাবদোষ যে, আলিপুর হইতে কলিকাতায় গিয়া 'হর্ন' নামক ট্যাভার্নে ক্লারেট - মদ্য দুই চার গ্লাস না খাইলে আমার মাথা ঠিক থাকে না''।

*— কলিকাতা সেকালের ও একালের ঃ হরিসাধন মুখোপাধ্যায়*

কলকাতা পুরসভা ১৯৪৭ সালের ১৩ আগষ্ট, বুধবার সভায় প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ক্লাইভ স্ট্রীটের নাম পরিবর্তন করে রাখা হবে নেতাজী সুভাষ রোড। এই পথের বিস্তৃতি হবে, পশ্চিমে ডালহৌসি স্কোয়ার, চার্চ প্লেস এবং ক্লাইভ

স্ট্রীট, হ্যারিসেন রোড [বর্তমান মহাত্মা গান্ধী রোড ] পর্যন্ত। [কলকাতা মিউনিসিপাল গেজেট ৩০ আগষ্ট ১৯৪৭।]

সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম হয় উড়িষ্যার কটকে ১৮৯৭ সালে। তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য আজীবনকাল যুদ্ধ করেছিলেন। আই. সি. এস. পরীক্ষায় পাস করেও তিনি ইংরেজদের অধীনে কাজ করতে রাজী হননি। কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে তিনিই সর্বাপেক্ষা স্বাধীনচেতা নেতা ছিলেন। কংগ্রেসীদের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় তিনি কংগ্রেস দল ছেড়ে দিয়ে 'ফরোয়ার্ড ব্লক' নামে নতুন একটি দল গড়ে তুললেন। দেশের কাজে বহুবার জেলে গেছেন। নজরবন্দী থাকাকালীন তিনি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বিদেশে পালিয়ে যান। সিঙ্গাপুরে তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজ দল গঠন করেন। এই সময়ই তাঁকে 'নেতাজী ' আখ্যা দেওয়া হয়। সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী নিয়ে তিনি মণিপুরে প্রথম স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেন ও 'জয় হিন্দ' ধ্বনি উচ্চারণ করেন। প্রচলিত আছে যে ১৯৪৫ সালে এক বিমান দুর্ঘটনায় নাকি তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্তও অনেকে এ কথা বিশ্বাস করে না।

নেতাজী সুভাষ রোড এ অঞ্চলের এক দীর্ঘ এবং অন্যতম পথ। এ পথের পাশের ব্যবসায়িদের ব্যবসার ধরন একটু অন্যধরনের। কেননা এ জায়গায় মূলত এজেন্সি অফিস কিংবা অর্ডার সাপ্লায়ার্সই বেশি। ভারতবর্ষের প্রাচীন ও বিখ্যাত জেসপ কোম্পানির প্রধান কার্যালয় এই রাস্তার ওপর অবস্থিত ছিল। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্পূর্ণ জায়গাটি কিনে নিয়েছেন। নতুন দফতর স্থাপিত হবে। এ ছাড়া রয়েছে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির দোকান। পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরনের বেল্ট , ধাতুর জাল, নাট বল্টু। রকমফের পাইপ এর সমাহার রয়েছে এখানে [ধাতু/প্লাস্টিকের]। পাওয়া যায় টিউবওয়েল, কড়াই, বালতি ইত্যাদি নানা ধরনের জিনিস। আর রয়েছে হোমিওপ্যাথি ওষুধের দোকান।

### পগেয়া পট্টি স্ট্রীট

ব্যস্ত বড়বাজার এলাকায় কিছু কিছু অংশ কতগুলো পট্টিতে বিভক্ত হয়েছিল। কেননা সেই সব অঞ্চলগুলো নির্দিষ্ট কিছু জিনিসপত্র কেনা বেচার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। অঞ্চলের নামকরণ তৈরি হয় জিনিসপত্রের ওপর নির্ভর করে যেমন ময়দা পট্টি, সুতাপট্টি, খ্যাংড়া পট্টি ইত্যাদি। কিছু কিছু জায়গার নাম পরিবর্তিত হয়েছে। পগেয়া পট্টি স্ট্রীট আজো বর্তমান। লোক মুখে চলতে চলতে যে নাম এসে দাঁড়িয়েছে তার কোন সরকারি প্রস্তাব কিংবা অনুমোদন প্রয়োজন হয় না।

পগেয়া পট্টি স্ট্রীট দীর্ঘ পথ নয় এবং তেমন প্রশস্তও নয়। উৎকলমণি গোপবন্ধু সরণি থেকে শুরু হয়ে ত্রৈলক্য মহারাজ সরণিতে এসে মিশেছে। পর্দার কাপড়, বিছানার চাদর, লুঙ্গি, আসন, সতরঞ্চি, ছাতা ইত্যাদি প্রধান বিক্রয়ের জিনিস।

### পণ্ডিত পুরুষোত্তম রায় স্ট্রীট

কম দৈর্ঘ্যের পথ। এক দিকে ব্রাবর্ণ রোড [ বর্তমান নাম ত্রৈলক্য মহারাজ সরণি] চণ্ডীদাস সেতুর মুখ, অন্যদিকে যমুনালাল বাজাজ স্ট্রীট। এই অঞ্চলের পুরনো নাম খ্যাংড়া পট্টি। কলকাতা পুরসভার আদেশানুক্রমে ১০ মে ১৯৫৭, রাস্তার নামকরণ হয় পণ্ডিত পুরুষোত্তম



রায় স্ট্রীট। পুরুষোত্তম রায় বড়বাজার অঞ্চলের একজন কংগ্রেস দলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। জন্ম হয় ১৮৮৬ সালে। খুব ছোট বয়েস থেকে তিনি কংগ্রেস দলে নাম লেখান। কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য ছিলেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি যথেষ্ট কাজ করেছেন। কয়েকবার কারাবরণ করতে হয়। এই সংগ্রামী নেতা মৃত্যু বরণ করেন ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৯।

উল, সুতো, প্লাস্টিকের খেলনা, বাজির মরশুমে বাজি, মেয়েদের কপালের টিপ, খুঁটিনাটি এরকম আরো অনেক কিছু পাওয়া যায় এ গলিতে। এছাড়াও রয়েছে প্রিয় গোপাল বিষয়ীর মত ঐতিহ্যপূর্ণ বস্ত্রালয়।

বিষয়ী খেতাব পাওয়া পদবী। মূল পদবী দাস। আদি নিবাস ছিল মুর্শিদাবাদ। সেখান থেকে উঠে চলে আসতে হয়। বরং বলা যায় পালিয়ে আসতে হয়। ভয় পেয়ে। এটাকে বলা যায় শিল্পী হওয়ার বিড়ম্বনা। সেই সময়ের ভাল ভাল শিল্পীদের যে সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল, প্রিয় গোপাল বিষয়ী এবং তাঁর পূর্বপুরুষ তার হাত থেকে রেহাই পাননি।

তাই জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে চলে আসতে হয় । বর্ধমান জেলার মেমারিতে এসে আস্তানা গাড়েন বিষয়ী পরিবার। তারপর থেকে আবার নতুন করে যাত্রা শুরু। শেষে এই কাপড়ের ব্যবসা। বড়বাজার অঞ্চলে দোকান ভাড়া নিয়ে নতুন উদ্যোমে যাত্রা। ১৮৬২ সাল থেকে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল তার গতি আজো সেই একইভাবে এগিয়ে চলেছে।

এখন যে জায়গায় পণ্ডিত পুরুষোত্তম রায় স্ট্রীটে দোকান। এটি ১৮৬২ সালে প্রিয় গোপাল বিষয়ী স্থাপিত দোকানটির পরিবর্তিত স্থান। কেননা চেলি পট্টিতে স্থাপিত হয়েছিল প্রথম দোকান। ব্রাবোর্ণ রোড বর্তমান নাম বিপ্লবী ত্রৈলক্য মহারাজ সরণি তৈরি হওয়ার সময় চেলি পট্টি ভেঙে যায়। তারপর থেকেই দোকান পণ্ডিত পুরুষোত্তম রায় স্ট্রীটে। যেহেতু সেই সময় রেল লাইনের সূচনা হয়নি, মেমারি থেকে গরুর গাড়ি করে গঙ্গার ঘাটে এসে তারপর নৌকায় চড়ে বড়বাজার পৌঁছুতে হতো।

দোকানের এই ব্যবসা ছাড়া প্রিয় গোপাল সিল্কে শাড়ি ছাপা শুরু করেন । কারখানা স্থাপনা করেন শ্রীরামপুরে। সম্ভবত বাংলায় প্রথম সিল্ক কাপড়ে প্রিন্টিং - এর সূচনা হয় এ জায়গায়। প্রথম প্রথম ছাপা হতো রুমাল এবং চেলি। পরে শুরু হয় শাড়ি ছাপা। ১৯২৫ সালে লর্ড কার্মাইকেল শ্রীরামপুরের প্রিন্টিং কারখানা পরিদর্শন করেন এবং দেখে খুশি হয়ে সর্বাত্মক উন্নতি কামনা করে প্রশস্তি পত্র লিখে দেন। প্রশস্তি পত্রটি এখনো দোকানের শোভাবৃদ্ধি করে চলেছে।

এই অঞ্চলে আরো বহু বস্ত্রব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান আছে। তবে সবচেয়ে সুপ্রাচীন ও খ্যাতনামা বস্ত্রব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নাম প্রিয়গোপাল বিষয়ী।

### বনফিল্ড লেন

সম্পূর্ণ নাম উইলিয়াম বনফিল্ড। তিনি ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়কালের এক খ্যাতনামা নিলামদার। এই লেনে তার বসত বাড়ি ছিল। জেমস্ অগাস্টাস হিকির বিরুদ্ধে বেঙ্গল গেজেটে যে আরোপ আনা হয়েছিল সেই বিচারের তিনি একজন নির্ণায়ক ছিলেন। বিচারে নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় রায় প্রকাশ হয় ২৭ জুন, ১৭৮১ [ Bengal Past & Present Vol. 25 P 148] 'তাঁর কন্যা অ্যান ব্যাপটাইজড্ হন কলকাতায় ১৭৭৩ সালে ২ ফেব্রুয়ারি।

ক্যালক্যাটা গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় [৫ আগষ্ট, ১৭৮৪] "On Thursday, the 2nd Sept. next, will be sold by public outcry by Mr Bonfield at his auction room, if not before sold by private sale, that extensive piece of ground belonging to Warren Hastings Esq. attached Rishera (Ishara) situated on the western bank of the river two miles below Serampore consisting of 136 Bighas, 18 Kathas of which are Lakherage land or land paying no rent."

বনফিল্ডের মৃত্যু হয় ১২ জানুয়ারি, ১৭৮৮, তখন তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪১ বছর। মৃত্যুর পর তাঁকে কবর দেওয়া হয় দক্ষিণ পার্ক স্ট্রীটের করব স্থলে। উডের ম্যাপে বনফিল্ড'স্ লেন ৬৫ নং দিয়ে চিহ্নিত করা আছে।

বনফিল্ড লেন নেতাজী সুভাষ রোড থেকে শুরু হয়ে মিশেছে আর্মেনিয়ান স্ট্রীটের সংযোগ স্থলে। অ্যালমনিয়ামের বাসনপত্র, প্লাস্টিকের খেলনাপাতির, খাতা, পেনসিল প্রধানত পাওয়া যায় এখানে।

### বড়তলা স্ট্রীট

এখনো রবীন্দ্র সরণির ওপর বড়তলা থানার কাছাকাছি বটগাছ লক্ষ্য করা যায়। এক সময় ঐ জায়গায় জোড়া বটগাছ ছিল কেউ কেউ বলেন। এই বট তলা থেকেই রাস্তার নাম বড়তলা দাঁড়িয়েছে। এবং এখনো সেই একই নামে পরিচিত রাস্তার নাম। মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড থেকে শুরু হয়ে রবীন্দ্র সরণির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। শরৎ চন্দ্র মিত্র এই রাস্তার বর্ণনা দিতে যেয়ে বলেছেন, বিডন স্কোয়ারের কিছু উত্তরে এক জোড়া বটগাছ রয়েছে। এ অঞ্চলের মধ্যে গাছদুটো খুবই প্রাচীন। কলকাতা পুরসভা রাস্তার নাম পরিবর্তন করে শহিদ বাবুলাল স্ট্রীট রাখার কথা প্রস্তাব রেখেছেন। কিন্তু পরিবর্তিত নাম এখনো পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। এই রাস্তার ওপর একটি মার্কেট রয়েছে [ জে জে মার্কেট ], পাওয়া যায় তৈরি পোষাক পরিচ্ছদ আর রয়েছে কিছু খুচরো মশলাপাতির দোকান।

### বিপ্লবী ত্রৈলক্য মহারাজ সরণি

কলকাতা পুরসভা ব্রাবোর্ণ রোডের নাম পরিবর্তন করে বিপ্লবী ত্রৈলক্য মহারাজ সরণি রাখেন ৯ আগষ্ট, ১৯৭১। ত্রৈলক্য চক্রবর্তী যাঁকে সম্মান জানানোর জন্য মহারাজা আখ্যা দেওয়া হয় তাঁর প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এই শ্রদ্ধা। কলকাতা পুরসভা কর্তৃক পরিবর্তিত নাম কার্যকর হয় ১৯৭১ সালের প্রারম্ভে [কলকাতা মিউনিসিপাল গেজেট ২৪ এপ্রিল, ১৯৭১]।

জনসাধারণের জন্য ব্রাবোর্ণ রোড খুলে দেওয়া হয় ১৯৫০ সালের জুলাই মাসে। সেই সময় রাস্তাটি তৈরি করার জন্য খরচ পড়েছিল দু'কোটি টাকা। কলকাতা পুরসভা কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব অনুমোদনের দিনাঙ্ক ১১৪০ তারিখ ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫ [কলকাতা মিউনিসিপাল গেজেট ২২ জুলাই ১৯৫০]। ১৯৩৭ - ৩৮ সালে ব্রাবোর্ণ বাংলার গর্ভনর ছিলেন।

ত্রৈলক্য মহারাজের জন্ম হয় ১৮৮৯ সালে ময়মনসিং জেলার কাপাশিয়ায়। তাঁর পিতা



দুর্গাচরণ এবং ভাই কামিনিমোহন বিপ্লবের সমর্থক ছিলেন । ছোট বেলা থেকেই ত্রৈলক্য দেশকে স্বাধীন করার জন্য স্বপ্ন দেখতেন। নিজেকে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেন। ১৯০৬ সালে অনুশীলন সমিতির সদস্য পদ গ্রহণ করেন। অভিযুক্ত হয়ে জেলে যান ১৯১৪ সালে কলকাতায়। প্রমাণিত হয় তিনি বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় যুক্ত ছিলেন। এই বিপ্লবী নেতার দেহাবসান হয় দিল্লীতে। তারিখ ছিল ৯ আগষ্ট, ১৯৭০। তার মৃতদেহ কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছিল। দীর্ঘদিন কারাবাস করার অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি একটি বই লিখেছেন । নাম ঃ তিরিশ বছর জেলের মধ্যে। গ্রন্থখানি আমাদের কাছে দলিল হয়ে থাকবে।

বিপ্লবী ত্রৈলক্য মহারাজ সরণি যথেষ্ট প্রশস্ত তবু ব্যস্ত সময়গুলোতে মানুষ এবং যানবাহনের আধিক্যে থমকে যায়। রাস্তার দু'পাশে কিছু ব্যাঙ্ক রয়েছে, বড়বড় কোম্পানির শোরুম আর অফিস বাড়ি। আগে সম্পূর্ণ রাস্তা মিশেছিল স্টার্ণ রোডের সঙ্গে, হাওড়া ফ্লাইওভার তৈরি হওয়ায়] কিছুটা রদবদল হয়েছে। কেননা রাস্তার মাঝখানের অংশ যুক্ত হয়েছে হাওড়া ফ্লাই ওভারের সঙ্গে যার বর্তমান নাম চণ্ডীদাস সেতু [২৮. ৮. ৮৯ তারিখ থেকে।]

### বিপ্লবী রাসবিহারী বোস রোড

কলকাতা পুরসভা ১৯৬০ সালের ২৫ মার্চ সভায় ক্যানিং স্ট্রীটের নাম পরিবর্তন করে রাখেন বিপ্লবী রাসবিহারী বোস রোড। যদিও এই প্রস্তাব ১৯৪৯ সালের ১৩ এপ্রিল স্থির করা হয়েছিল। [কলকাতা মিউনিসিপাল গেজেট মে ২, ১৯৫৯]। পাকাপাকি ভাবে নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় আগষ্ট ৫, ১৯৬০[কলকাতা মিউনিসিপাল গেজেট আগষ্ট ২০, ১৯৬০]। ক্যানিং স্ট্রীটের নাম পরিবর্তন করে রাসবিহারী বোস রোড রাখা হোক এই প্রস্তাব প্রথম আসে রাসবিহারী বোস স্মারক সমিতির কাছ থেকে। বিপ্লবীর ৭৩ তম জন্মদিন পালন করা হয় কলেজ স্ট্রীট ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে ২৬ মে, ১৯৫৮। এই সভার সভাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন ডঃ কালিদাস নাগ। সেইদিন ঐ সভায় সমিতির পক্ষ থেকে রাসবিহারী বোসের নামে রাস্তার নামকরণের প্রস্তাব রাখা হয় [কলকাতা মিউনিসিপাল গেজেট মে ৩১, ১৯৫৮]। প্রথমে ঠিক হয়েছিল বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বোস রোড নাম হবে। পরে পরিবর্তন করে নাম রাখা হয় বিপ্লবী রাসবিহারী বোস রোড। পুরসভা ছোট নাম রাখার পক্ষে যুক্তি দেখায়।

লর্ড ক্যানিং ছিলেন ভারতের প্রথম ভাইসরয়। তার নাম অনুসারে মুরগিহাট্টার এই রাস্তার নামকরণ করা হয়েছিল ক্যানিং স্ট্রীট। ২৮ স্ট্রাণ্ড রোড থেকে রাস্তার সূচনা হয়েছে । যুক্ত হয়েছে বর্তমান রবীন্দ্র সরণিতে এসে।

"গঙ্গার ধারে স্ট্রাণ্ড রোড হইতে আরম্ভ হইয়া এই পথটি বরাবর চিৎপুর রোডে ফৌজদারি বালখানায় আসিয়া মিশিয়াছে। পূর্বে ইহা 'মুরগিহাটা' বলিয়া পরিচিত ছিল এবং এখনও আছে। ভারতবর্ষের প্রথম ভাইসরয় স্বনাম - প্রসিদ্ধ লর্ড ক্যানিং- এর নামে এই পথটির এইরূপ নামকরণ হইয়াছিল। পুরাকালে এই অংশে পর্তুগীজগণ বাস করিত। এখানে একটি বাজারে মুরগি বিক্রয় হইত বলিয়া 'মুরগিহাট্টা' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। উডের ম্যাপে (১৭৮৪) খ্রীষ্টাব্দ মুরগিহাট্টার অস্তিত্ব দেখা যায়। এই পথের সান্নিধ্যে পর্তুগীজদের একটি

পুরাকালের গির্জা আছে। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে আর্মির ম্যাপেও এই গির্জার স্থান দেখতে পাওয়া যায়।"

*— কলিকাতা সেকালের ও একালের : হরিসাধন মুখোপাধ্যায়*

বর্ধমান জেলার সুবলদহ গ্রামে ১৮৮০ সালে রাসবিহারী বোস জন্মগ্রহণ করেন। মহাবিপ্লবী বাঙ্গালী। বড়লাট হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা ছুঁড়ে হত্যা করতে গিয়ে বিফল হন। এরপর তিনি দেশ বিদেশে বিপ্লবীদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে গোপনে বাংলায়, যুক্তপ্রদেশে ও পাঞ্জাবে বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে থাকেন। নানা ষড়যন্ত্রের সঙ্গে লিপ্ত সন্দেহে ইংরেজ সরকার তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য বহু টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে। রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় পরিচয়ে পি. আর. ঠাকুর ছদ্মনামে জাপানে পালিয়ে সেখানে টোকিও - ইন্ডিয়ান লিগ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে তিনি ব্রহ্ম, মালয় প্রভৃতি স্থানের ভারতীয়দের নিয়ে আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ বা ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডস্ লিগ অব ইস্ট এশিয়া গঠন করেন। পরে সুভাষচন্দ্র বসু জাপানে গেলে তিনি সুভাষচন্দ্রের হাতে আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের নেতৃত্ব তুলে দেন। বিপ্লবী রাসবিহারী বোস ১৯৪৪ সালে জাপানে দেহত্যাগ করেন।

বিপ্লবী রাসবিহারী বোস রোডে মোট ব্যাঙ্ক রয়েছে চারখানি, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, ইউকো ব্যাঙ্ক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এবং ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া। পাওয়া যায় পাইপ [ধাতু ও প্লাস্টিক] পাইকা, ফিটিং গমভাঙ্গার মেশিন, পাম্প, মোটোর, পাম্প বেল্ট, কাগজ রিপেয়ারিং যন্ত্রপাতি, আয়না, প্লাস্টিকের চুড়ি, ফিতা, খেলনা, বিভিন্ন ধরনের কৌটা কপালের টিপ ইত্যাদি। এছাড়াও রয়েছে একটি পুরনো বই প্রকাশনী সংস্থা, রাজেন্দ্র লাইব্রেরী এবং একটি জৈন মন্দির শ্রী (গুজরাতি ) জৈন শ্বেতাম্বর মূর্তি পূজক সংঘ।

### মনোহর দাস স্ট্রীট

কম দৈর্ঘ্যের পথ। যমুনালাল বাজাজ স্ট্রীট থেকে আরম্ভ হয়ে সোনা পট্টির মুখে এসে মিশেছে। মনোহর দাস কাশী থেকে এসেছিলেন। বিত্তবান পিতা গোপাল দাস সাহ। এর বংশধর পণ্ডিত লালা ভগবান দাস ছিলেন কাশীর বিখ্যাত দার্শনিক। জনহিতার্থে কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় নানা ধরনের জিনিস তৈরি করে দেন।

এই রাস্তার ওপর মনোহর দাস কাটরা। অঞ্চলের সবচেয়ে পুরনো কাটরা। মনোহর দাস কাটারার মূলত দু'টো ভাগ। এক অংশে পাওয়া যায় ঘর গেরস্থালির নানা জিনিসপত্র যেমন তালা, ছুরি, কাঁচি, শিরিষ কাগজ, দরজা জানলার কব্জা, অ্যালুমিনিয়ামের সিট এবং নানা জিনিসপত্র, কাঁসার বাসন ইত্যাদি। অন্য অংশে থান কাপড়, সুটিং শার্টিং এর কাপড় ইত্যাদি।

### মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড

দরমাহাট্টা স্ট্রীটের নাম পরিবর্তন করে মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড রাখা হবে এই প্রস্তাব নেওয়া হয় ১৯৩৬ সালের ৮ ডিসেম্বর[কলকাতা মিউনিসিপাল গেজেট ডিসেম্বর ১৯, ১৯৩৬]। নতুন নাম বহাল হয় ১৯৩৭ সালে ১০ মে থেকে। মোটামুটি দীর্ঘ পথ মিরবহর ঘাট স্ট্রীট থেকে মহর্ষি দেবেন্দ্র রোডের সূচনা শেষ হয়েছে কালিকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রীটে মিশে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ [১৫ মে ১৮১৭ - জানুয়ারি ১৯, ১৯০৫]। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের



পিতা। পরম ধার্মিক, স্বনামধন্য মনীষী। ব্রাহ্মসমাজের নেতা ও শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা। পিতা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। পড়াশোনা করেন হিন্দু কলেজে। পরে পিতার সঙ্গে ব্যবসার কাজে যোগ দেন। তিনি 'তত্ত্ববোধিনী' নামক মাসিক পত্রিকা ও বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ছিলেন। স্বভাব চরিত্রে ঋষিতুল্য ছিলেন বলে তাঁকে মহর্ষি আখ্যা দেওয়া হয়।

ঐতিহ্যমণ্ডিত নোঙ্গরেশ্বরের মন্দির এই রোডের ওপর অবস্থিত। যাতায়াতের সময় পথচারীরা শ্রদ্ধা এবং ভক্তি দেখিয়ে মাথা নত করে। শিবরাত্রির দিন উৎসব হয় বড় করে। মন্দিরের পূজারী উড়িষ্যার যাশপুরের। এই যাশপুর কটক জেলায় অবস্থিত।

### মহাত্মা গান্ধী রোড

হ্যারিসন রোডের নাম পরিবর্তন করে মহাত্মা গান্ধী রোড রাখা হোক কলকাতা পুরসভা এই প্রস্তাব রাখেন ১৯৫৬ সালের ৫ জানুয়ারি [কলকাতা মিউনিসিপাল গেজেট আগষ্ট ২১জানুয়ারি, ১৯৫৬] প্রস্তাবিত নাম পুরসভা থেকে অনুমোদিত হয় সাপ্তাহিক সভায়, আগষ্ট ৩১, ১৯৫৬। সম্পূর্ণ পথটির দৈর্ঘ্য ৮৯০০ ফুট।

প্রায় তিন বছর সময় লেগেছিল রাস্তাটি তৈরি করতে [১৮৮৯ - ১৮৯২] । হেনরি হ্যারিসন ছিলেন কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান। পথটি তৈরি হওয়ার পর ঐ চেয়ারম্যানের নামে নামকরণ করা হয়েছিল। 'হ্যারিসন রোড কলিকাতার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গৌরববান। চৌরঙ্গির শান্তভাব এখানে নাই বটে, কিন্তু এখানে যে সব প্রাসাদতুল্য ত্রিতল চতুস্তল ও পঞ্চতল বাটি আছে, তাহাদের নিকট চৌরঙ্গি এখন প্রাসাদ সম্পদে পরাজিত। এই হ্যারিসন রোড লক্ষীর আবাসস্থান— ইংরাজ বাণিজ্যের সৌভাগ্য নিকেতন। কেন তাহা বোধ হয় খুলিয়া বলিতে হইবে না। হাওড়ার পুল হইতে আরম্ভ করিয়া, শিয়ালদহ পর্যন্ত ইহার বিস্তৃতি। আর এই দীর্ঘ বিস্তারময় রাস্তার দুই ধারে, অগণিত বাণিজ্য-বিপনি। ধরিতে গেলে হ্যারিসন রোড, মাড়োয়ারীদের সৌভাগ্য ও লক্ষ্মীলাভক্ষেত্র। বড়বাজার কলিকাতার সর্ব শ্রেষ্ঠ বাজার। নানাবিধ দ্রব্যপূর্ণ এত বড় বাজার ভারতের অন্য কোন নগরে আছে কি না সন্দেহ।'

*— কলিকাতা সেকালের ও একালের : হরিসাধন মুখোপাধ্যায়*

গুজরাটের অন্তর্গত কাথিয়াবাড় প্রদেশের পোরবন্দরে ১৮৬৯ সালে মহাত্মা গান্ধীর জন্ম হয়। পুরো নাম মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী। প্রথম জীবনে আইন ব্যবসা আরম্ভ করে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় যান। সেখানে ভারতীয়দের মানবিক অধিকারের দাবীতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন করে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ভারতে ফিরে এসে তিনি পুনরায় কংগ্রেসে যোগ দেন। মহাত্মা গান্ধী ছিলেন আইন অমান্য আন্দোলনের প্রবর্তক। জাতীয় আন্দোলনের জন্য তিনি বহুবার কারাবরণ করেছেন। ত্যাগে ও সত্যনিষ্ঠার জন্য তাঁকে মহাত্মা আখ্যা দেওয়া হয়েছে। জাতিভেদের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন। ১৯২০ সাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের কর্ণধার ছিলেন। আজীবন সত্য, প্রেম ও অহিংসার পূজারী। ১৯৪৮ সালে ৩০ শে জানুয়ারি দিল্লীতে এক প্রার্থনা সভায় নাথুরাম গডসে নামক এক আততায়ীর গুলির আঘাতে এই মহামানবের জীবনের অবসান ঘটে।

হাওড়া ব্রীজের নিচ থেকে শিয়ালদহ'র দিকে এওতে থাকলে খুব সহজে গড় গড় করে এগিয়ে যাওয়া প্রায় সব সময়ই সম্ভব হয় না। কেননা ঠেলা, মুটে, ছোট ট্রলি, ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি এবং প্রাইভেট গাড়ি অনবরত লেগেই আছে। ফলে ভীড়, থেমে থেমে এওনো। সাধারণ যাত্রি কিংবা পথচারির এসব গা সওয়া হয়ে গেছে। এই পথের দুপাশে রয়েছে বড় বড় কুঠি এবং কাটরা। তার মধ্যে অপরিকল্পিত ভাবে রয়েছে অজস্র দোকান। বেশিরভাগই কাপড় চোপড় এবং পোষাক পরিচ্ছদের। ঈশ্বরচন্দ্র পাল গঙ্গা প্রসাদ পাল এক অন্যতম প্রতিষ্ঠান। বড়বাজার অঞ্চলে এরা ব্যবসা শুরু করেন পঞ্চাশের দশকে। আদি ব্যবসা কাপড়ের ভবানীপুর অঞ্চলে শুরু হয় এবং এখনো আছে। বর্তমানে এ অঞ্চলেই ব্যবসা চালু বেশি। এ দোকানটির পূর্বতন মালিক ছিলেন ইষ্টবেঙ্গল সোসাইটি।

ব্যাঙ্কের মধ্যে আছে পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক, এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, দেনা ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অব বরোদা। দাতব্য চিকিৎসালয় রয়েছে সামবেদো গোপিরাম ভেটিকা রয়েছে,বাবুলাল ধর্মশালা, হিন্দী বইয়ের দোকান। মহাত্মা গান্ধী রোডে একমাত্র শিখদের ধর্মস্থানঃ গুরুদোয়ারা বড়া শিখ সংগত।

### মীর বহর ঘাট স্ট্রীট

উডের কলকাতা মানচিত্রে দেখানো হয়েছে মীরবহর ঘাট। কম দৈর্ঘের পথ। বর্তমান কলকাতার মানচিত্রে উল্লেখ রয়েছে স্ট্রান্ড রোড থেকে মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড পর্যন্ত। মীর বহর [ছোট মাপের নৌঅধ্যক্ষ; শব্দের উৎপত্তি আমীর - অল - বহর থেকে] সমস্ত প্রধান প্রধান নদী বন্দরে মোতায়েন থাকতেন। মুঘল সাম্রাজ্যে এই প্রথা বহাল ছিল। তাঁকে কখনই প্রধান নৌ - অধ্যক্ষের সমগোত্রীয় ভাবা হত না। মূলত তেল এবং ঘি এ জায়গার প্রধান পসরা।

### যমুনালাল বাজাজ স্ট্রীট

কর্পোরেশন ক্রস স্ট্রীটের নাম পরিবর্তন [১৯৫৬] করে রাখেন যমুনালাল বাজাজ স্ট্রীট যার প্রাচীন নাম ছিল সুতাপট্টি। বাজাজ ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের নেতা। স্বাধীনতা আন্দোলনের তিনি একজন যোদ্ধা ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বকে বাজাজ মনে প্রাণে শ্রদ্ধা করতেন।

যমুনালাল বাজাজ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ৪ নভেম্বর। জন্মস্থান জয়পুরের এক গ্রামে কাশীকাবাসে। যমুনালালের ছোট বেলার অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না। যখন তাঁর ১৩ বছর বয়স সেই সময় তিনি জানকী দেবীকে (৯) বিবাহ করেন। এই জানকী দেবী ছিলেন ইন্দোরের জাওড়ার গিরিধারিলাল জিজোদিয়ার কন্যা। পরে যমুনালাল পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য, তিলক এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসেন। দেশের কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে পারলে তিনি সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যে সমস্ত আন্দোলন দেশে সংগঠিত হয়েছিল যমুনালাল তার প্রত্যেকটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন।

এখানে রয়েছে রাণী কুঠি, পাওয়া যায় কম্বল, বিছানার চাদর, শাল, বেনারসী, জরির গহনা, রঙীন কাগজ, কাঁসার বাসন, কাগজের ফুল, কাঠের খড়ম, গোড়ের মালা ইত্যাদি। নেতাজী সুভাষ রোড থেকে রাস্তাটির সূত্রপাত হয়েছে মিশেছে মহাত্মা গান্ধী রোডে এসে।



### রবীন্দ্র সরণি

কলকাতা পুরসভা ১৯৬৩ সালের ৩ মে'র সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় চিৎপুর রোডের [আপার ও লোয়ার] নাম পরিবর্তন করে রাখা হবে রবীন্দ্র সরণি। নতুন নাম ব্যবহৃত হতে শুরু করে ৯ মে ১৯৬৩ সাল থেকে [কলকাতা মিউনিসিপাল গেজেট ১১ মে ১৯৬৩ রবীন্দ্র জন্ম সংখ্যা]।

পুরসভাকে কবির নামে রাস্তার নামকরণ করতে যেয়ে যথেষ্ট অসুবিধায় পড়তে হয়। কেননা গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা নির্ধারণ করাই মুশকিল হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। প্রথমে ঠিক করা হয়েছিল গড়িয়াহাট রোড, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড ( সৈয়দ আমীর আলি এভেনিউ পর্যন্ত) নাম রাখা হবে রবীন্দ্রনাথ এভেনিউ। পরে ঠিক করা হয়েছিল কলেজ স্ট্রীট - কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট - বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রীট পর্যন্ত নাম রাখা হবে রবীন্দ্র সরণি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমস্ত ভাবনা পাল্টে সিদ্ধান্ত হয় চিৎপুর রোডের নাম পরিবর্তন করে রাখা হবে এই নাম। এবং এই রাস্তার ওপর রবীন্দ্রনাথের পিতৃপুরুষের বাড়ি। " Chitpore Road was the first Road to be macadamised in Calcutta, way back in 1839. We have to congratulate the public on the completion of that great work, the macadamisation of the Chitpore Road. Next to the beauty and solidity of the structure, the rapidity with which it has been exceuted in the most remarkable circumstance which we have elapsed since the first stone was laid, and should the process of macadamisation be carried on as quickly in the other great thoroughfares of this city, the public of Calcutta may reasonably hope to enjoy the finest roads in the world — in some thing less than a century" (Quoted from the Englishman of July 16, 1839 C M Gaz, Jul 27, 1929)।

চিৎপুর রোড কলকাতার এক প্রাচীন পথ। এই পথের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় মোগল আমল থেকে। সেই সময় পথের দুপাশে ছিল গভীর অরণ্য। কাপালিক এবং শাক্ত সন্ন্যাসীরা, পুরাকালে চিত্রেশ্বরী - ঠাকুর দেখে চৌরঙ্গী হয়ে কালীঘাটে এসে হাজির হতেন। চিত্রেশ্বরী নাম থেকে পথের নামকরণ হয়েছিল চিৎপুর। হলওয়েল সাহেবের আমলের ব্ল্যাক জমিদার গোবিন্দরাম মিত্র মহাশয় এই মন্দিরটি নতুন করে নির্মাণ করে দেন। গোবিন্দরাম মিত্র ছিলেন কুমারটুলির মিত্রদের আদি পুরুষ এবং যথেষ্ট শক্তি শালী। চোর ডাকাতেরা তাঁর নাম শুনলে ভয়ে কাঁপতো। নবাব সিরাজউদ্দোলা যে সময় কলকাতা লুঠ করেন, সেই সময় গোবিন্দ রাম নিজের বরকন্দাজ ও কোম্পানির কয়েকজন সিপাহী নিয়ে নিজের সম্পত্তি রক্ষা করতে পেরেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে নতুন করে কোন ভূমিকার প্রয়োজন নেই। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও মণীষী। কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুরবাড়িতে ১৮৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, চিত্রশিল্পী, দেশপ্রেমিক ও সংগীতজ্ঞ ছিলেন। গীতাঞ্জলী বইটির ইংরাজী অনুবাদ করে তিনি নোবেল পুরস্কার পান। কবি হিসাবে তিনি সমস্ত জগতে খ্যাতিলাভ করেন। দেশকে তিনি মনে প্রাণে ভালবাসতেন প্রচুর স্বদেশীগান লিখেছেন। ইংরেজদের দেওয়া নাইট উপাধি তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের সময়

ত্যাগ করেন। বিশ্বভারতী তাঁরই প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা নিকেতন। শিক্ষা- সংস্কৃতির এ এক মহামিলন ক্ষেত্র। জনগনমন অধিনায়ক সংগীতের রচনাকার রবীন্দ্রনাথ ১৯৪১ সালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

রবীন্দ্রনাথের ছোট বেলা থেকে বড় হওয়ার অনেকখানি সময় কাটে চিৎপুর রোডের পাশে জোড়াসাঁকোয়। তাঁর লেখায় ঘুরে ফিরে এই রাস্তার নাম এসেছে বারবার, ''একটু বাদলার হাওয়া দিয়াছে কি, অমনি আমাদের গলি ছাপাইয়া সদর রাস্তা পর্যন্ত বন্যা বহিয়া যায়, পথিকের জুতাজোড়াটা ছাতার মতোই শিরোধার্য হইয়া ওঠে, এবং অন্তত এই গলি - চর জীবেরা উভচর জীবের চেয়ে জীবনযাত্রায় যোগ্যতর নয় শিশুকাল হইতে আমাদের বারান্দা হইতে এইটে বছর বছর লক্ষ্য করিতে করিতে আমার চুল পাকিয়া গেল।.... চিঠিতে যে কথাটা অমনিতে চোখ এড়াইয়া যায় সেটার নীচে লাইন কাটা দেখিলে যেমন বিশেষ করিয়া মনে লাগে, আমাদের রাস্তার জলাশয় তার নীচে তেমনি জোড়া লাইন কাটা দেখিয়া, শুধু মনটার মধ্যে নয় আমাদের গাড়ির চাকাতেও ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগিল, বর্ষাও নামিয়াছে ট্রামলাইনের মেরামতও শুরু। যার আরম্ভ আছে তার শেষও আছে ন্যায়শাস্ত্রে এই কথা বলে, কিন্তু ট্রামওয়ালাদের অন্যায় শাস্ত্রে মেরামতের আর শেষ দেখিনা। তাই এবার লাইন কাটার সহযোগে যখন চিৎপুর রোডে জলস্রোতের সঙ্গে জনস্রোতের দ্বন্দ্ব দেখিয়া দেহমন আর্দ্র হইতে লাগিল তখন অনেকদিন পরে গভীরভাবে ভাবিতে লাগিলাম, সহ্য করি কেন?''

*— কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*

এখনো এই পথ দিয়ে ট্রাম চলাচল করে। মানুষ এবং যানবাহনের চাপে প্রায়ই এখানকার সবকিছু থমকে যায়। পুরনো কলকাতার পুরনো ব্যস্ততম পথ রবীন্দ্র সরণি। দোকানপাটে ঠাসাঠাসি। জুতো, জামা কাপড়, মশারি, বাদ্যযন্ত্র, সেন্ট আতর, বই, কি নেই এখানে। লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত চিকনের পাঞ্জাবী এ জায়গার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ ছাড়াও রয়েছে কলকাতা শহরের মধ্যে সবচেয়ে বড় নাখোদা মসজিদ। মসজিদের প্রধান ফটক জ্যাকেরিয়া স্ট্রীটের ওপর। এর পশ্চিমদিকের দেওয়াল তৈরি হয়েছে রবীন্দ্র সরণি ছুঁয়ে।

চারতল বিশিষ্ট এই মসজিদটি সেকেন্দ্রাবাদে তৈরি আকবরের সমাধির আদলে তৈরি। মাথার ওপরের পেঁয়াজের আকারের গোম্বুজ দুটো তৈরি হয়েছে রাজস্থানের ঢোলপুর থেকে নিয়ে আসা লাল বালি পাথর দিয়ে। প্রধান ফটকটি তৈরি হয়েছে ফতেপুর সিক্রীর বুলান্দ দরওয়াজার আদলে। মসজিদের ওপরে প্রধান মিনার দুটোর উচ্চতা ১৫১ ফুট। অন্যান্য ছোট পঁচিশ খানি মিনারের উচ্চতা ক্রমান্বয়ে ১১৭ থেকে ১০০ ফুট। সমস্ত দিনে প্রায় ২০০০ মত মানুষ প্রার্থনা জানাতে মসজিদে আসেন। শুক্রবারে এবং অন্যান্য বিশেষ দিনে এ সংখ্যা আরো বেড়ে যায়।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের [১২৭২ হিজরি সন ] আগে এ জায়গায় দু'খানি ছোট ছোট মসজিদ ছিল। উত্তরের দিকেরটি তৈরি করেছিলেন রোশান হক এবং দক্ষিণেরটি তৈরি করেন মুন্সি হাসান আলী। ইনি ছিলেন মুন্সি আমিনুদ্দিন এর ভাইপো, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে কোম্পানির দেওয়ানিতে আইনজীবি। দুটি মসজিদের মাঝখানে এক ফালি খালি জমি ছিল। এর মালিক ছিলেন একজন হিন্দু ভদ্রলোক। দক্ষিণের মসজিদের মাতোয়ালি হন মুন্সি হাসান আলী। অন্য



মসজিদটির জন্যও রোশন হক একটি ট্রাস্ট গঠন করেন। সুষ্ঠভাবে মসজিদ পরিচালনা করার জন্য। এই নতুন ট্রাস্টের সদস্য হন। সৈয়দ নিজামুদ্দিন হাজি জ্যাকেরিয়া মহম্মদ, হাজি আহ্‌মেদ, সলেহ্ বিন জওহর এবং হাজি আলমস। মুন্সি হাসান আলির মৃত্যু হলে তাঁর কন্যা সামসুন্নেসা বেগম পরিবর্তে মাতওয়ালিয়া হন দক্ষিণ দিকের মসজিদের।

এরপর ১৮৫৬ সালে দু'পক্ষ মিলে স্থির করেন মাঝখানের হিন্দু জমিটুকু কিনে নিয়ে দু'টো মসজিদ এক করে একটি বড় মসজিদ তৈরি করা হবে। পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হয়। ১৮৫৭ সালে কাজ শুরু হয় এবং ১৮৫৮ সালে তৈরি হয় একটি বড় মসজিদ। মসজিদ তৈরি হওয়ার বছরটি একটি মার্বেল পাথরে প্রবেশ পথের সামনে খোদাই করা রয়েছে। ১২৭৪ হিজরি সন, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ।

১৯২৬ সালে কছ-এর মেমন পরিবার, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সেই সময় জ্যাকেরিয়া স্ট্রীটকে ঘিরে বাস করতো। তাঁরা মসজিদকে নতুন ভাবে তৈরি করতে শুরু করেন। ভালভাবে কাজ করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন ম্যাকিনটস্ বার্ণ লিঃ কোম্পানিকে। ১৯২৯ সালে মসজিদ পুরোপুরি নতুন রূপ পায়। সেই দিনে এই কাজের জন্য ব্যয় হয়েছিল ১৫ লাখ টাকা। কছ-এর মেমন পরিবার নাখোদা সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত। বিশেষ করে কছ এর যে সমস্ত মুসলমানরা নাবিক ছিলেন তাদেরকে নাখোদা বলা হয়। তাই নতুন তৈরি এই মসজিদের নাম দাঁড়ায় নাখোদা মসজিদ। সাতজন ট্রাস্টি অথবা মাতোয়ালি'র ওপর মসজিদ পরিচালন- এর ভার। পশ্চিমবঙ্গের ওয়াকফ কমিশনের অফিসে মসজিদের নথিভূক্ত নং ই. সি. ১২৯৩।

[পশ্চিমবঙ্গ মসজিদ মঙ্গল সমিতিঃ বিশতম সাধারণ সভা ১৯৯২। প্রকাশিত স্মৃতিগ্রন্থ]

এই পথের ওপর অনেক জায়গায় পুরনো বাড়ি ভেঙ্গে তৈরি হয়েছে নতুন মার্কেট। রয়েছে আদি ব্রাহ্ম সমাজ অফিস, মহেশ্বরী পঞ্চায়েত বিদ্যালয়, মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটি [স্থাপিত ১৯১৩ সাল]। এ অঞ্চলের অন্যতম স্বাস্থ্যকেন্দ্র। পাথর কেটে তৈরি করা নানা ধরনের মূর্তির দোকান রয়েছে অনেক। মেছুয়া বাজারের ফুলের দোকানের যথেষ্ট নাম আছে। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ পাতিয়ালা, কানাড়া ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া এ জায়গার অন্যতম ব্যাঙ্ক।

### লুকাস লেন

১৮৭৬ সালের কর্পোরেশন স্ট্রীট ডাইরেক্ট্রিতে লুকাস লেনের খোঁজ রয়েছে। সম্ভবত এই পথের পুরনো নাম ছিল প্রাইসেস্ স্ট্রীট, উডের কলকাতা মানচিত্রে [১৭৮৪] উল্লেখ রয়েছে সেভাবে।

### শোভারাম বসাক স্ট্রীট

নবাব সৈন্য কলকাতা লুঠ করলে অনেকেরই বহুমূল্য জিনিষপত্রাদি নষ্ট হয়ে যায়। প্রাণ ভয়ে কলকাতা ত্যাগ করে চলে যান অনেকেই। যে ক'জন ত্যাগ না করে থেকে যান এখানে তাদের মধ্যে শোভারাম বসাক একজন। কোম্পানি মীরজাফরের কাছ থেকে পাওয়া টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ পাইয়ে দেন তাদের জন্য এবং সেই টাকা বিতরণ করার জন্য তেরজন এই দেশীয় কমিশনার নিযুক্ত করেন। ঐ তেরজনের মধ্যে শোভারাম বসাক একজন ছিলেন।

ক্ষতিপূরণের জন্য তাঁর নিজস্ব দাবি ছিল ৪৪১২৭৮ টাকা তার মধ্যে তিনি পান ৬৬২৭৮ টাকা। কোম্পানির খাতায় তিনি একজন ব্যবসায়ী । তাঁর নামে যে ঘাটটি রয়েছে উড়ের কলকাতা ম্যাপে [১৭৮৪] তার উল্লেখ রয়েছে।

শেঠ ও বসাক পরিবারের সদস্যদের মধ্যে শোভারাম ছিলেন অত্যন্ত গুরুত্ব পদাধিকারি সদস্য। এই পথটি কালাকর স্ট্রীট থেকে শুরু হয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্র রোডে এসে মিশেছে।

### স্ট্র্যান্ড রোড

এক সময় এই পথটি ছিল নিচু, বলা যায় প্রায় গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত। পাশের বয়ে যাওয়া গঙ্গার এ ধারটায় ছিল কম গভীরতা। ১৮২৩ সালে লটারি কমিটির সহায়তায় সুদীর্ঘ রাজপথটি তৈরি হয়। বর্তমানে স্ট্র্যাণ্ড রোড কলকাতা শহরের গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহ্যবাহী পথ। প্রিন্সেপস্ ঘাট থেকে শুরু করে উত্তরে কালিকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রীট পর্যন্ত বিস্তৃত।

এখন এই পথের দু'পাশে বিশাল বিশাল বাড়ি। একদিকে নানা ধরনের সওদাগরি ও রাজকীয় কার্যালয় এবং অন্যদিকে কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষের জেটি ও মালগুদাম। স্ট্র্যান্ড রোডের ওপরে ইতিহাস প্রসিদ্ধ সেকালের চাঁদপাল ঘাট ছিল একসময়। সে সময় এ জায়গা ভরা ছিল জঙ্গলে। ক্রমে ক্রমে পরিষ্কার হয়। তৈরি হয় লর্ড অকল্যাণ্ডের ভগ্নী এমিলি ইডেনের নামে ইডেন গার্ডেন। এক দর্শনীয় স্থান। বাবুঘাট তৈরি করেন জানবাজারের সুপ্রসিদ্ধ রাণী রাসমণির স্বামী বাবু রাজচন্দ্র দাস। সেই সময়ের গবর্ণর জেনারেল ছিলেন লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক। বাবুঘাট তাঁরই নামে উৎসর্গীকৃত।

বর্তমান পথের পাশে কলকাতার পরিবহন সমস্যা মেটানোর অন্য এক প্রকল্প চক্ররেল চালু হয়েছে। সূচনা হয় গত ১৬ আগষ্ট, ১৯৮৪। যাত্রাপথ প্রিন্সেপ ঘাট থেকে বিধান স্টেশন পর্যন্ত। বৃত্তাকারে সমস্ত কলকাতা প্রদক্ষিণ করার কথা রয়েছে চক্ররেলের।

স্ট্র্যান্ড রোডের কিছু অংশের ওপর ট্রাম লাইন ছিল। এখন বাস, মিনিবাস, ট্যাক্সি এবং লরি চলে। পথের ওপর দিয়ে যানবাহন এক দিকে যায়। আসার জন্য ব্যবহার হয় অন্য পথ। এই রাস্তায় জেশপ - এর মত ঐতিহ্যবাহী সংস্থার প্রধান কার্যালয় ছিল। রয়েছে লোহা, পাইপ, চা এবং যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত নানা ধরনের বিপণন কেন্দ্র। মহাত্মা গান্ধী রোডের পর থেকে [উত্তর দিকে] শুরু হয়েছে রাজাকাটরা। বর্ধমান রাজার স্টেট [চন্দ্রবংশীয়]। এই কাটরার মূল বিক্রয় সামগ্রী ঃ মশলাপাতি, কসমেটিক্স, পাটের দড়ি, আবির, দেশলাই ইত্যাদি।

রাজাকাটরার ব্যাপকতা বিশাল মহাত্মাগান্ধী রোড থেকে মিরবহর ঘাট স্ট্রীট পর্যন্ত দীর্ঘ। পেছন দিকে রয়েছে মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড। স্ট্র্যান্ড রোডের ওপর মিরবহর ঘাট স্ট্রীটের সংযোগ স্থলে রয়েছে গঙ্গা মন্দির। সাত পুরুষের এই মন্দিরে বর্তমান পূজারী বিনোদ মিশ্র। জম্মু - কাশ্মীরের ডোগরা ব্রাহ্মণ। পাকাপাকিভাবে এখানেই বসবাস করেন। স্ত্রী স্কুল শিক্ষক। এক সময় মন্দিরের পাশেই ছিল গঙ্গা। সকাল সন্ধ্যায় আরতি হয় এখানে। মন্দিরে মূর্তি রয়েছে গঙ্গা দেবীর। পাথরের তৈরি।

নতুন ভাবে ভেঙ্গে রাস্তা কংক্রীটের তৈরি করা হচ্ছে এখন। এই পথ দিয়ে গাড়ি শুধু হাওড়ার দিকে যেতে পারে। লোহার দোকান, চা, বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি, পাইপ [লোহা, বা প্লাস্টিক] 'মূল ব্যবসার বিষয়। গঙ্গার ধার ধরে রয়েছে বিভিন্ন গোডাউন তেল, দেশলাই ইত্যাদি জিনিসের। তার পাশ দিয়ে গেছে চক্ররেলের লাইন। অফিসের সময় যাত্রীদের ভিড় হয় এই ট্রেনে। ইউকো ব্যাঙ্ক, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক স্ট্রান্ড রোডে বড়বাজার অঞ্চলের ব্যাঙ্ক।



### হরিরাম গোয়েঙ্কা স্ট্রীট

এই রাস্তার পুরনো নাম বাঁশতলা গলি। পরে নাম পরিবর্তন করে সমাজ কর্মী হরিরাম গোয়েঙ্কার নামে রাখা হয়। মারোয়ারী হাসপাতাল রিলিফ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা এবং বহু সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন হরিরাম গোয়েঙ্কা। তাঁর আদিবাস ছিল রাজস্থান। পথের সূত্রপাত হয়েছে মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড থেকে, মিশেছে রবী দ্রসরণিতে।

সতের শতকে সম্ভবত এ জায়গাই ছিল সুতানটির শেষ জায়গা যেখানে ছিল বাঁশ ঝাড়। সম্পূর্ণ অঞ্চল বাঁশ গাছে ভরা। সেই সময় শহরের মধ্যে এটা ছিল এক গভীর বনাঞ্চল। সম্ভবত সেই থেকে বাঁশতলা গলির নাম প্রবর্তন হয়েছিল।

বর্তমানে এখানে রয়েছে তৈরি জামা কাপড়ের দোকান। স্টীলের বাসন এবং খুচরো কাপড়ের দোকান। জগন্নাথ কাটরা এবং শামশ্রী মার্কেট এই পথের কেন্দ্রীভূত বিক্রয় কেন্দ্র।

## বর্তমান বড়বাজারের প্রধান অধিবাসী মাড়োয়ারী

দেশে ইংরেজ শাসন কায়েম হওয়ার পর সুবে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। সেই সময় যে সমস্ত বিভিন্ন দেশীয় বণিকরা মুর্শিদাবাদে ব্যবসা করতেন [আর্মানিয়ান, উজিনিয়া, মাড়োয়ারী প্রভৃতি] তারাও নিজেদের স্থানান্তরিত করে নিয়ে আসেন কলকাতায়। বণিকরা বুঝতে পেরেছিলেন রাজধানী পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ব্যবসাতেও পরিবর্তন আসা অবশ্যম্ভাবী। অতএব রাজধানী অনুসরণ অনস্বীকার্য।

নবাব সিরাজদ্দৌলার আমলে এবং তাঁর পূর্বপুরুষদের সময় থেকে ধনাগারপতি ছিলেন জগৎ শেঠরা। বংশ পরম্পরায় তাঁরা এই কাজে নিযুক্ত। এরা এসেছিলেন রাজপুতনা থেকে। চলতি ভাষায় এখানকার মানুষ এ জায়গাকে বলে 'রাজবারা' এবং সাধুভাষায় 'রায়থানা'। এই রায়থানা থেকে রাজপুতানা নামের উৎপত্তি। এছাড়া ভারতবর্ষের প্রাচীন আর্য নৃপতিগণের বংশধরেরা আখ্যা পেয়ে থাকেন রাজপুত্র নামে। এই রাজপুত্র শব্দ বিকৃতাবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে রাজপুত। অন্যভাবে বিশুদ্ধ নাম রাজস্থান।

'মুসলমান বিজেতা সাহেবউদ্দিনের উত্থানকালে রাজস্থানের বিশাল পরিসর বোধ হয় গঙ্গা যমুনা অতিক্রম করিয়া হিমগিরির পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; কিন্তু তাঁহার প্রাক্কালে ইহার চতুঃসীমা কতদূর অবধি ব্যবহৃত ছিল; তাহা অনুমান করা এখন নিতান্ত অসাধ্য। মালব ও গুর্জররাজ্যের ধারা এবং অনহলবারাপত্তনের ধ্বংসাবশেষের উপর মান্দু ও অক্ষদাবাদ নগরদ্বয়ের প্রতিষ্ঠাপনের পূর্বকালে, রাজস্থান পশ্চিমে সিন্ধুনদ, উত্তরে জঙ্গলদেশ প্রথিত শতদ্রুর দক্ষিণস্থ মরু প্রান্তর, পূর্বভাগে বুন্দেলখণ্ড এবং দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরির অচল শৈলমালা, এই কয়েক প্রকারে চতুঃসীমাবদ্ধ ছিল। এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন বিভাগরেখার মধ্যভাগে আর্যবীর রাজপুতগণ কবে - কোথা হইতে আসিয়া আপনাদের বংশতরু রোপণ করিলেন, সে তরু কোন বীজ হইতে অঙ্কুরিত হইল, তাহা কিরূপ ফুলফল প্রসব করিল .....'

— সচিত্র রাজস্থান: কর্ণেল টড

পুরাণে এই সমস্ত রাজপুরুষদের সম্পর্কে কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। সেই বিবরণে বেশির ভাগই কল্পনা মেশানো। ফলে প্রকৃত বিষয় খুঁজে পাওয়া বেশ কষ্টকর। তবু যে সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থে এই উল্লেখ সর্বপেক্ষা প্রধান সেগুলো হল ঃ ভাগবত, স্কন্দ, অগ্নি ও ভবিষ্যপুরাণ।

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রাচীন জাতিই তাদের আদি বাসস্থান উচ্চভূমি বা তৎসন্নিহিত অন্য কোন প্রদেশের কথা বলে। উচ্চভূমি ত্যাগ করার পর মনুর বংশধরগণ সিন্ধুগঙ্গা — সৈকতভূমে আর্যাবর্ত প্রদেশে এসে সরযূতীরস্থ কোশলরাজ্যে আপনাদের সর্বপ্রথম অযোধ্যানগরী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বের আগে এ ধরনের সমৃদ্ধশালী নগরী ভারতভূমে দ্বিতীয় আর ছিল না।

'..... তখন হিন্দু ও গ্রীকে কোনই প্রভেদ ছিল না; সকলে এক কেন্দ্রীভূত হইয়া একত্রে এক সংসারে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন। কেননা আদিনাথ, আদীশ্বর, অশীরীশ, বাঘেশ, বেকশ, মনু, মীনেশ ও নু (Noah) যে মানবের একমাত্র আদিকূলপতির ভিন্ন ভিন্ন অভিধা, তদ্বিষয়ে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। Noah শব্দের ইহুদি উচ্চারণ নু। এবং এই নু শব্দ মনু শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

*— সচিত্র রাজস্থান ঃ কর্ণেল টড*

বর্তমানে মাড়োয়ার বা রাজস্থানী ভাষার মাড়বার একটা বড় রেল জংশন। কথিত আছে একদল লোক তাদের ভাগ্যোন্নয়ণের জন্য মাড়বার থেকে এসেছিল কলকাতায়। সেই সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রাজ চলছে। দলটি এক কাম্পানি সাহেবের মুখোমুখি হলে নিজেদের পরিচয় দিতে যেয়ে জানিয়েছিল, মাড়বার তে আয়া হামলোগ। যেহেতু মাড়বার সে আয়া তাই তারা মাড়বারী। সম্ভবত মাড়োয়ারী বা মাড়বারী শব্দটির উৎপত্তি এই ভাবেই।

সে সময় সমগ্র যোধপুরের বিকল্প নাম ছিল মাড়বার। আকবরের সময় থেকে মাড়বার রাজ ছিলেন মোঘল সম্রাটদের অতি প্রিয়। কাছের মানুষ। মাড়বার রাজকুমারী যোধাবাই ছিলেন আকবরের প্রধানা বেগম।

' ..... তবে বর্গনাম বা জেনেরিক নাম হিসেবে মাড়োয়ারী যে ভুল তাতে সন্দেহ নেই বাঙালি ওড়িয়া অসমীয়া মারাঠি গুজরাটি বললে কাকে বা কাদের বোঝানো হচ্ছে তা অনুমান করতে দেরী হয় না, কিন্তু মাড়োয়ারী বলতে রাজ ওয়াড়ার দেশের কোন অঞ্চলের লোক তা সনাক্ত করা যায় কি? জয়পুর না মেবার, যোধপুর না বিকানীর সোয়াই - মাধোপুর না দুংগরগড়, না ক্ষেত্রীর? বর্তমানের এবং টড সাহেবের বর্ণনা অনুসারে এরা সবাই রাজস্থানী।'

*— মাড়োয়ারী মোজেইক ঃ শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়।*

মাড়োয়ারীদের স্থানিক ভাষাকে বলা হয় মাড়োয়ারী ভাষা। আয়কর বিভাগে মাড়োয়ারীদের ভাষা কিছুটা বিকৃত হয়েছে। সেখানে দাঁড়িয়েছে মাড়োয়া বা মাওড়ীতে। আয়কর বিভাগের অনেক অফিসারকেই এই মাওড়ী ভাষা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে হয়। কেননা এই বিরাট ব্যবসায়ি গোষ্ঠী হিসাবপত্র নিজের ভাষাতেই রাখেন। এ ছাড়াও এরা সমানভাবে হিন্দী ব্যবহার করে থাকেন। তবে শিক্ষিতদের মধ্যে ইংরিজী ব্যবহারের প্রবণতা যথেষ্ট বেশি।

বাংলায় বসবাসকারী মাড়োয়ারীদের মধ্যে বাংলা শেখার প্রবণতাও আছে। কিছু দিন আগে পর্যন্ত মাড়োয়ারীরা জরুরিভাবে বাংলা শিখতেন। কারণ তাঁদের বাঙালিদের সঙ্গে



এবং বাঙালিদের মাধ্যমেই সাহেবদের সঙ্গে ব্যবসা করতে হত। বর্তমানে পদ্ধতির কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। এখন মাড়োয়ারী ছেলেমেয়েরা পড়ে প্রধানত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। সঙ্গে হিন্দী শিখতে হয়। এবং ব্যবসা চালানোর জন্য বাংলা বলা শিখতে হয়। নেহাতই কাজ চালিয়ে নেওয়ার জন্য।

মাড়োয়ারীদের মধ্যে যাঁরা ব্রাহ্মণ তাঁদের পদবি শর্মা, ভোজগ ইত্যাদি। এঁদের আবার পূজারীও বলা হয়। শুধু বিবাহ ইত্যাদি বিশেষ পূজানুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন যারা তাঁরা পণ্ডিত বলে খ্যাত। অগ্রবাল, মাহেশ্বরী ও ওসওয়াল— এঁরা সবাই বৈশ্য। বৈশ্য ও ব্রাহ্মণ ছাড়া আছে ক্ষত্রিয় ও মহারাজ। ক্ষত্রিয়দের সাধারণ পদবি টাকরা বা টাগরা। টাকরা ঠাকুরের অপভ্রংশ। মহারাজারা পাচক মাত্র

বৈশ্যদের মধ্যে ধর্মগোষ্ঠী মোটামুটি দু'টি। সনাতনী ও জৈন বা জৈনী। বিয়ে শাদি কিংবা সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে সনাতনী ও জৈন'র মধ্যে কাজকর্ম হওয়ার সুযোগ কম। প্রাচীন পন্থীদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ ঠিক তেমনভাবে অনুমোদন পায় না।

এদের পদবি নির্ভর করে এরা কোন জায়গা থেকে এসেছেন তার ওপর। যেমন ভাবরি থেকে এসেছে বলেই ভাবরিওয়ালা। ঝুন ঝুন থেকে যাঁরা এসেছেন ঝুনঝুনওয়ালা, জয়পুরের জয়পুরিয়া, রাজগড়ের রাজগড়িয়া, কনৌড়ের কানোরিয়া, আজমীরের আজমেরা, চুড়রের চোড়োরিয়া ইত্যাদি। এছাড়া আছেন বিড়লা, বাংগড়, জালান, নেপালী, গোয়েঙ্কা, সারাওগী, ছাবারিয়া, চনঢনিয়া ইত্যাদি। আর আছেন মূল গোষ্ঠী অনুসারে অগ্রবাল (আগড়ওয়ালা)' মাহেশ্বরী ও ওসওয়াল।

মাড়োয়ারীদের চাকরির প্রতি যথেষ্ট অনীহা। মন প্রাণ সব সময় ব্যবসার দিকে ঝুঁকে আছে। কেউ কেউ চাকরিতে ঢুকলেও মন পড়ে থাকে সেই ব্যবসার দিকে। 'প্রাচীনকালে শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে পেশা ও পেশা অনুসারেই বর্ণ চিহ্নিত হয়েছিল। ..... বস্তুত শ্রমবিভাগ হ'ল মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের অন্যতম সূত্র। ..... এই সমস্যা সমাধানের সূত্র ছিল তিনটি - ধর্ম, কর্তৃত্ব ও কর্মবিভাগ। ..... ধর্মীয় ও কর্তৃত্বের অনুজ্ঞা বলে মানুষকে নির্দিষ্ট কাজকর্ম করতে হ'ত, আর এই সব কাজ কর্মের সমন্বয় সাধন করত ধর্মীয় বা ঐহিক কর্তৃত্ব। কর্মবিভাগ হয়ত কারো নির্দেশে সৃষ্টি হয়নি, হয়ত হয়েছিল স্বয়ংক্রিয় ব্যবসা হিসেবে বংশপরম্পরার মাধ্যমে। এবং তা ধারণ করেছিল সংহত রূপ । তখন কর্মবিভাগ পরিণত হয়েছিল কুলধর্মে।

*— মাড়োয়ারী মোজেইক ঃ শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়*

মুনিমপদ মাড়োয়ারী সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইনি হলেন বিশ্বস্ত কর্মচারী। এই পদ অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষানুক্রমিক হয়ে থাকে। কেননা ব্যবসার সমস্ত কিছুর খরচ, গোপন চাবিকাঠি— তার হাতেই থাকে। তাই অন্য যে কোন কর্মচারী সংস্থা ছেড়ে চলে গেলে তেমন ভাবে মুষড়ে পড়েন না মনিব কিন্তু মুনিমজীর অনুপস্থিতি ভীষণভাবে ভাবিয়ে তোলে এবং হতাশ করে দেয়।

গোষ্ঠী বিচারে ব্যবসায় যুক্ত কর্মচারীদের পর্যায় হল, নোকর, মুনিম, খুচরা ব্যাপারি, দালাল, থক্ ব্যাপারি। থক্ ব্যাপারি বা হোলসেলাররা বণিক বা মার্চেন্টদের কাছাকাছি কিন্তু

ঠিক মার্চেন্ট নন। শিল্পের পর মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের আকর্ষণ শেয়ার বাজারের প্রতি।

ইংরেজরা আমাদের দেশ থেকে চলে গেলে মাড়োয়ারীরা ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁদের শিল্পসাম্রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করে। শেয়ার বাজারে আধিপত্য প্রচুর পরিমাণে। কম বয়সী ছেলে মেয়েরা তাই নোকরি - ধান্দার ফাঁকে ফাঁকে শেয়ার বাজারে ঢু মারে। ইদানিং ব্যবসায় বিস্তৃতি আরো বেড়েছে। নতুন নতুন লাইন। ভিন্ন ভিন্ন তরিকা এবং ভিন্ন ভিন্ন ধান্দা।

প্রত্যেক মাড়োয়ারীর গৃহে দেবস্থান থাকবেই। আলাদা করে ঘরের ব্যবস্থা না থাকলে খন্দ বা কুলংগিতে বন্দোবস্ত করা হয়। দেবস্থান শুধুমাত্র বাড়িতেই নয় দপ্তর এবং দোকানেও থাকে। এ বিষয়ে জৈন ও সনাতনীদের মধ্যে প্রায় কোন প্রভেদ নেই। আরাধ্যর মধ্যে সিদ্ধিদাতা গনেশজী এবং ধনৈশ্বর্যের লছমীজী প্রধান।

দেওয়ালি এবং ভাইদুজ বা ভাইফোঁটা — মাড়োয়ারীদের প্রধান পার্বন ও সব গোষ্ঠির কাছে সমানভাবে প্রিয়। দেওয়ালি উৎসবকে এরা মানেন শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করে। শ্রীরামচন্দ্র ঐ দিন অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। এবং সেইদিন তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য অযোধ্যাবাসীরা শত সহস্র দীপ জ্বালিয়েছিলেন। দেওয়ালীর উৎসব চলে তিন চার দিন ধরে। এই সময় ঘর গেরস্থালি নতুন করে সাজানো হয়। নতুন পোশাক পরিচ্ছদ আসে পরিবারে সবার জন্য। প্রিয়জনদের উপহার পাঠানোর রেওয়াজ আছে। ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে পাঠানো হয় ভেট।

ভাইদুজ দেওয়ালির দুদিন পর। সেদিন বোন আসে ভাইয়ের বাড়ি সঙ্গে নিয়ে আসে মিঠাই। অনেক পরিবারে ভাইদুজের মত আর একটি অনুষ্ঠান হয় হোলির দিন বা তার আগের দিন। সেই সময়টা অবশ্যই বসন্ত পূর্ণিমার মধ্যে হবে। এটা হল পরের ঘরে যাওয়া বোনের সঙ্গে পুণর্মিলনের দিন। মিলনের জন্য বোন ভাইয়ের বাড়ি আসেন। ভাইয়ের কপালে এঁকে দেন চন্দন - দই - আতপচালের ফোঁটা।

'হোলির আর এক নাম বসন্তোৎসব। ওই দিন রং দেওয়া আবির ছড়ানো'তো আছেই, তার ওপর অনেক সময়ই হয় কাব্বালি ও ঢপের অনুষ্ঠান। .....কাবালি বোধ হয় আমাদের কাওয়ালি কিন্তু দরবেশী সুর নয়; বরং তরজা জাতীয় ব্যাপার — কবিগান। ... কাবালি বাড়িব চত্বরে হতে পারে, আবার কোন সভাঘরে হতে পারে। .... কাবালির বদলে ঢপ অনুষ্ঠিত হলে তা হয় মালিকের বা বহুতল বাড়ির চত্বরে। ঢপই হল আসল ফাগুয়ালি — বসন্তোৎসব। অনুষ্ঠানটিকে আমার স্থূল কামোদ্দীপক বলেই মনে হয়েছিল। হয়ত আদি বসন্তোৎসবেরই একটা অঙ্গ ওটা। .... ঢপ গাওনায় ছোটে সরাবের ফোয়ারা.....'

*— মাড়োয়ারী মোজেইকঃ শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়*

হোলির কয়েকদিন পরে শুধু মেয়েদের একটা অনুষ্ঠান হয় — সিন্ধারা। অনুষ্ঠানের দিন মেয়েরা বাপের বাড়ি আসে। ছোট বড় সব মেয়ের হাতেই মেহেদীর চিত্রাংকন করা হয়। এঁকে দেন যিনি এ বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং পটু। তারপর মেয়েরা ফিরে যায় তার শ্বশুর বাড়ি। সঙ্গে নিয়ে যান কিছু মিঠাই এবং কিছু নগদ। ওরা এই মিঠাই ও অর্থ পান পিতা - ভ্রাতার কাছ থেকে ভাবীর মাধ্যমে।

পরিবারে ঐতিহ্য পরিবেশ এবং পরিস্থিতি এই সবকিছু নিয়ে একটি কিশোর ক্রমে ক্রমে



যুবক হয় তারপর প্রবীণ এবং প্রাজ্ঞ। অভিজ্ঞতা ও নানা ধরনের কাজ নিয়ে তৈরি হয় জীবন এবং জীবনে গূঢ় অর্থ। প্রত্যেকেরই বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম কিছু অর্থকড়ির প্রয়োজন। কোন না কোনভাবেই তাই সবাই এই অর্থকড়ির সঞ্চয় ও রোজগারের তরিকা খোঁজে এবং সেই সুযোগ ও সন্ধান যার জীবনের যত বেশি মেলে তিনি আপাতদৃষ্টিতে তত বড়। মাড়োয়ারীদের জীবনধর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে গেছে 'অপ্রচুর মূলধনকে যথা সম্ভব সুপ্রচুর করা, এবং ঐ সুপ্রচুর কৃত মূলধনকে ঠিকমত কাজে লাগানো।'

এই মূলমন্ত্রকে জপ করে তাদের জীবন এগিয়ে চলে। পাই পাই এর হিসাব নিকাশ স্বাভাবিক ভাবে খেরোর খাতায় লেখা হয়ে যায়। সম্পত্তি, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া মালিকানা — কোন কিছুতেই তেমনভাবে কোন বিপত্তি আসে না। কেননা পরিবারের সম্পত্তি বণ্টন মালিকানা মিতাক্ষর বা মিতাচ্ছরা বিধি ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। উত্তরাধিকারীরা সমান অধিকার পেয়ে প্রত্যেকেই খুশি। হিন্দু অবিভক্ত পরিবার [Hindu undivided Family] এর নিয়ম মেনে চলায় আয়করের ব্যাপারে সুবিধা হয়। পুত্র সন্তান না হলে গোদ নিয়ে অর্থাৎ দত্তক নিয়ে সে জায়গা পুরণ করে নেন।

বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এরা আত্মীয়স্বজন, দালাল এবং ঘটকের ওপরে নির্ভরশীল। বলা যায় খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের ওপর মাড়োয়ারীদের তেমন আস্থা নেই। জন পয়চানদের মধ্যে যোগাযোগ হোক এটাই ওরা চান।

কথা পাকা হওয়ার পর শুভ দিন দেখে তাকে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মেনে নেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম সাগাই। সাধারণত ছেলের বাড়িতে সাগাই হয়ে থাকে। পরিবারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় পরিজন এই অনুষ্ঠানে আসেন।

'সাগাই - এর অল্পবিস্তর দিন পরে শাদির সময় এগিয়ে গেলে শুরু হয় কার্ড বিতরণ। কার্ড বানানো ও বিতরণ - দু' ব্যাপারেই লক্ষ্য করা যায় বানিয়াবৃত্তির প্রকাশ।

কার্ড ছাপা হয় একখানা — পাত্র ও কন্যা উভয় পক্ষের জন্যে। ডানদিকে থাকে পাত্রপক্ষের এবং বাঁ দিকে কন্যাপক্ষের আত্মীয়ক বা আত্মীয়কদের নাম। শ্রী গনেশায় নমঃ (প্রজাপতয়ে নমঃ নয়) এবং আত্মীয়কদের মধ্যের জায়গায় থাকে পাত্র পাত্রীর কুলজিঃ কার সুপুত্র ও কার সুপুত্রী এবং কার সুপৌত্র ও কার সুপৌত্রী। একই কার্ড বিলি করা হয় উভয় পক্ষের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব চেনা - পরিচিতদের মধ্যে।..... আসল কার্ডের খামের ভেতর আপনি আরও একটা ছোট খাম পেতে পারেন। তাতে থাকে এক বা একাধিক ছোট কার্ড - একখানা ভোজের, একখানা গীতমালিকা বা গান শোনার, আর একখানা ককটেল্‌সেরও হ'তে পারে। ভোজের কার্ডকে বলা হয় ' সজ্জন গোঠ' - অর্থ কন্যাপক্ষের আয়োজিত ভোজে আপনার সাদর আমন্ত্রণ। ..... এর পরিধি বিশেষ সীমাবদ্ধ।

গীতমালিকার নিমন্ত্রণ আরও একটু ব্যাপক প্রকৃতির। ..... ককটেল্‌সের নিমন্ত্রণ করা হয় বিশেষ বাছাই করে।'

*— মাড়োয়ারী মোজেইক ঃ শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়*

জৈনদের মধ্যে কিছু তফাৎ দেখা যায়। এদের বিয়ে শাদির অনুষ্ঠান অনেকটা বাঙালিদের মত। তবে এদের জীবনের সব চেয়ে বড় অনুষ্ঠান বলে মানা হয় 'ছমাইয়াচনা দিবস'কে অর্থাৎ

ক্ষমা প্রার্থনা দিবস। সমস্ত বছরে যদি কোন হিংসা করে থাকি কিংবা কোন অন্যায় - তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নেওয়া। অনেকটা নিজের কাছেই নিজের পরিশুদ্ধি।

তিথি অনুযায়ী আগষ্ট মাসে পড়ে এই দিনটি। ছমাইয়াচনা দিবসের আগের দিন থেকে শুরু হয় নির্জলা উপবাস। ৩৬ ঘন্টার এই উপবাস [সূর্যাস্ত থেকে পরের দিনের সূর্য উদয় পর্যন্ত ] ছোট থেকে বড় সবাই পালন করেন। তারপর মন্দিরে যেয়ে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাওয়ার উপসনা। শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরের মতে ঃ জীবনে হিংসার কোন স্থান নেই। অহিংসাই পরম ধর্ম।

এখন জৈনদের মধ্যে অনেকেই ঐ তিথির পর নিজেদের প্রিয়জনের কাছে চিঠি পাঠিয়ে ছমাইয়াচনা চান।

**তথ্যসূত্র ঃ**


কলিকাতা সেকালের ও একালের ঃ হরিসাধন মুখোপাধ্যায়

Early Annals Vol. I : Wilson

East India Company and Economy of Bengal : S. Bhattacharya

History of Bengal : Stewart

Historical and Ecclesiastical sketches of Bengal : Gentlemen's Magazine 1738

বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব [প্রথম খণ্ড] ঃ ডঃ নীহার রঞ্জন রায়

বঙ্গোপসাগর ঃ অশীন দাশগুপ্ত

সমাজ বিজ্ঞানী জেমস লঙ ঃ বিনয়ভূষণ রায় [এক্ষণ শারদীয় সংখ্যা ১৩৯৭]

গঙ্গার ঘাট ঃ রাধারমণ মিত্র

300 years of Calcutta : Statesman

পশ্চিমবঙ্গ মসজিদ মঙ্গল সমিতি ঃ বিশতম সাধারণ সভা ১৯৯২

A History of Calcutta Street : P. Thankappan Nair

কলিকাতা দর্পন ঃ রাধারমন মিত্র

সচিত্র রাজস্থান ঃ কর্ণেল টড

মাড়োয়ারী মোজেইক ঃ শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

Yankee Traders and Calcutta Marchants : Indo U. S.

Sub - Commission on Education and Culture




# লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকদের দায়িত্ব এবং তাঁদের উৎসাহিত করার কিছু উদ্যোগ

আবদুর রউফ

লিটল ম্যাগাজিনগুলি মূলত সম্পাদকনির্ভর পত্রিকা। আত্মপ্রকাশের আকাঙ্খা, সৃজনশীলতার তাগিদ ইত্যাদির দ্বারা তাড়িত হয়ে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই তরুণবয়স্কদের সম্পাদনায় লিটল ম্যাগাজিনের জন্ম হয়। পরবর্তী পর্যায়ে অবশ্য কোন কোন তরুণ বয়োবৃদ্ধ হলেও মনের তারুণ্য তাঁদের ঘোচে না। ফলে নিজের সৃষ্ট ম্যাগাজিনটিকে তিনি অপত্যস্নেহে লালন পালন করে যান। এরকম তরুণ অথচ বয়স্ক সম্পাদকরা সাধারণত সম্পাদনার ক্ষেত্রে কিছু কিছু অনুকরণীয় নজির সৃষ্টি করেন। অবশ্য তরুণ বয়সে যখন তাঁরা শুরু করেন তখন থেকেই সম্পাদনার ব্যাপারে স্বতন্ত্র মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি বীজাকারে তাঁদের স্বভাবের মধ্যে নিহিত থাকে। অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই বীজই পল্লবিত হয়ে সম্পাদনার ক্ষেত্রে অনুকরণীয় ঐতিহ্যের জন্ম দেয়।

লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদনার ক্ষেত্রে কিছু কিছু সম্পাদকের মুন্সিয়ানা এবং মৌলিকত্ব প্রমাণ করে তাঁরা সমাজের অগ্রণী সাংগঠনিক ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি। সংগঠকের গুণাবলী থাকে বলেই সমমনস্ক কিছু সহযোদ্ধা জুটিয়ে ফেলা সম্পাদকের পক্ষে সম্ভব হয়। এই সহযোদ্ধা জুটিয়ে ফেলার ব্যাপারটা অবশ্য সবার ক্ষেত্রে সমান ভাবে প্রযোজ্য নয়। অনেকেই পারেন, কেউ কেউ পারেন না। সহযোদ্ধা জোটাতে না পারলেও সাংগঠনিক অন্যান্য গুণাবলী সম্পাদকের থাকেই। সম্পাদককে জানতে হয় অনেক কিছুই। কেবল লেখার ক্ষমতা কিংবা সাহিত্যে সৃজন কুশলতা থাকলেই সম্পাদক হয়ে ওঠা যায় না। লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদককে আরও এমন অনেক গুণাবলীর অধিকারী হতে হয় যার সঙ্গে সাহিত্যের সৃজনশীলতার কোনও সম্পর্ক নেই। পত্রিকা প্রকাশের জন্য নূন্যতম কিছু অর্থের প্রয়োজন পড়ে। সেই অর্থের সংস্থান সম্পাদককেই করতে হয়। সেজন্য নিজের গাঁটের পয়সা খরচা করা ছাড়াও কিছু বিজ্ঞাপন সংগ্রহের চেষ্টা না করে উপায় থাকে না। এই বিজ্ঞাপন সংগ্রহ এবং পয়সা আদায়ের মধ্যে হেনস্থা এবং হয়রানি যে কি পরিমাণে রয়েছে তা ভুক্তভোগী সম্পাদকদের জানা আছে। পত্রিকার জন্য, ছাপাখানার বন্দোবস্ত করা, কাগজ কেনা, প্রুফ দেখা। বাইন্ডিংয়ের ব্যবস্থা ইত্যাদি করে পত্রিকা বের হওয়ার পরের হ্যাপাটুকুও সম্পাদককেই সামলাতে হয়। গুরুত্বপূর্ণ সেই হ্যাপাটা হল, সম্ভাব্য পাঠকদের কাছে পত্রিকাটি পৌঁছে দেওয়া। যেসব সম্পাদক সহযোদ্ধা জোটানোর তেমন ক্ষমতা রাখেন না কিংবা বন্ধুবান্ধবদের সহযোগিতা যাঁর কপালে তেমনভাবে জোটে না, তেমন সম্পাদককে প্রায় ক্ষেত্রে নিজেকেই ঘাড়ে করে পত্রিকার বান্ডিল হকারদের কাছে পৌঁছে দিতে হয়। দূরের হকারদের কাছে এবং সামান্য হলেও কিছু কিছু গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পত্রিকা ডাকে পাঠানোর বন্দোবস্ত করা, তাঁদের সঙ্গে চিঠিপত্র লেখালিখি করা— এসব সম্পাদককে করতে হয় নিজের হাতে। তারপর থাকে হকারদের কাছ থেকে পত্রিকা বিক্রির টাকা আদায়ের বিড়ম্বনা। এ যে কি বিড়ম্বনা তা জানেন কেবলমাত্র ভুক্তভোগী সম্পাদকেরা।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হকারেরা লিটল ম্যাগাজিন বিক্রির এই টাকাটা মেরে দেওয়ার চেষ্টা করে। অল্প অল্প টাকা দিতে দিতে দুটো-তিনটে সংখ্যার টাকা বাকি ফেলে দেয়। হকারদের মতলব থাকে, পত্রিকাটি যতদিন না বন্ধ হচ্ছে এভাবে বকেয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে যাওয়া। কারণ অভিজ্ঞতা থেকে তাদের জানা আছে অধিকাংশ লিটল ম্যাগাজিনের একদিন না একদিন অপমৃত্যু ঘটে। অপমৃত্যু একবার ঘটে গেলে হকারের কাছে বকেয়া টাকা আদায়ের গরজ আর সম্পাদকের থাকে না। ফলে পুরো টাকাটাই অর্থাৎ লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকের ঘাম রক্ত ঝরান টাকা হকারের নগদ পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়। যে কারণে জায়গায় নিতান্ত অসঙ্কুলান না হলে অধিকাংশ হকারই যে নিজের স্টলে লিটল ম্যাগাজিন রাখতে আপত্তি করে না— একথা অভিজ্ঞ সম্পাদকমাত্রেরই জানা আছে। এসব ধুরন্ধর হকারদের মোকাবেলা করা লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকদের অন্যতম দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য অতি সামান্য সংখ্য হলেও কিছু এমন হকারও আছেন যাঁরা লিটল ম্যাগাজিনের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাঁদের কথা আলাদা করে না উল্লেখ করলে অবিচার করা হয়।

বস্তুত এধরনের হকারের সংখ্যা কিছু বেশি হলে এবং অন্যান্য হকাররা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে পত্রিকা বিক্রির টাকা মেরে না দিলে কিছু কিছু অবলুপ্ত লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদক হয়ত আরও কিছুকাল ভালভাবে তাঁর পত্রিকাটি বাঁচিয়ে রাখতে পারতেন। কিন্তু পরিস্থিতি সেরকম অনুকূল নয় বলেই ধুরন্ধর হকারদের সঙ্গে মোকাবেলা করেই সম্পাদককে চালাতে হয় বাঁচার লড়াই। একই সঙ্গে তাঁকে হজম করতে হয় অভিভাবকস্থানীয়দের এবং প্রিয়জনদের গঞ্জনা। চলতি কথায় ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান বলে গঞ্জনা তাঁকে শুনতেই হয়। এক্ষেত্রে শুধু ঘরের খাওয়াই নয় গাঁটের পয়সাও খরচ করে সম্পাদকমশাই এমন কান্ড করেন যার উপযোগিতা হিসেবি মানুষ হদিশ করতে পারেন না। অনেক সময় সম্পাদকমশাই গাঁটের পয়সা এতটাই খরচা করে ফেলেন যে তাঁর পরিবারের উদরান্নের সংস্থানেও টান পড়ে যায়। ফলে লিটল ম্যাগাজিন চালাতে গিয়ে তারই জের টানতে গিয়ে সম্পাদককে মোকাবিলা করতে হয় অন্য ধরনের সাংসারিক সমস্যা।

এসব সমস্যা এমনই যা পত্রিকা প্রকাশের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। তবুও এসব সমস্যার কম/বেশি মোকাবেলা না করে মূল উদ্দেশ্য নিয়ে এগোন লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকের পক্ষে সম্ভব হয়না। মূল উদ্দেশ্য বলতে নিজের সৃজনশীলতাকে উপস্থাপনা করার সমস্যা যেমন থাকে সেজন্যে যত্ন করে নিজের লেখাটা লিখতে হয় তারই সঙ্গে সম্পাদককে অন্যের লেখা নির্বাচনেও সময় দিতে হয় যথেষ্ট পরিমাণে। এক্ষেত্রে দেখা যায়, ডাকে আসা কিংবা সরাসরি পত্রিকা দপ্তরে জমা পড়া লেখা থেকে তেমন ভাল রচনা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। ফলে যাঁরা ভাল লেখেন তাঁদের দিয়ে লেখাতে হয়। এব্যাপারেও অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে ব্যবসায়িক পত্র-পত্রিকার বাইরে যাঁরা ভাল লেখেন তাঁদের বেশির ভাগেরই লেখায় তেমন গরজ থাকে না। ভাল লেখা লিখিয়ে নেওয়ার জন্য তাদের পিছনে লেগে থাকতে হয়, খেয়াল করে অনবরত তাগাদা দিতে হয়। বস্তুত ভাল লিখিয়েরা এইভাবেই প্রণোদিত হন, ধীরে ধীরে তাঁদের লেখার অভ্যাস গড়ে ওঠে। প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন ভাল লেখক তৈরির প্রক্রিয়াও এটাই। মাঝে মাঝে কালপ্রবাহের কোন কোন সন্ধিক্ষণে দেখা যায় কিছু কিছু প্রতিভাধর সম্পাদক তাঁর সমমনস্ক সহযোদ্ধাদের নিয়ে লিটল ম্যাগাজিনের মাধ্যমে সূচনা করেছেন একটি বিশিষ্ট সাহিত্য আন্দোলন। যেসব আন্দোলন বহুক্ষেত্রেই উন্নত মানের



তথা ভাল লেখক-লেখিকা তৈরিতে সহায়ক হয়েছে।

লেখালিখিকে উন্নত মানে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বহুক্ষেত্রেই লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকদের বিশিষ্ট ভূমিকা থাকে। এব্যাপারে বাংলাসাহিত্যে লিটল ম্যাগাজিনের ভূমিকার গৌরবময় ঐতিহ্য রয়েছে। সেই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্যেই লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকদের ক্রমাগত অনুশীলনের মাধ্যমে বহু বিষয়ে পারদর্শী হতে হয়। নির্ভুল বানানবিধি তাঁকে শিখে নিতে হয়। বাংলাভাষা বিকাশের বিভিন্ন পর্বগুলি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান তাঁকে অর্জন করতে হয়। তাঁকে জানতে হয় সাহিত্যের বিভিন্ন শৈলী এবং আঙ্গিক নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার ইতিহাস। এসব না জানলে নতুন প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন লেখককে চিহ্নিত করা সম্পাদকের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকের কাছে এসব প্রত্যাশা করাটা কেউ কেউ বাড়াবাড়ি বলে গণ্য করতে চেয়েছেন। বলেছেন, লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকদের হৃদয়ে যে পবিত্র আবেগ থাকে এবং স্বপ্ন থাকে, যার টানে তরুণ সম্পাদকরা কিংবা তাঁদের সহযোগীরা কোনও সমাজবিরোধী কাজ না করে পত্রিকা বের করেন, নিজেদের ঘাম-রক্ত ঝরিয়ে এরকম একটি মহৎ উদ্যোগে লেগে থাকেন— কেবলমাত্র এই কারণেই তাঁদের পর্যাপ্ত সাধুবাদ প্রাপ্য।

বক্তব্যের এই অংশটুকুর ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করার কোনও কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু যখন বলা হয়, লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকদের কাছে আরও বেশি যোগ্যতা এবং দক্ষতা প্রত্যাশা করাটা বিড়ম্বনা সৃষ্টি করা মাত্র, তখন বক্তব্যটি আবেগমন্ডিত হলেও সেটা মেনে নিতে মন কুণ্ঠিত হয়। হাজার সাধুবাদ বর্ষণ করার পরেও বলতে হয়, লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকরা যদি অধিকতর যোগ্যতা এবং দক্ষতা অর্জনের অনুশীলনে লিপ্ত না হয়ে কেবল ভাবতে থাকেন তাঁরা যা করছেন সেটাই যথেষ্ট এবং নিজেদের সেই ভাবনা নিয়ে আবেগসর্বস্ব এবং আত্মতৃপ্ত থেকে যেতে পছন্দ করেন তাহলে বাংলাসাহিত্যে লিটল ম্যাগাজিনের গৌরবময় ঐতিহ্যের অংশীদার সত্যি-সত্যিই তাঁরা হতে পারবেন কিনা সে সম্পর্কে সংশয় পোষণ না করে উপায় থাকে না।

আবেগ এবং স্বপ্ন নিঃসন্দেহে জরুরি উপকরণ। কিন্তু কেবলমাত্র তাই দিয়ে লিটল ম্যাগাজিনের গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। বর্তমানের লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকেরা, কে কতখানি লেখাপড়া শেখার সুযোগ পেয়েছেন, গরিবঘরে জন্মেছেন নাকি বড়লোকের বিলাসব্যসনময় জীবন থেকে বেরিয়ে এসেছেন, ভাবীকাল এসব কৈফিয়তের প্রতি কর্ণপাত করবে না। তখন হিসাব হবে কেবলমাত্র কৃতির। সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে কোন লিটল ম্যাগাজিন কতখানি অবদান রাখতে পেরেছে ভাবীকাল কেবলমাত্র সেইটুকুরই বিচার করবে। এই কথাটা স্মরণে রেখে লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকেরা (শিক্ষাগত যোগ্যতা, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থান তাঁদের যেমনই হোক না কেন) যদি ক্রমাগত অনুশীলনের মাধ্যমে অধিকতর যোগ্যতা এবং দক্ষতার অধিকারী হয়ে উঠতে থাকেন তাহলে তাঁদের সেই মহৎ প্রয়াস যে লিটল ম্যাগাজিনের গৌরবময় ঐতিহ্যকে আরও বেশি মহিমান্বিত করবে —একথা বলাই বাহুল্য। তরুণ লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকদের কাছে একটু বেশি প্রত্যাশা আছে বলেই এত সব কথার অবতরণা। যাদের কাছে এত প্রত্যাশা, তাঁদের উৎসাহ যাতে বিরুদ্ধ পরিস্থিতির চাপে স্তিমিত হয়ে না পড়ে সে ব্যাপারে কিছু দায়িত্ব পালনের প্রশ্নও স্বাভাবিক ভাবেই এসে যায়। এধরনের দায়িত্ব পালন সাধারণত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে থাকে। এইরকম স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কিছু কিছু ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা কোন কোন ভাগ্যবান

লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকের কপালে জুটে যায় বলে তাঁদের কাজ অনেকখানি সহজসাধ্য হয়ে যায় এবং তাঁরা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময়ব্যাপী তাঁদের ম্যাগাজিন গুলি টিকিয়ে রাখতে পারেন। এই সহযোগিতার ব্যাপারটাকে খানিকটা প্রসারিত ক্ষেত্র দেওয়ার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির কিছু না কিছু উদ্যোগ বরাবরই রয়েছে। লিটল ম্যাগাজিন প্রদর্শনী, কিছু কিছু গুণী লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকদের সংবর্ধনা দেওয়ার অনুষ্ঠান এবং 'সেরা লিটল ম্যাগাজিন পুরস্কার' প্রথার প্রবর্তন, —এসবই সেই উদ্যোগের নিদর্শন।

চলতি বছরের শুরুতে ৯ থেকে ১৩ জানুয়ারি ' লিটল ম্যাগাজিন মেলা' সংগঠিত করে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সেই উদ্যোগটাকেই বহুগুণ বর্ধিত আকার দিতে সক্ষম হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে এধরনের মেলায় পূর্বাঞ্চলীয় সংস্কৃতি পরিষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতাও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এদের সহায়তা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কেবলমাত্র লিটল ম্যাগাজিনের জন্য একটি বড় মাপের মেলা সংগঠিত করার ব্যাপারে যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে তা প্রশংসার দাবি রাখে। প্রায় আড়াইশ-র মতো লিটল ম্যাগাজিনকে এই মেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। সারা পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলার এবং এই রাজ্যের বাইরে থেকেও উল্লেখযোগ্য পত্রপত্রিকাগুলি যাতে এই মেলায় অংশগ্রহণ করতে পারে সেজন্য আগে থেকেই তালিকা তৈরি করে তাদের আমন্ত্রণ জানান হয়েছিল। আমন্ত্রণ জানানোর সময় কোনও রকম বাছবিচার করা হয়নি। ফলে রাজনৈতিক সঙ্কীর্ণতা কিংবা গোষ্ঠীমনস্কতার কোনও অশুভ ছায়াপাত ঘটেনি এই মেলায়। মেলাকে কেন্দ্র করে যেসব আলাপ-আলোচনা, সেমিনার, কবিতাপাঠ, গল্পপাঠ-ইত্যাদির অনুষ্ঠান হয়েছিল তাতেও দল-মত-গোষ্ঠী নির্বিশেষে অংশগ্রহণ এবং মতামত প্রকাশের খোলামেলা পরিবেশটা ছিল এই মেলার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

মেলার পরিবেশ এইরকম খোলামেলা এবং আন্তরিক হওয়ার কারণেই লিটল ম্যাগাজিন কর্মীদের উৎসাহে জোয়ার এসেছিল। মেলার আয়োজনের শুরু থেকেই এর ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে বিভিন্ন সাব কমিটির মাধ্যমে কিছু-কিছু সম্পাদক -সংগঠক এবং অনুরাগীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ থাকায় এই উৎসাহের জোয়ার বহুগুণ বর্ধিত হয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কি, যারা প্রকৃত অর্থেই লিটল ম্যাগাজিনের আপনজন এই প্রথম তারা গোটা মেলাটাকে তাদের নিজস্ব বলে মনে করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

এরকম একটা বিরল সুযোগের উদ্ভাবক এবং সংগঠক যাঁরা তাঁদের ভূমিকা লিটল ম্যাগাজিনের ইতিহাসে একটি ল্যান্ডমার্ক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। কারণ, তাঁরা এধরনের একটিমাত্র মেলার অনুষ্ঠান করেই ব্যাপারটায় ইতি টানতে চান না। এরপর থেকে প্রতিবছরই কলকাতা পুস্তক মেলার মতো লিটল ম্যাগাজিন মেলা ওই রকমভাবেই নির্দিষ্ট স্থান-কালে সংগঠিত করার জন্য তাঁরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আশা করা যায় পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি এই প্রতিশ্রুতি পালনে কখনোই শিথিলতা দেখাবে না এবং তাদের তরফে 'সেরা লিটল ম্যাগাজিন পুরস্কার' ও গুণী লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকদের সংবর্ধনা দেওয়ার প্রথাও চালু থাকবে। যাবতীয় গোষ্ঠীমনস্কতা এবং রাজনৈতিক সঙ্কীর্ণতা মুক্ত হয়ে (এখন পর্যন্ত এ নিয়ে অভিযোগের কোনও কারণ ঘটেনি) এসব প্রথা চালু রাখতে পারলে অনবরত বিরুদ্ধ পরিস্থিতির মোকাবেলায় জেরবার লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদক এবং তাঁর সহযোগীরা যে কিছুটা উৎসাহিত বোধ করবেন — এতে কোনও সন্দেহ নেই।



# পাকিস্তানের ডায়েরী

শৈবাল গুপ্ত

আজকাল ভারতীয়রা এবং বাঙালীরা অনেকেই বিদেশে বেড়াতে যান। কিন্তু বিদেশে বেড়ানো বলতে আমরা বুঝি ইউরোপ বা আমেরিকা। বড় জোর ব্যাঙ্কক বা সিঙ্গাপুর। কিন্তু আমাদের আশেপাশেই যে সব দেশ আছে, যাদের সঙ্গে আমাদের প্রাচীন ও বর্তমান ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সে সব দেশে বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ কম, আগ্রহও কম। তাই যখন পাকিস্তানে বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ এসে গেল তখন লাফিয়ে উঠলাম। এ সুযোগ ছাড়া যায় না। এককালে, মাত্র পঞ্চাশ বছর আগেও আমরা একই দেশের বাসিন্দা ছিলাম। আমাদের জীবনযাপনপদ্ধতি ছিল এক, যা এখনও আছে। অথচ আমরা এখন পরস্পরের চরম শত্রু। এটা কি করে হল! পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা গেছে সবচেয়ে নিষ্ঠুর খুনোখুনি হয় সংস্কৃতিগতভাবে কাছাকাছি লোকদের মধ্যে — ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারিই সবচেয়ে হিংস্র। যেমন ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে হয়েছে। হচ্ছে ইজরায়েলী ও প্যালেস্টিনীয়দের মধ্যে। আর এখন হচ্ছে আমাদের ও পাকিস্তানের মধ্যে। আমার কাছে ভারতের বিভাজন ও পাকিস্তানের সৃষ্টি শুধু একটা রাজনৈতিক বিচ্ছেদ নয়, একটা আবেগের বিস্ফোরণ। বাংলাদেশের উত্থান ও তার সঙ্গে সম্প্রীতি সত্ত্বেও সেই emotional rupture-এর ঘা আজো সারেনি। তাই দেখতে যেতে চাইছিলাম এই পঞ্চাশ বছরের বিচ্ছেদ এবং রাজনৈতিক ও সামরিক মারামারির পরে ওরা আজ ভেতরে ভেতরে কেমন আছে। শত্রুই যদি হয়, তবে শত্রুর সঙ্গে লড়তে গেলেও তার প্রকৃতি জানতে হয়, জানতে হয় তার মানসিকতা।

আমাদের যাত্রার সময়টাও ছিল অদ্ভুত। কার্গিলে যুদ্ধ বাধার ঠিক আগেই আমরা ঘুরে এসেছি। আমরা পাকিস্তানে ছিলাম মে মাসের তিন তারিখ থেকে দশ তারিখ পর্যন্ত। একটি বেসরকারী নাগরিক ডেলিগেশনের সভ্য হয়ে পাকিস্তান সরকারের আমন্ত্রণে আমরা কুড়ি জন পুরুষ ও মহিলা যাত্রা করেছিলাম। আমাদের ভেতরে রাজনীতিক, সমাজসেবক, ব্যবসায়ী, শিল্পী এবং আমার মতন ডাক্তার সবই ছিল। যদিও আমরা সরকারী ডেলিগেশন ছিলাম না, তবু সরকারী ডেলিগেশনের মর্য্যাদা পেয়েছিলাম এবং সাধারণ নাগরিক ছাড়াও উচ্চতম রাজনৈতিক নেতৃত্ব— যথা প্রধানমন্ত্রী, বিদেশমন্ত্রী, তথ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী, গভর্নর, সবাই আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। যে আতিথেয়তা আমরা পেয়েছি তা অভাবনীয় এবং পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে এর অনেকখানিই ছিল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আমরা কেউই ভারত সরকারের প্রতিভূ নই। অথচ উচ্চতম নেতৃত্ব আমাদের সঙ্গে যেরকম রাজনৈতিক আলোচনা করলেন তা অস্বাভাবিক। শেষদিকে আমি তাই এইধরনের অর্থাৎ অফিসিয়াল এনগেজমেন্ট থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলাম এবং আমার যা প্রধান উদ্দেশ্য, সাধারণ মানুষ দেখা এবং তারা আমাদের সম্পর্কে, আমাদের ধর্ম, দেশ ও কৃষ্টি সম্বন্ধে কি ভাবছে তার একটা ধারণা করা, সেই দিকেই মন দিয়েছিলাম। কিন্তু সময় ছিল খুবই অল্প, কাজেই খুব বেশী দেখা যায়নি, যেটুকু দেখেছি সেটাই বলতে পারি।

সেকথা বলার আগে রাজনীতির কথা আগে বলে নেওয়া দরকার। দেশের রাজনীতি তৈরী হয় তার সামাজিক পটভূমিকায়। তাই পাকিস্তানের সামাজিক পটভূমিকা না বুঝলে

তার রাজনীতি বোঝা যাবে না। পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র। শুধু তাই নয়, পাকিস্তান হচ্ছে একটি সামন্ততান্ত্রিক দেশ। সেখানে জমির মালিক হচ্ছে বড় বড় জমিদার। এক-একজনের জমির পরিমাপ চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার একর বা তারো বেশী। সেখানে কোন ভাগ-চাষ বা বর্গার প্রচলন নেই। জমিদার ছাড়া বাকী সবাই হচ্ছে ভূমিহীন খেতমজুর। কিন্তু তাদের আর্থিক অবস্থা আমাদের খেতমজুরদের থেকে ভাল — অনেকটা আমাদের বহু পুরোনো Benevolent Feudalism-এর মতন। কিন্তু ব্যক্তিস্বাধীনতার দিক থেকে অপূর্ণ। কাজেই তাদের গণতন্ত্র হচ্ছে সামন্ততান্ত্রিক গণতন্ত্র। গণতন্ত্র না থাকার আরো একটা কারণ যে পাকিস্তানে সাক্ষরতার হার আমাদের চেয়ে অনেক কম — শতকরা মাত্র চুয়াল্লিশ জন সাক্ষর। এদের মধ্যে বেশীরভাগই মাদ্রাসার শিক্ষাপ্রাপ্ত, অর্থাৎ শুধুই ধর্মীয় শিক্ষা পেয়েছে। আমাদের দেশের মতন উদার শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষ বা ব্যবসা বাণিজ্য এবং প্রফেশনাল অর্থাৎ বৃত্তি- নির্ভরশীল মধ্যবিত্ত নাগরিক সমাজের ভেতর এক ক্ষুদ্র অংশ। ফলে যে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা পাকিস্তানের সমাজ পরিচলনা করে তা গোড়া ধর্মীয় মৌলবীদের ওপর নির্ভরশীল। পাশ্চাত্য মতে শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা স্বভাবতই এদের একেবারেই পছন্দ করেনা, কিন্তু ভয়ে তা প্রকাশ্যভাবে বলেনও না। এইরকম সামাজিক পটভূমিতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব তৈরী হয় জমিদার, মৌলবী ও সেনাবাহিনীর উপর। নির্ভর করে আমাদের দেশের মতন বণিকশ্রেণীর টাকার ওপর। অথচ রাজনৈতিক নেতৃত্ব শিক্ষিত সমাজের ভেতর থেকেই উঠে আসছে। এতদিন মিলিটারী শাসনের পর সবে সেই রাজনৈতিক শাসকশ্রেণী আসতে আরম্ভ করেছে, কিন্তু রাজনৈতিক শক্তির স্তম্ভগুলির সঙ্গে তাদের সর্বাত্মক একাত্মতা নেই বরং পারস্পরিক ভয় ও সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। এত কথা যে এখানে বসেই বুঝতে পেরেছি তা কিন্তু নয়, তবে যত কথোপকথন ও ঘটনা হয়েছে, পরে তার পর্যালোচনা করে এই কথা মনে হয়েছে। দু'একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

প্রথমে যে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয় তিনি পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ—প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের ছোট ভাই। শরিফ পরিবারের রাজনীতিতে আসার পেছনে যে অর্থনৈতিক মেরুদন্ড তা এসেছে ব্যবসার মাধ্যমে, বিশেষত চিনিকলের ব্যবসায়। বছর দুয়েক আগে তাদের চিনির ব্যবসা মার খেতে বসেছিল বিক্রি এবং রপ্তানীর অভাবে। সেইসময় ভারত ও বাজপেয়ী সরকার উদ্বৃত্ত চিনি কিনে নিয়ে তাদের উদ্ধার করে। স্বভাবতই বাজপেয়ীর প্রতি নওয়াজ শরিফের একটা কৃতজ্ঞতা ছিল। সেটা পাকিস্তানের রাজনৈতিক শক্তির স্তম্ভগুলি নিশ্চয় ভালে চোখে দেখেনি এবং শরিফ পরিবারকেও নিশ্চয় কষ্ট করে ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়েছে নিজেরা পাঞ্জাবী হওয়া সত্ত্বেও। পাকিস্তানে পাঞ্জাবীরা জনসংখ্যার শতকরা চৌষট্টি ভাগ এবং তারাই দেশ ও সৈন্যদল শাসন করে। তাই সিন্ধুদেশের ভুট্টো পরিবারকে ক্রমাগতই বিপদের মুখে পড়তে হয় এবং সৈন্যবাহিনী কখনই তাদের কথা শোনেনি। নওয়াজ শরিফকেও বাজপেয়ীর প্রতি দুর্বলতা প্রদর্শন করার পরেই মৌলবী ও সেনাবাহিনীর দিকে হেলতে হয়েছে গদী রক্ষা করার জন্য। অবশ্য চিরকালই ইসলামী রাজনীতি এইরকম নরম গরমের মধ্যে চলে একে অন্যের সঙ্গে যোগসাজশে। শাহবাজ শরিফ যখন আমাদের সঙ্গে দেখা করেন তখন তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত, হাই তুলছেন। তার মানসিক টেনশন অত্যন্ত প্রকট। একজন রাজনৈতিক নেতার এইভাবে বিদেশীদের সঙ্গে দেখা করায় খুবই আশ্চর্য হয়েছিলাম। আপাতদৃষ্টিতে এমন কিছু জরুরী মিটিংও তো নয়। কিন্তু জরুরী



ছিল তাদের দিক থেকে। কথাবার্তা শুরু হলো গতানুগতিক ভাবে। আমাদের তরফ থেকে হাসিম আব্দুল হালিম সাহেব বলতে লাগলেন যে দু'দেশের মধ্যে যাতায়াত, ব্যবসা-বাণিজ্য বেশী করে হোক, মানুষে মানুষে মেলামেশা হোক, তাহলেই রাজনৈতিক সমাধান আস্তে আস্তে হবে। সমস্ত মিটিংয়েই তোতাপাখীর মতন এই একই কথা আমাদের তরফ থেকে হালিম সাহেব শুনিয়ে গেলেন, কিন্তু আসলে পাকিস্তানের রাজনৈতিক বা সামাজিক পটভূমিতে এখন পর্যন্ত এর কোনো মূল্যই নেই। লাহোরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে বাজপেয়ীর লাহোর যাত্রা প্রচণ্ড আশা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল এবং তার জনপ্রিয়তা এখন পাকিস্তানের যে কোনো নেতার থেকে বেশী। তার বক্তৃতা মানুষকে এত বেশী আকর্ষণ করেছে যে সেটা পাকিস্তানের রাজনৈতিক শক্তি স্তম্ভগুলির কাছে যেন প্রায় একটা অশনিসংকেত। হালিম সাহেবের কথার উত্তরে শাহবাজ শরিফও গতানুগতিক ভাবে বলতে লাগলেন বন্ধুত্ব তো হতেই পারে, হওয়াই উচিত দুইদেশের স্বার্থে। কিন্তু কাশ্মীর সমস্যার সমাধান না হলে কিছুই করা যাচ্ছে না। তখন আলোচনাটাকে সম্পূর্ণ অন্য দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য আমি বললাম "দু'একজন ব্যবসায়ী আমার সঙ্গে আলোচনা করে বলেছেন তারা হিন্দুধর্মের কিছুই বুঝতে পারেন না। দূরদর্শনের মহর্ষি চ্যানেল তারা দেখেন কিন্তু সবই আজগুবী মনে হয়। আমি তাদের বলেছি ওটা হচ্ছে টেলিভিশনের হিন্দুধর্ম। প্রকৃত হিন্দুধর্ম বুঝতে হলে বেদান্ত পড়ো, কোরানের থেকে আলাদা করতে পারবেনা। আমরা কোরানের উক্তি ও বেদান্তের শ্লোক পাশাপাশি আবৃত্তি করেছি। তারা বলেছে বেদান্ত পড়তে চায় কিন্তু পাকিস্তানে তা পাওয়া যায় না। আমি বলেছি বেদান্তর ইংরাজী অনুবাদ পাঠিয়ে দেব। কিন্তু পাঠালেই কি সেটা তাদের কাছে পৌছাবে?" — প্রশ্নটা শাহবাজ শরিফকে করা। "কিন্তু পাওয়াটা এবং পড়াটা কি জরুরী নয়? কোনো একটি দর্শন, একটি জীবনদর্শনের ভেতর দিয়ে মিল না হলে কি দুইদেশের মানুষের অন্তরের মিলন হবে? আর জীবনদর্শনের ও আবেগের মিল যদি হয় তাহলে রাজনৈতিক মিল হতে কতক্ষণ? তখন তুমি আর আমি দুজনে একসঙ্গে কাশ্মীরে ছুটি কাটাব।" এইবারে শাহবাজ শরিফ ও তার সমবেত মন্ত্রিমণ্ডলী সশব্দে হেসে উঠলেন, বললেন 'তুমি অনেক গভীর কথা বলছ।' অর্থাৎ এর সময় এখনো আসেনি। নাছোড়বান্দা আমি বললাম "ভবিষ্যতের multipolar world-এ দক্ষিণ এশিয়াকে একটি রাজনৈতিক শক্তির কেন্দ্র হিসাবে কি দেখতে চাও না?" এবার শাহবাজ শরিফ হেসে বললেন 'কিন্তু এখনও তো এটা unipolar world।' একজন মন্ত্রী বললেন 'তার থেকে তুমি আমাদের বল না কেন যে আমাদের Public Health System আমরা কিভাবে গড়ে তুলতে পারি।' এই গল্প বলার উদ্দেশ্য এটাই বোঝানো যে পাকিস্তানের বর্তমান নেতৃবৃন্দ খুবই দোটানার মধ্যে নিজেদের নেতৃত্ব বজায় রাখছে। একদিকে সংখ্যায় কম প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত, আরেক দিকে কট্টর মৌলবাদী অশিক্ষিত জনসাধারণ আর সেনাবাহিনী, যারা মৌলবাদীদের মারফৎ এই জনসাধারণকে নিজের দিকে ধরে রাখতে চায় আর ভারত জয়ের স্বপ্ন দেখে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে আমেরিকা থেকে আফগানিস্তানের জন্য পাঠানো বিপুল অস্ত্রসম্ভার যা আফগানিস্তানে না গিয়ে সীমান্ত থেকে আবার পাকিস্তানেই ফিরে এসেছে আর তৈরী হয়েছে অনেক ব্যক্তিগত সৈন্যদল — জমিদারশ্রেণী ও মৌলবাদীদের হাতে। আমার তো মনে হয় কার্গিলে ও কাশ্মীরে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী অপদস্থ হলে কিছু পরিমাণে খুশীই হবেন পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং করাচী ও সিন্ধুপ্রদেশের বা কিছু পরিমাণে পাঞ্জাবের প্রগতিশীল মধ্যবিত্তরা, যেমন ১৯৭১

সালে হয়েছিলেন জুলফিকর আলি ভুট্টো। একদিক থেকে দেখতে গেলে কাশ্মীরের বর্তমান সমস্যা রাশিয়ানদের আফগানিস্তানে অবিমৃষ্যকারিতার সুদূরপ্রসারী ফল,যার থেকে জন্ম নিয়েছে মৌলবাদী তালিবান এবং হেরোইন ও মাদকদ্রব্য চোরাচালানের দেশে বিশাল অস্ত্রসম্ভারের খোলাবাজার। ইংরেজরা বহুদিন আগে যা ঠেকে শিখেছিল, তাকে অবজ্ঞা করে রাশিয়ানরা নিজেরা ডুবল এবং এখন আমাদের বিপদে ফেলছে। আর ইসলামী রাজনীতি চিরকালই দুমুখো হয়। একদিকে থাকে দয়ালু সুন্দর মুখ আর অন্যদিকে ভয়াল হিংস্রতা।

এরপর লাহোর থেকে গেলাম পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে। নতুন ঝকঝকে, শহর, চওড়া রাস্তাঘাট। সেখানে আমাদের দেখা করার কথা ছিল পার্লামেন্টের স্পীকার, বিদেশ সচিব এবং উদার ও মিষ্টভাষী অথচ কট্টর ভারতবিদ্বেষী তথ্য ও প্রচারমন্ত্রী মুশারফ হোসেনের সঙ্গে। আমরা যেহেতু রাজনীতিক নই তাই মুশারফ হোসেন আমাদের অনেককে একেবারে গলিয়ে দিলেন। কথা মূলত একই। আমরা বলছি বন্ধুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের কথা আর তারা বলছেন তারওতো বন্ধুত্বই চান কিন্তু একমাত্র বাধা হচ্ছে কাশ্মীর। বিদেশ সচিবের সঙ্গে ছিলেন ভারত বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত বিদেশ সচিব যার ছবি সরতাজ আজিজের সঙ্গে টেলিভিশনে সবাই দেখেছেন, কিন্তু চেনেননি। প্রধানমন্ত্রী ও বিদেশমন্ত্রী পাকিস্তানে সফররত সৌদি আরবের উপপ্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন কাজেই তাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার কোনো কথাই ছিল না। তবু আশ্চর্যের ব্যাপার, বিদেশমন্ত্রী নিজে ব্যক্তিগতভাবে এবং প্রধানমন্ত্রী তার সেক্রেটারী মারফৎ খবর দিলেন যে তারা আমাদের সঙ্গে দেখা করতে ভীষণ আগ্রহী। আমরা যেন পরদিন সকালে ইসলামাবাদ ছেড়ে না যাই। তার মানে আমাদের আর মহেঞ্জোদারো যাওয়া হবে না। মনটা খারাপ হয়ে গেল — "পড়েছি মোগলের হাতে খানা হবে সাথে।" আমাদের ভেতরে অনেকে অবশ্য খুবই উত্তেজিত, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী দেখা করতে চেয়েছেন। আমার সন্দেহের শুরু সেই থেকে। প্রাপ্য সম্মানের অতিরিক্ত কিছু কেউ দিলেই আমার সন্দেহ হয় যে এর পেছনে উদ্দেশ্য আছে। বিদেশমন্ত্রী সরতাজ আজিজের হাবভাব খুবই হাসিখুশী খোলামেলা ও বন্ধুত্বপূর্ণ। বললেন 'দুইদেশের কোনো দেশের সরকারই কাশ্মীরের যে কোনো সমাধানসূত্র গ্রহণ করলেই রাজনৈতিকভাবে বিপদে পড়বেন। তৃতীয়ত কোনো মধ্যস্থ ব্যক্তি সমাধান করে দিলে তখন না হয় বলা যাবে কি আর করব, এটা তো মানতেই হবে।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম "আর তৃতীয় ব্যক্তির সমাধান যদি কারুর কাছেই গ্রহণযোগ্য না হয় তখন কি হবে — যুদ্ধ?" এর আর কোনো জবাব নেই। বললেন 'কাশ্মীরে জনমত যাচাই বা প্লেবিসাইট গোটা দেশ জুড়ে না হয়ে জেলাভিত্তিক হতে পারে — যে জেলা ভারতে যেতে চায় যাক, যারা পাকিস্তানে আসতে চায় আসুক'। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছি, একেবারে পঞ্চায়েত নির্বাচন দিয়ে দেশভাগ! সরতাজ আজিজ নিজেও কি তা বিশ্বাস করেন? নাকি আমাদের মাধ্যমে লোক ঠকানো হচ্ছে! স্বাধীনতার সময়ে গোটা দেশটাকে যখন ভাগ করা হলো, তখনতো কোনো জনমত যাচাই করা হয়নি। ১৯৪৬-এর ১৬ই আগস্ট ডাইরেক্ট অ্যাকশন ঘোষণা করে লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান হল, আর এখন কাশ্মীরে জেলাভিত্তিক নির্বাচন! এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্যটা কি? আর আমরা এখন বললাম যে কাশ্মীরে লাইন অব কন্ট্রোলকে আন্তর্জাতিক সীমারেখার স্বীকৃতি দিতে কি আপত্তি? তখন একেবারে উড়িয়ে দিলেন 'না, না, তা হয়না। ওটা আমরা প্রথমেই খারিজ করে দিয়েছি।' কিন্তু কেন খারিজ করা হল তার কোনো উত্তর নেই।



এর পরে একেবারে খোদ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং তার নিজের বাসভবনে। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে ঢোকার সৌভাগ্য তো কোনদিন হবে না। একবার না হয় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনেই গেলাম। এত খাতির সইলে হয়। অনেক ব্যারিকেড পেরিয়ে উঁচু পাহাড়ে এক জায়গায় প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে পৌঁছালাম। কোন মেটাল ডিটেক্টর, বডি সার্চ ছাড়াই। আমরা যে ভি.আই.পি। বিশাল বসার ঘর হাল্কা রং-এ রুচিসম্মতভাবে সাজানো। নরম গদীর সোফায় সকলে বসলাম। শুনলাম নওয়াজ শরিফ এই বাইরের ঘরে আসবেন না। আমাদেরই ভেতরের মিটিং-এর ঘরে যেতে হব। কিন্তু হঠাৎই নওয়াজ শরিফ সদলবলে ঘরে চলে এলেন। সবাই উঠে দাড়ালাম। ফর্সা, সুন্দর, সুপুরুষ চেহারা, আমায়িক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। সবাইকে বসতে বললেন। হালিম সাহেব এখানেও তার বাঁধা গৎ শুরু করলেন — অবশ্য সেটা করতেই হবে। শরিফ সাহেব বললেন 'হ্যাঁ, চেষ্টা তো আমরা করছি শান্তি স্থাপনের জন্য। বাজপেয়ী লাহোরে এলেন, তাকে অভ্যর্থনা, করলাম। কিন্তু তারপরে তো তার প্রধানমন্ত্রীত্ব চলে গেল। এখন তিনি তো কেয়ারটেকার প্রধানমন্ত্রী।' হালিম সাহেব বললেন "অবশ্য লাহোর যাত্রার জন্য প্রধানমন্ত্রীত্ব যায়নি।" আমি নিজে কোনো রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর ধ্বজাধারী নই। কোনো পার্টি লাইনে কথা বলার দায় আমার নেই। কারণ আমি রাজনীতি করিনা। আমি স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক। কারো ধ্বজাধারী না হয়েও আমি স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারি, নিজের যা প্রাপ্য এবং নিরাপত্তা ও সুবিচার পেতে পারি, তাতেই আমার গৌরব। শুধু আমার গৌরব না, ভারতের গৌরব, প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল ও সরকার এবং প্রত্যেকটি নাগরিকের গৌরব। এরই জোরে আমরা আজ পৃথিবীতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছি। শরিফ সাহেব আবার বললেন 'এবার তো নির্বাচন হবে। বাজপেয়ী আবার প্রধানমন্ত্রীত্বতে ফিরবেন তো?' হালিম সাহেব বললেন, "এবারও hung parliament হবে। কোনো দলই একক ক্ষমতা পাবে না।'' এবার আমি চুপ করে থাকতে পারলাম না। আমি কথার মাঝখানে ছেদ টেনে বললাম "একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না হলেও স্থিতিশীল কোয়ালিশন নিশ্চয় হবে"। সভা একটুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ হল। তারপরে হালিম সাহেব বললেন, "দু'দেশের মধ্যে যাতায়াত আর একটু সুবিধাজনক করা যায় না? এই যে প্রত্যেকটা জায়গার জন্য আলাদা ভিসা, প্রত্যেক জায়গায় পুলিশের কাছে রিপোর্ট করা, এগুলো কি উঠিয়ে দেওয়া যায় না?" শরিফ একজন অফিসারের দিকে তাকিয়ে বললেন 'তাই নাকি, এসব আছে নাকি, কেন?' অফিসার উত্তর দিলেন 'ওরা করেছে, তাই আমরাও করেছি।' শরিফ বললেন 'তাতে কি হয়েছে? ওরা করুক গিয়ে, আমরা উঠিয়ে দেব। দাও উঠিয়ে।' হালিম সাহেব গলে জল। আমি ভাবলাম আশ্চর্য, আজকের দিনেও একটা আধুনিক সরকার এভাবে চলে নাকি! এ যে একেবারে বাদশাহী ফরমান! আমরা ফিরে আসার দিন সাতেক পরেই কার্গিলে গন্ডগোল ধরা পড়েছে, কাজেই এই ফরমান কাদের হজম করার জন্য তা বোঝাই যাচ্ছে!

পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে বলা সম্পূর্ণ হবে না ওদের আই এস আই সম্বন্ধে কিছু না বললে। তার উপস্থিতি কি আমরা টের পেয়েছিলাম? হ্যাঁ, পেয়েছিলাম। লাহোরে আমাদের ভেতর এক দম্পতি তাদের একটি বন্ধু পরিবারে নৈশভোজে নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেন। এই পরিবারটি এক প্রাক্তন আই এন এ অফিসারের পরিবারভুক্ত। তাদের বাড়ী ক্যান্টনমেন্টের সৈন্যাবাসের লাগোয়া। সেই রাত্রেই তারা ফোন পান 'তোমাদের বাড়ীতে কারা এসেছিল, কি

তাদের পরিচয় ?।'' শুনেছি তারা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছিলেন এবং ইতস্তত: যোগাযোগ করতে আরম্ভ করেছিলেন। আমরা যখন যেখানেই গেছি আমাদের সঙ্গে পুলিশ থাকত। লাহোরে মোটরসাইকেলধারী এবং ইসলামাবাদ ও সেখান থেকে তক্ষশিলা ও খারীর পথে সাব-মেশিনগানধারী পুলিশ জিপের ভেতর। কাজেই সাধারণ লোকের আমাদের সঙ্গে কথা বলতে আসার কোনো ব্যাপারই ছিলনা। মারীর শৈলাবাসের বিরাট বিলাসবহুল সরকারী হোটেলে পাঁচশোর ওপর ঘর। তাছাড়া আছে পাঁচতারা হোটেলের সব উপকরণ। কিন্তু কোনো লোক নেই, নেই কোনো আবাসিক। অসংখ্য হোটেল কর্মচারী, তাদের চেহারায় ও চলনে বলনে মিলিটারী ভাব। অবশ্য আতিথেয়তায় কোনো ত্রুটি নেই। দু'একজন বাংলায় কথা বলে আমাদের তাক লাগিয়ে দিল। অন্যরা হেসে মজা করল ''কিহে কোথায় শিখলে ?'' আমি মনে মনে ভাবছি ''তোমরা বাংলাদেশে কি শুধুই সরকারী চাকুরে ছিলে না গুপ্তচর ছিলে ? আমাদের পশ্চিমবাংলায় যারা অবাঙালী চাকুরে আছে তারাও তো এত ভাল বাংলা বলে না।'' ইসলামাবাদে ভারতীয় হাইকমিশনে যারা কাজ করে তাদের প্রত্যেকের পেছনে আই এস আইয়ের লোক লেগে থাকে। তাদের বাড়ীর লোকেরা দোকানবাজার করতে গেলেও এদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হয়। তাই এইরকম আবহাওয়ায় এত সব বন্ধুত্বের আদান প্রদানে বেশ খটকাই লাগছিল।

ইসলামাবাদ থেকে করাচি এলাম এবং এখানেই অফিসিয়াল এনগেজমেন্ট থেকে আমি ছুটি নিলাম। কারণ আমার দুটি জিনিষ দেখার ছিল এবং সময় বাকী ছিল মাত্র একদিন। তার ওপর শরীরটাও খারাপ ছিল। দুটি জিনিষের মধ্যে প্রথমটি হল মরুতীর্থ হিংলাজ — তার এখনো কিছু অবশিষ্ট আছে কিনা! এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে করাচির রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম যা স্বাধীনতা পূর্বযুগে খুবই জনপ্রিয় ও গমগমে ছিল। মঠাধ্যক্ষ ছিলেন স্বামী রঙ্গনাথানন্দ। যিনি এখন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট। ১৯৪৮ সালের ৯ই আগস্ট আশ্রম আক্রান্ত হয় এবং জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। মুসলিম ভক্তরাই সন্ন্যাসীদের রক্ষা করে সীমানা পার করিয়ে দেন। সেই ভক্তদের মধ্যে অনেকে পরবর্তীকালে সরকারের বিভিন্ন দফতরে উচ্চ পদাধিকারী হন। কিন্তু এখন আর তাদের কোনো খোঁজ নেই। আশ্রমটির কি অবস্থা তাও জানা নেই। স্বামী রঙ্গানাথনানন্দর কাছ থেকেই নির্দেশ ও ঠিকানা যোগাড় করেছিলাম। হিংলাজ সম্বন্ধে কৌতূহলের কারণ হিংলাজ হচ্ছে বাহান্নটি সতীপীঠের পশ্চিমতম পীঠ, আর পূর্বতম হচ্ছে কামাখ্যা। আমি মনে করি এই বাহান্ন সতীপীঠের গল্প ও তাদের অবস্থান ভারতবর্ষের একীকরণ ও জাতীয় সংহতির প্রাচীনতম এবং সফলতম প্রয়াস। তাই আমার কাছে তা পবিত্র। লাহোরে ও ইসলামাবাদে যাকে পেয়েছি জিজ্ঞাসা করেছি, কিন্তু কেউ নামই শোনেনি। করাচিতে পৌঁছে সন্ধ্যাবেলাই নৈশভোজের নিমন্ত্রণ ছিল শিল্পপতি অ্যাডামজির বাড়িতে। অ্যাডামজি পার্শী এবং এককালে ভারতে বড় শিল্পপতি ও চা বাগানের মালিক ছিলেন। তিনি পাকিস্তানে গিয়ে আরো বড়লোক হয়েছেন ও পৃথিবীজোড়া ব্যবসা করছেন। তার বাড়িতে জড়ো হয়েছিলেন অনেক বয়স্ক লোক যারা এক কালে ভারতে এবং কলকাতায় ছিলেন। এদের ভেতরেই আলাপ হল 'ডন' পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে। অত্যন্ত সদাশয় লোক। তার কাছে মনোবাসনা ব্যক্ত করতেই বলে উঠলেন 'আমিও তো এসব কোথায় আছে জানি না। চল আজকে রাত্রেই খাওয়া দাওয়ার পরে খুজে দেখি।' আমি বললাম ''সে কি ? সে তো অনেক রাত হবে, তোমার অসুবিধা হবে না ?'' ভদ্রলোক বললেন 'না, না, আমার আটাত্তর বছর বয়স হয়েছে তো কি হয়েছে, আমি নিজেই গাড়ী চালাই, রাত দেড়টা-দুটোর আগে ঘুমোই না। আজ রাতটা আনন্দে



কাটবে।' করাচি আর লাহোরে আকাশ পাতাল তফাৎ। এখানে সরকারী কড়াকড়ি নজরে পড়েনা। লোকজনও অনেক খোলামেলা। বেশ বড় পার্শী সম্প্রদায়ের বসবাস এবং তারা সবাই ব্যবসায়ী ও ভীষণ বড়লোক। আন্তর্জাতিক স্তরে ব্যবসা করে। হিন্দুর সংখ্যা খুবই কম। তাদের ভেতর দু'একজন মোটামুটি সচ্ছল। বাকীরা বস্তিবাসী এবং তারা যে কি ভয়ে বসবাস করে তার পরিচয়ও পেয়েছি। যাই হোক সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গে স্বামী রঙ্গনাথানন্দর দেওয়া রাস্তার নাম ধরে সমস্ত পুরোনো করাচি শহর রাত দেড়টা পর্যন্ত তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। স্বামীজী যে বড় রাস্তার নাম (লরেন্স রোড) দিয়েছিলেন তা ধরে অনবরত ছোটাছুটি করেও ঐ রাস্তা থেকে বেরোনো ছোট রাস্তা লোবো রোডের খোঁজ কিছুতেই পাওয়া গেল না। কোনো রাস্তারই নাম লেখা নেই। নতুন করাচি শহর যদিও ঝকঝকে নতুন, পুরনো করাচি একটা বেওয়ারিশ ধ্বংসস্তূপের মতন। রাস্তায় বিশেষ আলো নেই। বেশীর ভাগ বাড়ীই পুরোনো, ভাঙাচোরা, অন্ধকার — কেউ থাকে কিনা বোঝা যায় না। রাস্তাঘাট ভাঙাচোরা, আবর্জনাপূর্ণ। রাস্তার ধারে ধারে যে সব লোকজন বসে আছে বা চলাফেরা করছে। আলো-আধারিতে তাদের চেহারা দেখে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে শুধু আমার না, ডন সম্পাদক মশায়েরও বেশ অস্বস্তি হচ্ছে। গাড়ী থেকে নেমে হেঁটে দেখার প্রস্তাব একবারও করলেন না। পরের দিন বুঝেছিলাম রাত্রের অভিযানে বাড়ীগুলোর বেশীর ভাগই পরিত্যক্ত হিন্দু সম্পত্তি — অর্থাৎ শত্রু সম্পত্তি। রাত দেড়টা পর্যন্ত ঘুরেও কিছুই পাওয়া গেল না। পরদিন যোগাযোগ করলাম আর এক মুসলিম ভদ্রলোকের সঙ্গে। তার ভাই কলকাতায় থাকে, সেই পরিচয় দিয়ে দিয়েছিল। সেদিন রবিবার। শেখ মনজার আলম সাহেব বললেন দিনের বেলা তিনি ব্যস্ত আছেন। বিকালবেলা আসবেন এবং এর মধ্যে পুরনো হিন্দু মন্দির বা ধর্মস্থান কোথায় আছে তার খোঁজ করবেন। আসতে আসতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। ইতিমধ্যে আমি জেনেছি একটি স্বামীনারায়ণ মন্দির ও একটি হনুমান মন্দির শহরে আছে এবং তারা চালু মন্দির। তবে সেখানে যাওয়ার আমার কোনো আগ্রহ ছিল না। ভদ্রলোক অবশ্য সস্ত্রীক সন্ধ্যাবেলা এলেন এবং তার পাঠান ড্রাইভার আমাদের নিয়ে গেল পুরনো করাচির ভীমপুরা বলে একটা জায়গায়। সেই একই রকম ভাঙাচোরা অন্ধকার বাড়ীঘর। ভাঙা রাস্তা, রাস্তায় আবর্জনা। কয়েকজন পাঠান জাতীয় লোক বসে আছে। আমাদের ড্রাইভার তাদের জিজ্ঞাসা করল এখানে একটা হিন্দু মন্দির আছে না ? তারা আঙুল দেখিয়ে বলল 'ঐযে'। তাকিয়ে দেখলাম মন্দির বলে চেনা মুশকিল, একটা গুদাম ঘরের মতন বাড়ি, ছাদটা সামান্য একটু তেকোনা ভাবে উঁচু করা। ওরা আমাকে ঐ গুদাম ঘরের পাশে একটা গলির মধ্যে নিয়ে গেল। দেখলাম গলির ভেতরে ঐ ঘরটার একটা দরজা আছে যেটা মন্দিরের দরজার মতন দেখতে, কিন্তু তালাবন্ধ। পাড়ার মুসলমানরা তখন হাকডাক করতে শুরু করল 'এই কে আছ ভেতরে, দরজা খোল'। পাশের একটি কুঠুরির মতন দরজা দিয়ে একটি লোক বেড়িয়ে এল, তার পেছনে একটি অপরিসর ঘর ও কিছু জামাকাপড় দেখা যাচ্ছে। সে সন্ত্রস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করল আমরা কি চাই। আমি পরিচয় দিতেই তার মুখ চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। কলকাতা থেকে আসা হিন্দু, সঙ্গে আবার স্ত্রীও রয়েছে! সে তাড়াতাড়ি মন্দিরের তালা খোলার জন্য চাবি আনতে গেল। মন্দির খুলে আমরা দেখলাম ছোট্ট একটা ঘর। তার একদিকে এক অষ্টভূজা দেবীমূর্তি পাথরের ওপর রং দিয়ে আঁকা। তাছাড়া অন্যান্য নানা দেবদেবীর ফটো। জিজ্ঞাসা করলাম '' এ কোন দেবী ?'' সে বলল ''দেবী হিংলাজ''। চমকে উঠলাম 'দেবী হিংলাজ!' এখানে কেন ? আসল মন্দির কত দূরে। সেকি এখনো আছে ? লোকটি বলল 'আছে, মরুভূমির মধ্যে গিয়ে সে মন্দির কেউ

ধ্বংস করেনি। আমরা তাঁর পূজারী। বছরে একবার যাই, বাসে করে যেতে সাতদিন সময় লাগে। এই কিছুদিন আগেও গিয়েছিলাম। এখানে নিত্যপূজার জন্য পট রেখেছি।' জিজ্ঞাসা করলাম "সেই মরুতীর্থে কেউ যায়?" সে বলল 'কেউ না।' বললাম "এখানে"? 'তাও প্রায় কেউ না। আমরা আছি দেবীর সঙ্গে।' দেবীমূর্তিকে প্রণাম করে থালার ওপর প্রণামী রাখলাম - এক মাত্র প্রণামী হয়ত বহুদিন পরে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম রামকৃষ্ণ মিশনের কথা। অনেক কষ্টে বোঝালাম। একে তো পাঞ্জাবী ছাড়া কিছু বোঝে না, তার ওপর আশ্রম কথাটা বোঝানো মুশকিল। অবশেষে হঠাৎ সে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, একজন স্বামিজী থাকতেন, কিন্তু সেটা তো কোনো মন্দির না।' বুঝলাম ঠিক জায়গার কথাই বলছে। সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করলাম "কোথায়। স্বামীজীর নাম কি ছিল।" সে অনেক কষ্ট করে মনে করার চেষ্টা করতে লাগল। আমি বললাম স্বামী রঙ্গনাথ হবেন কি? সে বলল 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ নাম।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম জায়গাটা এখনো আছে কিনা। সে বলল আছে, তবে বন্ধ আছে। তারপরে সে মনজার সাহেবকে বোঝাতে লাগল যে বাড়ীটা রাস্তা থেকে দেখা যায় না, কারণ রাস্তাটাই বন্ধ হয়ে গেছে সামনে দোকানপাট গজিয়ে। সে বিস্তারিত ভাবে বোঝাতে লাগল কিভাবে যেতে হবে। আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না, কিন্তু মনে হল মনজার বুঝেছে। তারপরেই ছুটলাম আমরা, কিন্তু অনেক ঘুরেও সে বাড়ী খুঁজে পেলাম না। ঘুরতে ঘুরতে একটা ছোট্ট হিন্দু মন্দিরের সামনে এলাম। ছোট হলেও সুন্দর। কিন্তু জরাজীর্ণ, তালাবন্ধ। একটি মুসলমান ছেলে পাশের গলি থেকে বেরিয়ে এল। বলল 'মন্দির তো তালাবন্ধই থাকে। সরকার থেকে তালা লাগিয়ে দিয়েছে।' আমি বললাম "ভেতরে দেখা যায় না?" সে বললো 'সরকারের লোক নিয়ে এসে দু'একবার তালা খুলতে দেখেছি, কিন্তু কি দেখবে, ভেতরে কিছুই নেই।' আর কোনো মন্দির বা আশ্রম আছে কিনা জিজ্ঞেস করতে বলল, 'দুটো গলি পর একজন হিন্দু আছে সে হয়ত বলতে পারে।' গেলাম সেই গলিতে। রাত তখন বেশ হয়েছে। মনজার চীৎকার করে বলল 'এই এখানে কোনো হিন্দু আছেন।' একটা দোকানের ভেতর থেকে একটা ছেলে বলল 'ঐ সামনের বাড়ী দেবু নামে একজন হিন্দু থাকে।' একজন দশাসই ভলান্টিয়ার পাওয়া গেল। সে একটা হলদে একতলা কোয়ার্টারের বাইরে দাড়িয়ে চীৎকার করতে লাগল, 'এই দেবু বাইরে আয়।' ভেতর থেকে ততধিক তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জবাব এল 'না। বাইরে যাব না।' অবশেষে অনেক কষ্টে সেই দেবুকে বাইরে বার করা গেল, কিন্তু যেই সে শুনল আমরা মন্দিরের খোঁজ করছি অমনি ভীতস্বরে বলে উঠল 'মন্দিরের আমি কি জানি, আমি তো হরিজন।' তাকে অভয় দিয়ে আত্মপরিচয় দিলাম, বললাম "হরিজন তো কি হয়েছে, হিন্দু তো। আছে এখানে এরকম কোনো মন্দির?" সে একটু শান্ত হল। তারপরে চারদিকে হাত ঘুরিয়ে বলল, 'মন্দির তো অনেক আছে। কিন্তু সব তো তালাবন্ধ। জেনে কি হবে।' এই বলেই সে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল। এখানেই আমার খোঁজার শেষ। তারপরে মনজার আমাদের বড় রেস্তোরায় নিয়ে গিয়ে খুব খাওয়াল। তার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে আপ্যায়ন করল, করাচি ক্লাবে নিয়ে গেল। সেখানে সেদিন ক্লাব নির্বাচন হচ্ছে, ঠিক কলকাতার ক্লাবের নির্বাচনের মতন। অনেকে এসে করমর্দন করল, বন্ধুত্বের কথা বলল, কাশ্মীরের যা হোক একটা কিছু হেস্তনেস্ত হয়ে যাক না বাবা, আমরা শান্তিতে একটু বাস করি। কিন্তু আমার মনের মধ্যে জেগে রইল রাত্রিবেলা হঠাৎ বাইরে থেকে ডাক পাওয়া ভয়ার্ত দেবুর মুখ — "সে তো হরিজন, হিন্দু নয়।"


*অধুনা প্রাপ্তিযোগ্য*

*কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল্যবান প্রকাশনা*

| | |
|---|---|
| Rasvihary Das Philosophical Essay : Ramaprasad Das | 150.00 |
| Economic Theory, Trade and Quantitative Economics : Asis Banerjee, Biswajit Chatterjee | 200.00 |
| পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা : ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ | ৩০০.০০ |
| প্রমথনাথ বিশী : জীবন ও সাহিত্য : শশাঙ্ক শেখর মন্ডল | ৬০.০০ |
| বাংলার বাউল : পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী | ৩০.০০ |
| ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বদেশচিন্তা ও বঙ্কিমচন্দ্র : সুপ্রিয়া সেন ভট্টাচার্য্য | ৯০.০০ |
| নবচর্যাপদ : শশিভূষণ দাশগুপ্ত | ৩৫.০০ |
| বঙ্কিম স্মারক সংখ্যা (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগীয় পত্রিকা) : ডঃ উজ্জ্বল মজুমদার | ৫৫.০০ |
| আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান : ডঃ অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় | ১০০.০০ |
| বামা বোধিনী পত্রিকা : ডঃ ভারতী রায় | ১৫০.০০ |
| আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষা চিন্তা : ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ | ৭৫.০০ |
| পূর্ববঙ্গের কবিগান : ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ | ৯০.০০ |
| ময়মনসিংহ গীতিকা : রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন | ৯০.০০ |
| বাংলা কাব্য-কবিতায় লোক ঐতিহ্যের প্রভাব (১৩০১-১৯৫০) | ৭৫.০০ |
| প্রাচীন কবিওয়ালার গান : ডঃ শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র পাল | ১২৫.০০ |
| শ্রী পদামৃতসমুদ্র : ডঃ উমা রায় | ১৬০.০০ |
| বাংলা কাব্যে নারীত্বের রূপায়ণ : কণক মুখোপাধ্যায় | ২৫.০০ |
| Agrarian System of Ancient India : U. N. Ghoshal | 15.00 |
| The Science of Sulba : B. B. Dutta | 40.00 |
| Studies in Indian Antiques : H.C. Roychoudhuri | 55.00 |
| Studies of Accounting Thought : G. Sinha | 100.00 |
| Reading Keats Today : Prof. Surabhi Banerjee | 60.00 |
| Dynamics of the Lower Troposphere : D. K. Sinha, G. K. Sen, M. Chatterjee | 150.00 |
| Acharya-Vandana : D.R. Bhandarkar | 145.00 |
| Political History of Ancient India : Hemchandra Roy Choudhury | 70.00 |
| The History of Bengal : Narendra Krishna Sinha | 200.00 |
| An Enquiry into the Nature & Function of Art : S. K. Nandi | 80.00 |
| Handbook of University Endowments | 30.00 |
| Romance of Indian Journalism : Jitendranath Basu | 75.00 |

*আরো বিশদ বিবরণের জন্য ঃ*

**Pradip Kumar Ghosh,** Superintendent
Calcutta University Press
48, Hazra Road, Calcutta 700 019

বিক্রয়কেন্দ্র : আশুতোষ ভবনের একতলা, কলেজস্ট্রীট চত্বর

Price : Rs. 25
Vol. 20 No.4

**BIVAV**
Special issue
Published in June '99

Reg No : 30017/76
75th issue

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NO ISSN 0970-1885

# পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ পরিস্থিতির অগ্রগতি
# আমাদের এই সাফল্যের চাবিকাঠিটি কি?

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ পরিস্থিতির কথা অনেকেই বলেছেন। কিন্তু এই উন্নতি সম্ভব হলো কিভাবে?

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড (ডব্লিউ বি পি ডি সি এল) এর যাঁরা কর্মী, তাঁরা ভালোভাবেই জানেন এর উত্তর। সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের উদাহরণ এটা। ১৯৮৫ সালে নিগমের যাত্রা শুরুর পর থেকে কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে (কে টি পি এস) বসানো হয়েছে প্রতিটি ২১০ মেগাওয়াটের পাঁচটি বৃহৎ নতুন ইউনিট। ২১০ মেগাওয়াটের আরও একটি ইউনিট ইতিমধ্যেই বসানো হয়েছে। অর্থাৎ কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে এখন মোট উৎপাদন ক্ষমতা ১২৬০ মেগাওয়াট। এই সাফল্য রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন চিত্র বদলে দিয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। রাজ্য সরকারের অধীন এই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটির উৎপাদন ক্ষমতা শুধু যে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে তাই নয়, কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদিত লক্ষ লক্ষ ইউনিট বিদ্যুৎ আজ গোটা রাজ্যে বিদ্যুৎ চাহিদার এক বিপুল অংশ পূরণ করেছে।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে দেশের বিদ্যুৎ মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড নিজের আলাদা একটা স্থান করে নিয়েছে। 'প্লান্ট লোড ফ্যাক্টর' 'টাইম এভেইলেবিলিটি ফ্যাক্টর', 'অয়েল কনসামশন, এবং 'অ্যাক্সিলারি কনসামশন' ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতার জন্য কেন্দ্রিয় সরকার যে পুরস্কার দিয়ে থাকে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম এখন তার নিয়মিত প্রাপক। নিগমের দক্ষতা এখন দেশের সেরা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাথে তুলনীয়। পরিবেশকে রক্ষার ব্যাপারেও অগ্রাধিকার দেয় নিগম। ছাইয়ের পরিমাণ যতটা সম্ভব কম রাখার জন্য বসানো হয়েছে আধুনিক প্রযুক্তির ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটর। বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিতরে ও চারিদিকে সবুজায়ন সহায়তা করছে পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায়। বর্জ্য যাতে সম্পদে পরিণত হয়, সেই লক্ষ্যে ছাইয়ের সদ্ব্যবহারে একটি 'পাইলট প্রজেক্ট' হাতে নেওয়া হয়েছে।

বিদ্যুৎ চাহিদা দিনের পর দিন যেভাবে বাড়ছে, তাতে বর্তমান সময়ের ভালো পরিস্থিতি আগামী যে কোন দিন ঘাটতির মুখোমুখি হতে পারে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প হিসাবে ৫x২১০ মেগাওয়াট ইউনিট ক্ষমতাসম্পন্ন বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র রূপায়ণের দায়িত্ব পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম। জাপানের ও ই সি এফ সংস্থা প্রয়োজনীয় অর্থ দিচ্ছে। ১৯৯৯ সাল এবং তারপর থেকে ঐ প্রকল্পের তিনটি ইউনিট চালু করা সম্ভব হবে। যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে বাকি ইউনিটগুলির রূপায়ণের কাজও হবে। বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের পর হবে ৪x৫০০ মেগাওয়াট মুর্শিদাবাদ (সাগরদীঘি) তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ।

ভবিষ্যতে রাজ্যের সব অংশের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের চাহিদা পূরণে এই নতুন প্রকল্পগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। সরবরাহ লাইনে বিদ্যুতের জোয়ার রাখার দায়িত্ব নেবে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম।

**পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড**
নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং (৭ম তল), বি ব্লক, ১ কিরণশঙ্কর রায় রোড, কলকাতা — ৭০০